মধুচন্দ্রিকা

শ্রীআশালতা সিংহ



গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দাম আড়াই টাকা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ, ডি,

মহোদয়ের করকমলে

গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

এই সামান্য গল্প গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

বিনীতা

শ্রীআশালতা সিংহ

বীরভূম

সূচী

মধুচন্দ্রিকা

১

বিবাহের সময় সুনন্দা যখন শুনিল তাহার স্বামী নিজে উপার্জ্জন করা দূরে থাক এখনও তাঁহার পঠদ্দশা, তখন তাহার মনটা বিরাগে বাঁকিয়া দাঁড়াইল। নব্য শিক্ষায় এবং নব যুগের আলোতে সে ছোট হইতে মানুষ হইয়াছে। পাশ্চাত্য আলোকের প্রখরতা চোখে লাগিয়াছে ভাল। প্রথম হইতে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে বিবাহের পরে স্বামীর ঘরণী-গৃহিণী হইবে, তথাকার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিশ্বরীর পদে অভিষিক্তা হইবে। আর কোন বন্ধন নাই, কোন দাবিদাওয়া নাই, কোন জটিলতা নাই। সরল স্বচ্ছ স্বাধীন জীবন। যেমন ওদেশে হয়। ইউরোপে উপযুক্ত পুত্র কখনও বিবাহের পর এক শহরে মা-বাপের সহিত একান্নবর্ত্তিতায় এক বাড়ীতে থাকে না। প্রত্যেকের স্বাধীন জীবনধারা আপন আপন স্বতন্ত্র পথে ও স্বতন্ত্র পরিবেষ্টনে চলে। কাহারও সহিত কাহারও সংঘর্ষ বাধিবার অবসর নাই। কিন্তু তাহার এই কল্পনায় ঘা পড়িল। শোনা গেল পাত্রের পিতা মস্ত বড় উকীল, মস্ত তাঁহার নামডাক, অর্থেরও অবধি নাই। কিন্তু ছেলেটি সবে মাত্র ল' কলেজে ঢুকিয়াছে। এখনও শেষ পাশ দিতে বছর দুয়েক দেরি। তাহার পর সে হাইকোর্টে ব্যবসায় সুরু করিবে স্বাধীনভাবে। ভবিষ্যতে কোন এক দিন স্বাধীন গৃহের স্বাধীন গৃহিণী সুনন্দা হয়ত হইবে, কিন্তু আপাততঃ তাহাকে হইতে হইবে শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের বধূ, অনেকগুলি দেবর ও ননন্দার বৌদি। তাহার

ভাবী শ্বশুরবাড়ী আবার বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার। সেখানে আরও কত জ্যেঠশাশুড়ী খুড়শাশুড়ী দিদিশাশুড়ী আছেন তাহার স্থির কি! সুনন্দার মনটা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু সবচেয়ে মুস্কিল এই যে বাপ-মা যেস্থানে বিবাহ স্থির করিতেছেন তাহার ভালমন্দ বিচার করিবার, খুঁৎখুঁৎ করিবার, মন ভার করিবার মত মনের সাবলীলতা শিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার বা আপত্তি করিবার মত বেহায়াপনা এখনও ধাতস্থ হয় নাই। তাই মনে মনে অনেক বিতর্ক-বিসম্বাদ করিলেও মুখে সে কিছুই বলিতে পারিল না। ছিঃ, তাও কি পারা যায়। বাড়ীতে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত সুরই অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছিল। আত্মীয়-পরিজন যে শুনিতেছিল সেই বলিতেছিল, "সুনু অনেক তপস্যা করেছিল তাই এমন ঘরে-বরে বিয়ে হচ্ছে। শ্বশুর ত রাজা-বিশেষ! আর ছেলেটি যেন হীরের টুক্‌রো। লেখাপড়াতেও যেমন, চেহারাও যেন রাজপুত্রের মত; পানটি সিগারেটটি অবধি খায় না।" বরের নিকট-সম্পর্কীয় এক জন বন্ধু কার্য্যসূত্রে এ-বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, "আর যেমন বিনয়ী তেমনই পিতৃমাতৃবৎসল। কে বলবে যে আজকালকার ছেলে।"

সুনন্দা আড়াল হইতে বিশেষ করিয়া ঐ কথাটা শুনিয়া মুখ বাকাইল। মনে মনে বলিল, পিতৃমাতৃবৎসল! আহা যেন সত্যযুগের মানুষ! আর তাই যদি বাপু, তবে একটি সেকালের তপোবন-কন্যাকে বিয়ে করলেই ত পারতেন। খুঁজে পেতে সুনন্দার মত মেয়ে যার বাপের বাড়ী কলকাতায় আর যে বেথুনে আই-এ অবধি পড়েছে, তেমন মেয়ের খোঁজে তাঁর কি প্রয়োজন ঘটেছিল?

কিন্তু অবশেষে সারা দেশ খুঁজিয়া-পাতিয়া সুনন্দাকেই তাঁহারা আবিষ্কার করিলেন। কি-ই বা করা যায়। মনে মনে একটা গভীর দুঃখ, একটা মহৎ ত্যাগ বরণ করিয়া লইবার জন্য সুনন্দা প্রস্তুত হইতে লাগিল।

তাহার কলেজের বান্ধবীরা সেদিন বিদায়সম্ভাষণ জানাইতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিতা, অনেকে আসন্ন বিবাহের সম্ভাবনায় অপেক্ষারতা এবং দুই-এক জনের সবেমাত্র বিবাহ হইয়াছে, এবং সকলেই প্রায় শিক্ষা, মানসিক আদর্শ এবং চিন্তাধারায় সুনন্দার সহিত একশ্রেণীর। ইহাদের মধ্যে রেবা প্রথমে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "সুনু এবারে পর্দ্দানশীন পরিবারের পর্দ্দানশীন বৌ হ'তে চলল। নিজের মত আর ত চলবে না। হয়ত কখনও কলকাতায় আর আসা হবে কি হবে না, তাই আমরা দেখা করতে এলাম।"

লটি মিত্রের মাস-দুই হইল এক হালী ডেপুটির সহিত বিবাহ হইয়াছে, সে তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল, "ও মা তাই না কি! কি আশ্চর্য্য, সুনুর যথেষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি রয়েছে, স্বাধীন মতামত রয়েছে, সে যদি এ হীনতা স্বীকার করতে না চায়। বিয়ে মানে আত্মসম্মান বিসর্জ্জন নয়! আজকের দিনে এ-কথা না মেনে উপায় নেই।" সুনন্দার মুখ চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল, কানের ডগা লাল হইয়া উঠিল।

লটি তখন বলিয়া চলিয়াছে, "এই আমাকেই দেখ না, শাশুড়ীর মত এঁর মত তাঁর মত অত জঞ্জালের মধ্যে আমি নেই। মিঃ ব্যানার্জ্জিকে বললাম সোজা, ক্রীস্‌মাসের বন্ধে আমি কলকাতা যাব। রাতদিন তোমার সঙ্গে সব মফঃস্বলের শহরে ঘুরে ঘুরে বিরক্তি ধরে গেছে, এইবার কলকাতায় একটু এন্‌জয় করতে চাই। উনি ছুটির আগের দিন বার্থ রিজার্ভের বন্দোবস্ত করে দিলেন, ব্যস আর কি!"

রেবা কহিল, "নিশ্চয়! এক জন শিক্ষিতা স্বাধীন স্ত্রীলোকের ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছার বিরুদ্ধতা করবে, এমন স্বামী আজকালকার দিনে খুব কমই আছে।"

লটি বলিল, "সে কথা ঠিক্। তবে সুনন্দার স্বামী নিজেই স্বাধীন নন। তিনি এখনও তাঁর বাবার উপর নির্ভর করছেন। ইকনমিক্

ইণ্ডিপেণ্ডেন্স (আর্থিক স্বাধীনতা) এখনও তাঁর হয় নি। কাজেই যে নিজে স্বাধীন নয় সে নিজের স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা দেবে কেমন ক'রে ?"

লতিকা রায় আরও এক পর্দ্দা সুর চড়াইয়া কহিল, "সত্যি তাই মনে হয়, নিজে আর্থিক স্বাধীনতা না অর্জ্জন ক'রে বিয়ে করা বর্ব্বরতা। তা সে যত বড়লোকের ছেলেই হোক্ না কেন। ইউরোপ এই আদর্শ মেনে চলে তাই তার এত উন্নতি। ধর না কেন, ওদেশে লোকে বিয়ে ক'রেই স্ত্রীর সঙ্গে হনিমুন্ (মধুচন্দ্রিকা) করতে যায়। সংসারের অপর সমস্ত কর্ত্তব্য অন্য সব সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তারা দুজনে দুজনকে জানবার চেনবার সুযোগ করে নেয়। আমার নিজের বেলাতেও অতটা না হোক অনেকটা ঐ রকম গোছের হয়েছিল। বিয়ের পরের সপ্তাহে ওঁর ছুটি ফুরুল, (লতিকাব স্বামী মুন্সেফ) বদলী হলেন সাতক্ষীরায়। আমাকেও নিয়ে গেলেন সঙ্গে। নতুন জায়গায় দুজনেই একেবারে একা।" লতিকা এই পর্য্যন্ত বলিয়া একবার সানুকম্প দৃষ্টিতে সুনন্দার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টি যেন বলিতে চাহিল, আমাদের সঙ্গে কিন্তু সুনন্দার কত তফাৎ! সে বেচারা হয়ত বিয়ের পরে প্রকাণ্ড এক সংসার এবং ততোধিক অপরিচিত পবিজনমণ্ডলীব মধ্যে আড়ষ্ট বধূজীবন যাপন করিবে।

সুনন্দা এই সমস্ত আলোচনা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। শুনিয়া শুনিয়া তাহার নিজেরও মনে হইতেছিল, রূপে গুণে শিক্ষায় সে নিজেও ত লতি বা লটির চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তবে তাহার কপালেই বা এমন নিগ্রহ হইতে চলিয়াছে কেন ? সত্যই যেন তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা মহা অন্যায় অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। তথাপি সহপাঠিনীদের এই বিপুল সমবেদনা প্রকাশও সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, তাই আতিথ্যের ছল করিয়া চা জলখাবারের একটু

আয়োজনের কথা মাকে বলিয়া আসিবার জন্য কিছুক্ষণের ছুটি লইয়া সে হৃদয়ভারাক্রান্ত বেদনা বহন করিয়া তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিল।

২

বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়া সুনন্দা দেখিল সত্যই মস্ত বড় সংসার। প্রাসাদোপম অট্টালিকাব কত কক্ষ, কত অলিন্দ—সমস্তই উৎসুক নরনাবীপূর্ণ। বাহিরের লোক ছাড়িয়া দিলেও বাড়ীর লোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। অলক্তকরাগরঞ্জিতপদে নববধূ আসিয়া দুধে-আলতাব পাথরের উপর দাঁড়াইল। নূতন বেনারসীর আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে শাশুড়ী আনন্দাশ্রু সংবরণ কবিয়া বড় আদরে পুত্রবধূকে ববণ করিতে আবম্ভ করিলেন। শ্বশুর মহামূল্য হীরকখচিত নেকলেসের ভেলভেট-মণ্ডিত বাক্সটি বধূব হাতে দিয়া মুখ দেখিযা স্নেহহাস্যে কহিলেন, "যত বড় বড় মামলাতেই আমি জিতে থাকি না কেন তোমার এজলাসে আমি চিরদিন হেরেই থাকলাম মা। এই কথাটি আজ থেকেই তোমাকে জানিয়ে গেলাম।" দেওর-ননদেরা হাস্যময় কৌতুকমাখা অন্তরে আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এ বাড়ীব ত্রিতলেব উপর সবচেয়ে নির্জ্জন এবং সবচেযে ভাল ঘরখানি বধূব জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেখানে তাহাব আবাম ও স্বাচ্ছন্দ্যেব জন্য সকল বকম উপকবণই সজ্জিত ছিল। কিন্তু এই সমস্ত আমোদপ্রমোদ কথাবার্ত্তা আদর-উৎসবের মধ্যেও এই ঘবের অধীশ্বর যিনি তাঁহাব লেশমাত্র ছায়া দেখা গেল না। সেই যে কলিকাতায বাসরঘবে সুনন্দা তাহার স্বামীর গম্ভীর মধুর মূর্ত্তি চকিতের মত দেখিযাছিল তাহাব পর তাঁহাকে আব দেখে নাই কিংবা আলাপ হয় নাই। বিবাহের পবেব দিন রাত্রিতে তাহাবা ট্রেনে ছিল। সে রাত্রি কালরাত্রি বলিয়া নববিবাহিত দম্পতীর জন্য ট্রেনে আলাদা আলাদা কামরা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কালরাত্রিতে পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে বিষময় ফল

হয় ; তাই সুনন্দাব শ্বশুববাড়ী হইতে সেজন্য কঠোব বিধিনিয়মেব ব্যবস্থা হইযাছিল।

তাব পব এ বাড়ীতে পদে পদে কত গুরুজন আত্মীযকুটুম্ব। সুনন্দাব স্বামী শচীকান্ত আধুনিক কালেব আধুনিক শিক্ষায শিক্ষিত যুবক হইলে কি হইবে, এ বাড়ীর হাওযাতেই আজন্ম মানুষ হইযাছে। সে লাজুক, ভীরু, ত্রস্ত। দিনেব আলোয গুরুজনেব সান্নিধ্যে মনেব একান্ত কামনাকে সংবরণ কবিযা সে প্রিযতমাব নিকট হইতে অনেক দূবে বহিযাছে। হৃদয যদি উতলা হইযাছে বাহিবে তাহা প্রকাশ হইতে দেয নাই।

ক্রমে সন্ধ্যাব তন্দ্রামঘ অন্ধকাবেব যবনিকা পৃথিবীব উপব প্রসাবিত হইল। নক্ষত্রখচিত আকাশেব মহান নীববতা সেই ত্রিতলেব ছাদে ঘনীভূত হইযা উঠিল। সাবাদিন উৎসবেব পব সুনন্দা শ্রান্তিতে অবসন্ন হইযা পড়িযাছিল। মোহ, মধুবতা এবং একটা নিঃসীম কারুণ্যে তাহাব মন কানায কানায ভবিযা উঠিযাছে। ভাবী জীবনেব অনাস্বাদিত মাধুর্য্য স্মবণে আসিযা মনকে বিবশ কবিযা তুলিতেছে, অথচ আশৈশবেব চিব-পবিচিত প্রিযজনদেব পিছনে ফেলিযা আসিযাছে, তাহাদেব জন্য সমস্ত মন এক একবার বেদনায টন টন কবিযা উঠিতেছে। ইহাবই মধ্যে কখন এক সময হঠাৎ সে অবাক হইযা দেখিল, বিবাহেব আগে সেই যেদিন লটি আব লতিকাবা আসিযাছিল, সেদিন যেমন দৃঢ়নিশ্চযতাব সহিত মনে হইযাছিল তাহাব বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড একটা অন্যায অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাব স্বাধীন সত্তাকে জোব কবিযা নিষ্পিষ্ট কবিবাব ষড়যন্ত্র চলিতেছে,—সে ভাবটা কেমন কবিযা জানি না কখন নিঃশেষে মিলাইযা গিযাছে। সে বেদনা-বোধও আব নাই। এখন আব সুনন্দাব ঘবে লোকজন নাই। আসন্ন সূর্য্যোদযেব আগে সমস্ত প্রকৃতি যেমন উন্মুখ প্রতীক্ষায নিথব নীবব হইযা থাকে তেমনই সমস্ত ঘব নিঃশব্দ নির্জ্জন।

কখন এক সময একটা স্নিগ্ধমধুব সুগন্ধে মুখ ফিবাইযা সে দেখিল

শচীকান্ত খালি পাযে পিছনে আসিযা দাঁডাইযাছে, তাহাব গলায মালতী-ফুলেব একটা মালা। সহসা অলঙ্কাবেব শিঞ্জনেব সহিত স্ত্রী-কণ্ঠেব কল-হাস্য শোনা গেল। খোলা জানালার ঠিক বাহিব হইতে কে বলিল, "ঠাকুরপো, চিবকাল শুনে এসেছি শ্রীবাধাই অভিসাবেব পথে পা বাডিযে-ছেন। কিন্তু এ যে তোমাব অভিসাবেব বেশ। একালে কি ভাই সবই উল্টো হয ?"

শচী হাসিযা বলিল. "দোহাই বৌদি, আব জ্বালিও না। সাবাদিন কি কষ্ট দিযেছ, আব কি কষ্টে কাটিযেছি সেইটে মনে ক'বে এখন একটু দযা কব।"

বাহিব হইতে সানুকম্প কণ্ঠে কে কহিল, 'সত্যি আমাদেব অন্যায হচ্ছে ঠাকুবপো। আচ্ছা এত চললুম ভাই। আকাশেব দিকে চেযে দেখ সপ্তমাব চাদ উঠতে আব বড দেবি নেই।"

কিছুকাল নাববে কাটিল, শচী একটা দীঘনিঃশ্বাস ফেলিল। সুনন্দা তেই ঢোক কলেজে আই-এ পর্য্যন্ত পডিযাছে, এবং সপ্রতিভ। সে লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'সাবাদিন আপনাব কি কষ্টে কেটেছে ? ওবা বুঝি খুব কষ্ট দিযেছেন আপনাকে ?"

শচী বিস্মিত হইল, মগ্ধ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞও হইল। কলাবৌযেব ঘোমটা খসাইযা প্রথম কথা কহাইবাব যে দুশ্চব তপস্যা তাহা তাহাব কপালে এত সুগম হইল দেখিযা সে কৃতজ্ঞতা অনুভব না কবিযা পাবিল না। কোন ক্রমে উত্তব দিল, 'কষ্ট ? হ্যা, না, তা কষ্ট নয ·· মানে ' মানে কি ?—সুনন্দাব ভাবি হাসি পাইতেছিল, বিশ্ববিদ্যালযে যে-ব্যক্তি বি-এ পবীক্ষায প্রথম হইযাছে সে যে সামান্য একটা কথা বলিতে শীতকালে ঘামিযা ওঠে তাহা আগে জানিত না।

" মানে সাবাদিন " শচী আবাব থামিল।

আব একবাব চেষ্টা কবিযা বলিযা ফেলিল, "এত কষ্ট হবে আমি আগে

বুঝতে পারি নি ··মানে সারাদিন তোমাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না। ওঁরা তোমাকে ঘিরে ছিলেন।"

সুনন্দা হাসিয়া মুখ নামাইল। তাহার পর আবার মুখ তুলিয়া কহিল, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন না। আচ্ছা, সত্যি যদি আপনার কষ্ট হয়ে থাকে ওঁদের না মানলেও ত পারতেন।" শচীকান্তর লজ্জা অনেকটা কাটিয়াছিল। সে নিকটস্থ চেয়ারটার উপর বসিয়া কহিল, "কিন্তু ওঁরাই ত আমার জীবন-কবিতার ছন্দ সুনন্দা। কবিতা এত অসন্দিগ্ধভাবে আমাদের মনকে অভিভূত করে কেন জান, সে ছন্দের বাঁধনকে স্বীকার করে ব'লে। তোমাকে দেখবার যে ব্যাকুলতা সেটাকে ওঁরা বিধিনিষেধের ছন্দে বেঁধে কবিতা ক'রে তুলেছেন। এলোমেলো অসম্বন্ধ ভাবে আর ত তা প্রকাশ হবার উপায় নেই। সারাদিনের পর সন্ধ্যার অন্ধকার যখন অনিমেষ হয়ে উঠবে, তখন তোমায় আমায় দেখা। এর ভিতর কঠোরতা আছে, কিন্তু আর কিছু কি নেই?"



আরও কিছু ছিল নিশ্চয়, সুনন্দা ক্রমশঃ তাহা তীব্রভাবে অনুভব করিতে লাগিল। শচী তিন-চার দিন পরেই পাটনা চলিয়া গিয়াছে। তাহার ল-কলেজ খোলা। কামাই করিবার উপায় নাই। পরস্পরকে একান্ত করিয়া পাইবার কামনা যত দুর্ব্বার, বাধাও কি ততই অলঙ্ঘনীয়। কাল হইতে গুড্ ফ্রাইডের ছুটি আরম্ভ হইবে, শচীকান্ত লিখিয়াছে রাত্রির ট্রেনে আসিবে। সমস্ত বাড়ীতে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সবারই চেষ্টা একই পথগামী। শচীর মা ব্যস্ত হইয়াছেন, বড় মাছ পাওয়া গেল কি না, গোয়ালাকে বেশী করিয়া দুধ দিতে বলা হইয়াছে, শচীর জন্য ছানা মাখন ক্ষীর সন্দেশ হইবে। বাগানের মালী ব্যস্ত হইয়া কাঁচি-হাতে পাতা-বাহারের পাতা সমান করিয়া ছাঁটিতে লাগিল। মস্ত বড় গোলাপের তোড়া

বাঁধিয়া রামচরণ চাকরের হাতে বড়বাবুর উপরের ঘরে পাঠাইয়া দিল। তিনি ফুল খুব ভালবাসেন, ফুলের তোড়া পাইলে মালীর উপর হয়ত সন্তুষ্ট থাকিবেন। তেতালার ঘর রোজই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, কিন্তু আজ চাকরে বিশেষ করিয়া সকাল হইতে ঝাড়ামোছা সুরু করিল। আর সুনন্দা বাক্স খুলিয়া তাহার বহুযত্নে কারুকার্য্যখচিত করিয়া সেলাই করা ফুলকাটা ঝালর-দেওয়া বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, শয্যা-আস্তরণ বাহির করিল। এগুলি সে দ্বিপ্রহরের বিরাম অবকাশে কত দিন ধরিয়া একটু একটু করিয়া সেলাই করিয়াছে। ইহারই ভিতর তাহার সেবাকুশল হাত দুখানির সমস্ত আদর যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল, সেই আলোর সঙ্গে সুনন্দার সমস্ত দেহমন যেন পূজারতির মত কাহার উদ্দেশে জ্বলিয়া আপনাকে সার্থক করিতে চাহিল। তখন নীচে সে পান সাজিয়া একটি রূপার ডিবার খোলে গোলাপজল ছিটাইয়া রাখিতেছিল। মোটরটা গেটের ভিতর ঢুকিল। জুতার আওয়াজ, হাসি, সেই গলার স্বর মাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহার সহিত গল্প করিতেছেন। পাশের ঘরে সুনন্দার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হইয়া উঠিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে ছোট ননদ তরলা আসিয়া হাসি হাসি মুখে ফিস ফিস করিয়া বলিল, বৌদি ভাই, একবার তেতালায় যাও। জোর তলব এসেছে। দাদা যেমন ক'রে বললেন তাতে আমার হাসি পেল। দেখ্ যদি যাস্, আমি বলে দি কেমন ক'রে। এইবেলা বাবা এখনও মক্কেলের কাজ দেখছেন সদরে। মা এইমাত্র রান্নাঘরে গেলেন। সামনে কেউ নেই, দক্ষিণ দিকের দালানটা ঘুরে ওপাশের ঘরটা দিয়ে সামনেই সিঁড়ি পড়বে। আচ্ছা, আমি না-হয় বারান্দার আলোটা নিবিয়ে দিচ্ছি।" তরলা এই মধুর দৌত্যকার্য্যে সহায়তা করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল শেষ পর্য্যন্ত। সুনন্দা তাহার হাতের সোনার কঙ্কণ আর জড়োয়ার আর্মলেট এবং চৌদ্দ গাছা চুড়ি সাবধানে চাপিয়া সন্তর্পণে

উপরে গেল। চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ পাছে শোনা যায়, পাছে তাহা কোন গুরুজনের কানে গিয়া তাহার ব্যাকুল অভিসার-যাত্রাকে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে তাহার সাবধানতার অন্ত রহিল না।

একটি একটি করিয়া সিঁড়ি পার হইয়া আসিতেছে, ক্রমশঃ ছাদের উপর জ্যোৎস্নালোক দেখা গেল, ঘরের খোলা জানালা দিয়া টেবিলের উপরকার ফুলের তোড়াটা দেখা যাইতেছে। আরও আরও কাছে… কাহার উতলা দীর্ঘনিঃশ্বাস সুগন্ধভারাক্রান্ত কক্ষের বায়ুস্তরকে বিবশ করিয়া তুলিয়াছে। হঠাৎ সুনন্দার মনে হইল, এই পদে পদে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, অলঙ্কারের শিঞ্জনের শব্দে অবধি লজ্জায় মরিয়া গিয়া এত ভয় এত পরাধীনতার মিলন, সে কি কোন মধুচন্দ্রিকার চেয়ে মাধুর্য্যে এবং আকর্ষণে লেশমাত্র ছোট? সেই যে প্রথম দিন তিনি বলিয়াছিলেন, বিধিনিষেধের ছন্দে বাঁধিয়া সংসার ত তাহাদের মিলনকে কবিতা করিয়া তুলিয়াছে, সেই কথাটা তাহার মনে পড়িল। হনিমুনের অবাধ বিস্তৃতি ও স্বাধীনতা নাই বা থাকিল, তবু ছন্দের বন্ধন স্বীকার করিয়া এই যে মিলন, গভীরতায় ও নিত্যনূতনতায় কবিতার মতই তাহা অনবদ্য এবং কবিতার মতই তাহা বেগবতী।



কিন্তু বিধাতা সুনন্দার মনের কোণের গোপনতম সাধও অপূর্ণ রাখিলেন না। অন্য সব দিকে সে যথেষ্ট সুখী হইলেও, বোধ করি মাঝে মাঝে কখনও তাহার মনে হইত লতি আর নটদের কথা। প্রকাণ্ড সংসারের সুনির্দ্দিষ্ট সুনিয়ন্ত্রিত ছন্দের তালে সুনন্দার জীবন চলে। শচীকান্ত কলেজের ছুটিতে বাড়ী আসে। সারাদিনের পর রাত্রির অন্ধকারে লজ্জাচকিত কম্প্রপদে শয়নকক্ষে তাহাদের দেখা হয়। একা

অজানা নূতন দেশে কেবল সে আর তাহার স্বামী মুখোমুখী। সেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই, সময়ের কোন আদিঅন্ত নাই, কোন বিধিনিষেধ নাই। সেটা যে কেমন বস্তু ধারণা করিতে পারে না, কিন্তু ধারণা করিতে সাধ যায়। এত দিন যাহা কল্পনার রঙে রাঙিয়া ছিল, এবারে হঠাৎ এক দিন তাহা সত্য হইয়া উঠিল। গরমের ছুটিতে বাড়ীতে আসিয়া শচী জ্বরে পড়িল। জ্বর সামান্য কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর চিকিৎসা, ডাক্তারেরা সহজে হাতছাড়া করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলিলেন, এখনও দুর্ব্বলতা যায় নাই, কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় হাওয়া বদলানো দরকার। শচীর বাবা ব্যস্ত হইয়া তখনই তাঁহার এক বন্ধুকে চিঠি লিখিয়া সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্যকর এক শহরে ছোট বাসা ঠিক করিলেন। কথা ছিল, ঠাকুর-চাকর লইয়া শচী একা যাইবে, কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে সে মায়ের কাছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন ভাবটা প্রকাশ করিয়া ফেলিল যে, অসুস্থ শরীরে বাড়ীর লোক এক জন সঙ্গে না থাকিলে তাঁহার মন সুস্থির থাকিবে না, এই জন্য বৌমাকেও তিনি সঙ্গে দিলেন। নহিলে মায়ের মন মানে না। নদীর ধারে ছোট্ট শহরটি, রাঙা মাটির রাস্তা। চারি দিকে পলাশবন। মোটরে আসিতে আসিতে সুনন্দা আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সঙ্গে কেবল এক জন চাকর আর উড়িয়া ঠাকুর আছে।

মৃদুস্বরে সে কহিল, "দেখছ বিয়ের এক বছর পরে এত দিনে এই আমাদের মধুচন্দ্রিকা।"

দিগন্তবিস্তৃত আকাশের দিকে চাহিয়া শচীকান্ত হাসিয়া বলিল, "সত্যি।"

দিন পনর পরে :

পূর্ব্বদিন একটা পাহাড়ে বেড়াইতে গিয়া ফিরিতে রাত হইয়াছিল আর পথশ্রমে সুনন্দা ক্লান্ত ছিল, বেলা পর্য্যন্ত তাহার ঘুম ভাঙে নাই। শচী

উঠিয়া বাহিরের বারান্দার ইজিচেয়ারে বসিয়াছে, চাকরটা আসিয়া বলিল, "বাবু কয়লা কুছ্ আছে নাই। চায়ের পানি হামি কি লিয়ে করিব ?"

ভোরের আকাশের দিকে চাহিয়া শচী মুগ্ধবিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ ভৃত্যের এবম্বিধ প্রশ্নে অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিল। চাকরটা আবার বলিল, "বহুমায়জী এখন উঠে নাই, বাকস খুলিয়ে আপনি পয়সা দিন, হামি কয়লা লিয়ে আসি।"

ঠিক সেই সময় ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া সুনন্দা পাশের দরজা দিয়া বারান্দায় আসিল। আজ সূর্য্যোদয়ের আগে শচী উঠিয়াছে এবং একা বসিয়া সূর্য্য উঠিতে দেখিয়াছে, তাহাকে উঠায় নাই। এজন্য সহস্রবিধ অভিমান ও অনুযোগের বাণী মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সে আসিতেছিল, শচী বলিল, "ওগো চাকরটা কি বলছে, কয়লা না কি যেন নেই। বাক্স খুলে ওকে পয়সা দাও না।"

সুনন্দা বাক্স খুলিবার জন্য চাবির অন্বেষণ করিতে ঘরে গেল। বালিশের তলা, আলমারির দেরাজ, টেবিলের উপর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া চাবি মিলিল না। তখন বিপন্ন মুখে বাহিরে আসিয়া কহিল, "চাবিটা যে পাচ্ছি নে। কাল আঁচলে বেঁধে পাহাড়ে গিয়েছিলুম। ছুটোছুটি করবার সময় নিশ্চয় পড়ে গেছে।"

চাকর বলিল, "তবে তো মুস্কিল হ'ল বাবু। বিহানে উবারে কই চীজ মিলবে না ত।"

ক্রমশঃ সাঁড়াশি দিয়া বাক্সের তালা ভাঙা হইল।

অনেক বেলায় চা খাইয়া শচী ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "ওগো ব্লেড আনিয়ে রেখেছ ? আজ কত দিন ধ'রে তোমাকে বলেছি আনিয়ে রাখতে। তিন-চার দিন আমার শেভ্ করাই হয় নি।" সুনন্দা তখন বারান্দায় বসিয়া বাজারের হিসাব মিলাইতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া গেল, ঐ যাঃ, বাজারে সব জিনিষই ত এক রকম আনিতে বলিয়াছিল

কিন্তু ব্লেড বলা হয় নাই। কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া সে কহিল, "শোন, সত্যি ভুলে গেছি।" শচী বাহিরে আসিয়া বলিল, "কিছু তোমার মনে থাকে না। আর দিন কতক পরে উকীল হয়ে পাটনার হাইকোর্টে যখন আলাদা বাসা ক'রে বসতে হবে, তখন তুমি কি রকম গিন্নী হবে? তখনও কি সাঁড়াশি দিয়ে তালা ভাঙতে হবে? ও খুকী, ওটা কি করছ? মোচার আঠা যে দামী কাপড়টায় লাগছে, সরে ব'স।"

সুনন্দা তখন হিসাবের খাতার অঙ্কপাত কিছুতেই মিলাইতে পারিতেছিল না, মৃদুকণ্ঠে হিসাবে ঠিক দিতেছিল, দু-সের বেগুন যদি ছ-আনা হয় আর দুটো কপি পাঁচ আনা তা হ'লে···শচী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। তরকারি কুটিতে কুটিতে সুনন্দার মনে পড়িতে লাগিল, সেই যেবার গুডফ্রাইডেব ছুটিতে প্রথম উনি বাড়ী আসেন তখন কতক্ষণ পর বারান্দার আলো নিবাইয়া এ-দালান সে-দালান ঘুরিয়া সে তেতালার ঘবে গিয়াছিল, তখন উনি কখনও সামান্য একটা ব্লেড আনানো হয় নাই বলিয়া এমন করিয়া বকিতে পারিতেন না। এক মিনিট দেরি তখন তাঁর কাছে এক যুগ ছিল।

শচী বাবান্দাব ইজিচেয়ারে বসিয়া ভাবিতেছিল, প্রথম যখন সে বাড়ী আসে, সুনন্দাব সহিত দেখা হইলে এ-কথা সে-কথার পরে সে বলিযাছিল, বৈষ্ণব কবিতাব একটি পদ আমার প্রায়ই মনে পড়ত সুনন্দা। আমি নিজে কাব নই, তাই সেই ধাব-করা ভাষায় মনেব কথা বলছি,

"যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥"

আজ কিনা সারা সকাল সে-ই সুনন্দার সহিত কেবল কয়লার পয়সা, বাক্সের চাবি আর দাড়ি কামাইবার ব্লেডের বিষয় ছাড়া অন্য কথা বলে নাই। নাঃ, ক্ষমা চাওয়া দরকার।

সুনন্দা তখন মোচার আঠা আঙুল হইতে ছাড়াইতে ছাড়াইতে ।বিতেছিল, নাঃ, দরকার নেই আমার মধুচন্দ্রিকার। সেই গোপন, ্র, বাধায় প্রতিহত, মিলনে অসীম সেই পরাধীন জীবনই আমার ভাল। ইটুকুর মাঝে যে কত ধরেছে লটিরা তা জানে না।

বিরহ ও মিলন

১

অমলা প্রায় এক বৎসর পরে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। তাই সবই নূতন লাগিতেছে, সমস্তই মধুর মনে হইতেছে। আশ্বিনের প্রথম সপ্তাহ, আকাশে শরতের নীলিমা। গাছে শিউলিফুল ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, ঘাসে ঘাসে শিশিরের বিন্দু মাণিকের মত টল-টল করিতেছে। এই প্রাকৃতিক শোভার সঙ্গে মিল রাখিয়া বাড়ীতেও উৎসবের রাগিণীর আমেজ লাগিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার মেজবৌদি মেজদার সঙ্গে সেই সুদূর দিল্লীতে থাকেন, মেজদা সেখানে চাকরী করেন। পূজার ছুটী পাইয়া তিনিও আসিয়াছেন। মেজবৌদি সুন্দরী, বিদুষী এবং রসিকা। যখন তিনি আসেন, হাসি, গল্প, গানে বাড়ীটাকে একেবারে মাতাইয়া রাখেন। অমলার ছোট বোন কমলার এক নামজাদা জমিদার বাড়ীতে বিবাহ হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ীর কড়া নিয়ম-কানুন অনুসারে সে বেচারা বড় একটা বাপের বাড়ী আসিতে পায় না। কিন্তু এবার পূজার আগে সে-ও আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা গানের আসর বসিয়াছে। অমলার মেজবৌদি এস্রাজে সুর দিয়া গাহিতেছিলেন,

"আলো ঝল-মল, পূর্ণিমারি জোছনা রাতে
সারা নিশি জাগি ছিনু ফুলবনে সে ছিল সাথে।
নয়নে কে যেন বুলালো স্বপন-মায়ার তুলি,
প্রথম প্রেমের মধুমঞ্জরী গো, উঠেছে দুলি।"

গায়িকার করুণ মধুর সুর সত্য-সত্যই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত দিগন্তে যেন মায়াজাল রচনা করিতেছিল। তথায় যাঁহারা বসিয়াছিলেন প্রত্যেকেরই

মনে স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রেমবিবশ প্রথম প্রেমের দিনগুলি মনে পড়িয়া যাইতেছিল। মনের মধ্যে গানের তানের মত গুঞ্জরণ উঠিতেছিল, "প্রথম প্রেমের মধুমঞ্জরী গো, উঠিছে দুলি।"

অমলার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। যদিও সে আসিবার সময় একরকম জোর করিয়া ঝগড়া করিয়াই বাপের বাড়ী আসিয়াছে। আসিবার সময় স্বামী বেচারা একা থাকিবার নির্দ্দয়তা একটুখানি প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার আশায় যখন বলিয়াছিলেন, "তুমি তো বেশ স্ফূর্ত্তিতে থাকবে, আর আমি একা ব'সে কড়িকাঠ গুণবো। না, তাও যে ছাই আজ-কালকার বাড়ীগুলোতে কড়িকাঠ থাকে না, সমস্তই কংক্রীটের। যাক্, কড়িকাঠ নাই থাকুক, একা ব'সে মাঠের সামনের ঐ তালগাছগুলো গুণবো। তারপরে যখন গোণা শেষ হয়ে যাবে, তখন কি করবো ব'লে যাও।"

তখন সে কাণের কর্ণভূষা এবং হাতের বাজু আন্দোলিত করিয়া বলিয়াছিল, "আহা মশাই, আর বাড়াতে হবে না। পুরুষ মানুষরা যা স্বার্থপর তা বোঝাই গেছে। প্রায় এক বছর হ'ল বাপের বাড়ী যাই নি, তবুও বলবে ঐ কথা। কিছু একটা ছুতো ক'রে যাওয়া বন্ধ করবার মতলব আর কি।" তথাপি আজিকার এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সন্ধ্যায় গানের সুরে সুরে তাহার হৃদয় বিমথিত হইয়া উঠিল। মনে হইতে লাগিল, আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র কি যেন এক করুণ রাগিণী সঞ্চারিত হইয়া ফিরিতেছে। ইহার পর হইতেই তাহার মনটা বিকল হইয়া গেল। তখন মেজবৌদি পরিহাস করিতে আসিয়া তিক্তস্বরে শুনিলেন এবং ছোট বোন কমলা উলের প্যাটার্ণ দেখাইতে আসিয়া তিরস্কৃত হইয়া ফিরিয়া গেল।

কয়েকদিনের মধ্যেই পূজা আসিল এবং কাটিয়া গেল। কিন্তু এতদিন ধরিয়া অমলা পিতৃগৃহে আসিবার, সকলের সহিত মিলিয়া আনন্দ করিবার

যত কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সে সমস্তই ছায়াছবির মত মিথ্যা হইয়া গেল। পুরাতন পৃথিবী ঠিক সেই আগেকার মত শরৎশ্রীমণ্ডিত হইয়া চিরনূতন হইয়া উঠিল, দীঘির কালো জলে সূর্য্যের আলো পড়িয়া টলমল করিতে লাগিল, আঙ্গিনার শিউলি গাছটা ফুলে ফুলে ভাঙ্গিয়া পড়িবার যোগাড়। কিন্তু প্রকৃতির এই সমারোহের মধ্যে গোপনে যে একটি অশ্রান্ত করুণ বীণা ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, অমলাকে তাহা কেবলই ভিতরে ভিতরে বিকল করিয়া তুলিতে লাগিল। অবশেষে সে কাগজ কলম লইয়া স্বামীকে লিখিল—

"এখন তো তোমার ছুটী ফুরাইবার দেরী আছে, তুমি একবার এখানে এস। তোমাকে একান্ত মিনতি রহিল আমার, এ অনুরোধ উপেক্ষা করিও না। এখানে আমাদের বাড়ীর সামনে যে দীঘিটা আছে, তাহাতে পদ্ম ফুটিয়াছে, শিউলিফুলের যেন গালিচা পাতা হইয়া থাকে ভোর-বেলাটায়। তোমার কথা তখন মনে পড়িয়া যায়। আর মেজবৌদিকে তুমি জান, তাঁহার হাতের চা এবং তাঁহার গলার গান দু'টোই পরম লোভনীয় বস্তু। তার উপর এখানকার বাজারে এমন চমৎকার ফুলকপি উঠিয়াছে যে, না দেখিলে বিশ্বাস হয় না। তোমাকে বাদ দিয়া এ সব উপ-ভোগ করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। আশা করি,অনুরোধ রাখিবে।"

চিঠিখানা লিখিয়া অমলা কয়েকবার উল্টাইয়া দেখিল, ঠিক মনোমত হয় নাই। মনের আবেগের শতাংশের একাংশও হয় তো ঠিক প্রকাশ পায় নাই। তবু বিবাহের সাত বৎসর পরে চিঠিতে রবি ঠাকুরের কবিতা উদ্ধৃত করিতে কেমন যেন লজ্জা করে। তার চেয়ে ঢের সহজেই কলমের আগায় ফুলকপির কথা আসিয়া পড়ে।

ঠিক মনোমত না হইলেও চিঠিখানা লিখিয়া সে যথা নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাইয়া দিল এবং সাধ্বসচিত্তে উত্তরের পরিবর্ত্তে একটি পরিচিত প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া রহিল। কারণ, সে

ঠিক জানিত, তাহার এ মিনতি কখনও ব্যর্থ হইবে না। যে ভদ্রলোক পত্র পাইবেন, তিনি বারোটার ডাকে চিঠি পাইয়া সেই দিনই রাত্রির এক্সপ্রেস অবশ্যই ধরিবেন।

অথচ ব্যাপারটা ঘটিল অন্যরূপ। তিনি তো আসিলেন না, প্রায় পাঁচ ছ'দিন তাঁহার নিকট হইতে কোন উত্তরও আসিল না। এই ক'দিন অমলা যে কি দারুণ দুশ্চিন্তায় কাটাইয়াছে, তাহা সে নিজেই স্মরণ করিতে পারে না। হাজার বার ইচ্ছা হইয়াছে, বাড়ীর সরকারকে দিয়া টেলিগ্রামের ফর্ম্ম আনাইয়া একটা তার করিয়া দেয়। কিন্তু যথাসাধ্য গোপনে করিলেও প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা যথেষ্ট এবং প্রকাশ হইয়া গেলে মেজবৌদির কৌতুক শাণিত তীক্ষ্ণ হাসি এবং অজস্র বিদ্রূপবাণের বর্ষণ যে কেমন হইবে, কল্পনা করিয়াও ভয় হয়। এমনই দ্বিধান্দোলনের ভিতর চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। পাঁচ দিন পরে অমলার স্বামী প্রকাশের নিকট হইতে চিঠি আসিল যে, সে আসিবার জন্য খুবই উৎসুক, কিন্তু অফিসের যিনি বড়বাবু, তাঁহার একমাত্র পুত্রের সাংঘাতিক নিউমোনিয়া হইয়াছে। তাহাকেই দু'বেলা ডাক্তার ডাকা, ঔষধ আনা, রাত্রি জাগা, সমস্তই করিতে হয়। বড়বাবু একটু কৃপণস্বভাবের বলিয়া লোকজন বড় একটা রাখেন না। অফিসের অন্যান্য বাবুরাও পূজার ছুটীতে যে যাহার বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশের ঘাড়েই এখন সমস্ত ভারটা আসিয়া পড়িয়াছে। বলিতে কি, এই কয়েকদিন সে নাওয়া-খাওয়ার অবধি অবসর পায় নাই। অফিসের বড়বাবু, চাকরীর হর্ত্তা-কর্ত্তা। এই দারুণ বেকার-সমস্যার যুগে হঠাৎ তাহার অমতে কিছু করাও যায় না। পত্রের শেষে প্রকাশ আশ্বাস দিয়া লিখিয়াছে, অমলা যেন রাগ না করে। তথায় যাইবার জন্য সে নিজেও বড় ব্যাকুল। বড়বাবুর ছেলেটি একটু ভালো থাকিলেই সে রওনা হইবে।

এই নিতান্ত সাধারণ চিঠিখানি অমলার কাছে একান্ত অসাধারণ বলিয়া

প্রতিভাত হইল। সে দরজায় অর্গল রুদ্ধ করিয়া দশবার করিয়া চিঠিখানি পড়িল এবং তাহার পর সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিল। এই এক মাসের বিরহ এবং অদর্শনের ফলে তাহার মন যেন নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল। সে আপন মনে নিরালায় বসিয়া তাহার জীবনের অধ্যায়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহারা স্বামি-স্ত্রী দুইজনে যখন একত্র ছিল, তখন কত সময় অকারণে সে কত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে, কঠিন কথা বলিয়াছে, একে একে মনে পড়িতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, এ কথাটা তখন অমন করিয়া না বলিলেই হইত, এ কাযটা তেমনভাবে না করিয়া সে যেমন চাহিতেছিল, তেমন করিলেই চলিত। তাহাতে কি-ই বা এমন মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত!

২

বাড়ীর ছেলেরা জল্পনা করিতে লাগিল, সবাই একত্র হইয়াছে, পূজার পর নূতন ধরণের আমোদ করিতে হইবে। সেদিন সকাল হইতেই বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া গেল, ষ্টীমারে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া হইবে!

শরতের শীর্ণস্রোতা শুভ্র স্বচ্ছ গঙ্গাবক্ষে ঈষৎ বায়ুভরে অমলার কেশপাশ উড়িতেছে। ও-পারের বালুকাবিস্তীর্ণ গঙ্গার চর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, কাশের ফুলে অপরাহ্নের বাতাসে আন্দোলন জাগিয়াছে। ডেকের উপর দাঁড়াইয়া অমলা শূন্যমনে পরপারের দিকে চাহিয়াছিল। দূরে গাছপালার ক্ষীণ সবুজ কিনারা চোখে পড়িতেছে, তাহারও পরে আকাশ দিগ্‌বলয়ে মিশিয়াছে। নীচের কেবিনে আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের অভাব নাই। একদল তাস খেলিতেছে, একদল এস্রাজ ও বাক্স-হার্ম্মোনিয়াম লইয়া সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেছে। তাহার ছোট বোন কমলা আসিয়া কোন একটা দলে তাহাকে টানিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, "দিদি, চল না নীচে যাই। নীরেনদা, যা চমৎকার হাত

পেযেছিল, ছক্কাব হাত ছিলো, তবু সে এমন আনাড়ি যে, নিছক অমন ভালো হাতটা মাটি ক'রে দিলে। বঙেব খেলাটাও বাখতে পারলে না। মেজবৌদি বলছিলো, নীবেনদা'ব বদলে তুমি যদি বসতে, তবে সে একবাব দেখে নিত।"

"আচ্ছা, আমি একটু পবে যাচ্ছি। তুই ততক্ষণ যা। কখন ষ্টীমাব ঘাটে লাগবে জানিস ?"

কমলা জবাব দিল, "ছ'টার সময। আব কতক্ষণই বা, চাবটে তো দেখতে দেখতেই বেজে গেলো। আব বড় জোব ঘণ্টা দুই। আচ্ছা দিদি, চমৎকাব লাগছে না ভাই আজকেব দিনটা ? আমাব তো এত ভালো লাগছে যে, নামতে হবে কোন এক সমযে, মনে হলেও কষ্ট হচ্ছে।"

আব একবাব নীচে যাইবাব আবেদন জানাইযা কমলা চলিযা গেল। যাই যাই কবিযা তবুও অমলা সেই শূন্য ডেকেই দাঁড়াইযা বহিল। মনে মনে ভাবিল, কমলাব সবই ভালো লাগিতেছে, এ আব বিচিত্র কি ! ছোট ভগিনীপতি সুবেশ, সে তো আব তাহাব স্বামীব মত অবিবেচক, কর্ম্ম-সর্ব্বস্ব লোক নয। সে স্ত্রীকে পৌছাইযা দিযাই চলিযা যায নাই। এখনও আছে, ষ্টীমারে আসিযাছে এবং আবও কিছুদিন থাকিযা যাইবে। কাযেই তাহাব কথা আর কমলাব কথায আকাশ-পাতাল তফাৎ। মনে মনে সে দৃঢসঙ্কল্প কবিল, কাল সকালেই স্বামীকে চিঠি লিখিবে, হয তিনি আসুন, নয তো আব একটা দিনও সে এখানে থাকিবে না। মনে মনে একটু বাগ কবিযাই পদচাবণা করিতে কবিতে অকস্মাৎ তাহাব মনেব ভাব পবিবর্ত্তিত হইযা গেল, একটা শঙ্কা তাহাব মনে জাগিতে লাগিল। আচ্ছা, এতক্ষণ তাহাদেব সেই ছোট বাসা-বাড়ীতে কি হইতেছে ! যা অন্যমনস্ক লোকটি। একবাব জ্বলন্ত সিগাবেট মশাবিব ভিতবেই ছুঁড়িযা ফেলিযা যা অগ্নিকাণ্ড বাধাইযাছিলেন। অমলা কাছে ছিল বলিযাই সে যাত্রা অল্পেব উপর দিযা যায। তেমন ভাবের আব কোন বিভ্রাট ঘটাইযা

বসিয়া আছেন কি না, তাহারই বা ঠিক কি। আর যাহাই হউক, তিনি ভালো থাকিলে, নিরাপদে থাকিলেই যথেষ্ট। অমলা আর কিছুই চায় না। কে জানে সেই উড়ে বামুন বেটা নূতন লোক, বাসি মশলা দিয়া তরকারি রাঁধিয়া দিতেছে কি না, আঢাকা দুধে মাছি পড়িতেছে হয় তো, তাহারই বা বিচিত্র কি !

অপরাহ্ণ-সূর্য্যের স্তিমিত স্নিগ্ধ কিরণের নীচে স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার সমস্ত শোভা অমলার কাছে একান্ত নিরর্থক এবং শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। কতক্ষণে দিনটা কাটিয়া যাইবে, এই অবস্থায় ছটফট্ করিয়া কোনক্রমে তাহার সময় কাটিল।



পরের দিন সকালের ডাকেই সে চিঠি লিখিল। লিখিয়া ডাকে দিয়া তবে সে নিশ্চিন্ত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু আশ্চর্য্যও হইল। এই তো কিছুদিন আগে বাপের বাড়ী আসিবার জন্য সে কত ব্যস্ত হইয়াছিল। কত ভাবে জিদ করিয়া, তর্ক করিয়া এখানে আসিবার অনুমতি আদায় করিয়া তবে ছাড়িয়াছিল। মানুষের মন জিনিযটাই কি বিচিত্র ! কখন তাহার কি হয় আগে হইতে হিসাব-নিকাশ করিয়া কেহ বলিতে পারে না।

চিঠির উত্তর আসিল। প্রকাশ লিখিয়াছে, তাহার যাওয়া অসম্ভব। বড়বাবুর ছেলেটির বাড়াবাড়ি চলিতেছে। কিন্তু নিজেরও তাহার আর একলা থাকিতে ভালো লাগিতেছে না। ছুটীও ফুরাইয়া আসিয়াছে। পরশু দিন ভালো আছে, অমলা যদি তাহার বড়দা বা মেজদাকে সঙ্গে লইয়া ঐ দিন রাত্রির ট্রেণে চলিয়া আসে, তাহা হইলে খুব ভালো হয়।

অমলা চিঠি পড়িয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মা আসিয়া অনুরোধ করিলেন, আর দিনকতক থাকিয়া গেলে হয় না। দূরের রাস্তা

সহজে আসা হয় না। এই তো সবে সেদিন আসিয়াছে, পূরাপূরি একটা মাসও এখন হয় নাই। ইহারই মধ্যেই যাইবার তাড়া কেন?

অমলা বাক্স গোছাইতে গোছাইতে বলিল, "না মা, আর থাকা হয় না। জান তো একা বাড়ী, আর তোমার জামাই যা অগোছালো, একটি কাযও আপন হাতে করা অভ্যাস নেই। এক গ্লাস জলও নিজে গড়িয়ে খেতে পারে না।

তারপর মেজবৌদি অনুনয়-বিনয় পরিহাস-মিশ্রিত কোপ, অনেক কিছু করিয়াও তাহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিলেন না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে ছ্যাকড়াগাড়ীর মাথায় বাক্স বিছানা সন্দেশের হাঁড়ি, ফুল-কপির ঝুড়ি চাপাইয়া তাহার বড়দাদার সহিত অমলা ষ্টেশনে আসিয়া উপ-স্থিত হইল। রাত্রিব অন্ধকার চিরিয়া যতক্ষণ ট্রেণ ছুটিতেছিল, নৈশ শীতল বাতাস খোলা জানালা-পথে হু হু করিয়া ঢুকিতেছিল, ততক্ষণ অমলার মনে একটি সুমধুব ভাব আপন মাযা বিস্তার করিয়াছিল। এতদিন পরে প্রথম যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হইবে, তখন কি কথা তাঁহাকে বলিবে, কেমন করিয়া প্রথম কথাবার্ত্তা সুরু হইবে! কর্ণধারহীন অগোছালো গৃহস্থালীর মাঝখানে বসিয়া সেই অগোছালো গৃহস্থটি না জানি এতক্ষণ কি করিতেছেন। সহসা তাঁহার মুখে কি বিস্ময কি আনন্দেব বেখাই না ফুটিয়া উঠিবে!

ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল। ট্রেণে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও অমলা এক মিনিটের জন্যও ঘুমায় নাই। উত্তেজনায়, মধুব কল্পনায়, মনেব চাঞ্চল্যে তাহার কিছুতেই ঘুম আসে নাই। সকালবেলা তাহাদেব গন্তব্য ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেণ দাঁড়াইল। চারিদিকে গাড়ীঘোড়া, কুলী, গাড়োয়ান এবং ষ্টেশনের যাত্রীদের বিচিত্র কলরব। রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকাবে যে মোহাবরণ লালিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহা তখন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া কত রাস্তা, অলি-গলি পার হইয়া অবশেষে সেই

পরিচিত গৃহদরজায় আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইল। দুয়ারের কাছে হাতকাটা বেনিয়ান পরিয়া প্রকাশ দাঁড়াইয়া আছে। খিড়কির দুয়ারের কাছে চির-প্রচলিত ছাইয়ের গাদাটা ঠিক তেমনই অটল হইয়া দাঁড়াইয়া বিরাজ করিতেছে। গোয়ালের প্রাচীরের গায়ে ঘুঁটে দেওয়া হইয়াছে। কূয়ার পাশে একটা জায়গায় জল নিকাশ না হইয়া খানিকটা জল জমিয়া আছে। কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়াছে, ধোঁয়ায় সমস্ত প্রাঙ্গণটা আচ্ছন্ন হইবার যো হইয়াছে। বিরক্তিতে অমলার সারা মন ভরিয়া উঠিল। এই তো সেই চিরদিনকার অভ্যস্ত কারাগার। এখানে তাড়াতাড়ি আসিয়া ভর্ত্তি হইবার জন্য এত কি মাথা-ব্যথা পড়িয়াছিল, অথচ সে কত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল আসিবার জন্য! মনে করিলে অবাক্ লাগে। তাহার বড়দাদার বাড়ী ফিরিবার তাড়া ছিল। তিনি অমলাকে পৌঁছাইয়া দিয়াই পরের ট্রেণে ফিরিয়া গেলেন। তিনি এতক্ষণ ছিলেন এবং অমলার স্বামী প্রকাশও দু'টি ভাত মুখে দিয়া বড় বাবুর ছেলের জন্য ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, এই সব কারণে স্বামীর সহিত একান্তে মুখোমুখি হইবার অবকাশ এখনও তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। এই এক মাস সে ছিল না বলিয়া চাকর-বাকর পুরা মাত্রায় ফাঁকি দিয়াছে। চারিদিকে অগোছালো বিশৃঙ্খলতা। ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া ঘর-দ্বার পরিষ্কার করাইতে, এবং জিনিষ-পত্র বিন্যস্ত করিতে তাহার সারাদিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যা আসিল, তুলসীমঞ্চে দীপ দেখাইয়া প্রণাম করিয়া সে ঘরে গেল। সারা-দিনের ঘোরাঘুরি খাটুনির পর, প্রকাশও তখন শয়ন-কক্ষের একটা চেয়ারের উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল। দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিল। অমলা এই প্রথম দেখা হওয়ার ক্ষণটির কথা কত ভাবে কল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার কল্পনার সহিত আসলে কিছুই মিলিল না। সে নিজেই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আচ্ছা, তোমাকে কত বার বলেছি না যে, স্নানের ঘরে একটা দরজা বসিয়ে দিতে। শুধু অমনি একটু দেয়াল দিয়ে

ঘেরা। বড় লজ্জা পেতে হয়। বড়দা এসেছিলেন, বাড়ী ঘর দোরের শ্রী দেখে কি যে মনে ক'রে গেলেন।"

প্রকাশ জবাব দিল, "সারাদিন খেটে-খুটে এসেছি, এখন ও-সব ভালো লাগে না। বড়লোক বাপ তোমার, সে বাপের বাড়ী থেকে এসে প্রথম প্রথম দিনকতক এখন এখানকার সবই খারাপ লাগবে। তার আর কি করা যায়।"

প্রত্যুত্তরে অত্যন্ত উষ্ণ হইযা অমলা কি একটা জবাব দিতে গিযা সহসা থামিয়া গেল। তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া সেই ষ্টীমারে যাওয়া, সেই গঙ্গায় উভয়তীরের অনির্ব্বচনীয় প্রশান্ত-সৌন্দর্য্যের সহিত মিশাইয়া প্রবাসী হৃদয়ের ব্যাকুলতা, সেই পূর্ণিমা রাত্রির গানের সুরে বিদেশবাসী প্রিয়তমের সান্নিধ্য কামনা করিবার উচ্ছলতা, সে সমস্তই ছবির মত একের পর এক কবিয়া ভাসিযা যাইতে লাগিল। মনে হইল, বিরহে যাহা অত সুকোমল অত সুকুমার ছিল, মিলনে তাহাই কি এত রূঢ়, কর্কশরূপে দেখা দেয়? বিরহ এবং মিলনের রূপে কি এত তফাৎ! তাই বুঝি জগতের যত অমর কাব্যে বিরহেরই জয়গান! বিশেষ আব কিছু সে বলিতে পারিল না। শ্রান্তভাবে নিকটস্থ একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। মনটা একান্ত অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইচ্ছা করিলেই বাপের বাড়ীতে থাকিতে পারিত, তখন নিজে হইতে চিঠি লিখিয়া জিদ করিয়া তাড়াতাড়ি সে চলিযা আসিতে গেল কেন? কি আছে এখানে!

বুদ্‌বুদ

বাড়ির কর্ত্তা ভাত খাইতে বসিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, একি রান্না হয়েছে! ঝোলে নুন নেই, ডালটা পুড়ে গেছে। ভাতের ফেন ভাল ক'রে ঝরে নি। এই রকম অপূর্ব্ব সুখাদ্য যদি রোজ দুবেলা খেতে হয় তা হ'লেই দেখছি হয়েছে!

বাড়ির গৃহিণী সেই সবেমাত্র একটা নারীসমিতির জরুরি মীটিং হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বাড়িতে পা দিয়াছেন। তখনও কাপড় পর্য্যন্ত ছাড়া হয় নাই। অমনই স্বামীর খাওয়ার কাছে একটা চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি তীব্রস্বরে ডাকিলেন, কালীমোহন! কালীমোহন!

নবনিযুক্ত বামুনঠাকুর কালীমোহন ভীত সঙ্কুচিত পদক্ষেপে দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

গৃহিণী তীব্রতর কণ্ঠে হাঁকিলেন, কালী, আমি যে বাইরে যাবার সময় তোমাকে হুকুম ক'রে গেলুম, ভেটকি মাছের ফ্রাই হবে, চিংড়ি মাছের মালাইকারি আর পটলের দোল্‌মা হবে। যদি বড় মাছ পাওয়া যায় তবে বড় মাছের চপ হবে, সে সব কি এক কান দিয়ে শুনলে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে গেল? তোমার এমন বজ্জাতির মানেটা কি? এই যে সমস্তই তন্নতন্ন ক'রে ব'লে দিয়ে মীটিংএ গেলুম, তারপরে এই দু ঘণ্টা ব'সে তুমি কি করেছ?

কালীমোহন ভীতস্বরে কহিল, মা, সরকারমশায় এইমাত্র বাজার ক'রে আনলেন। তিনি জিনিসপত্তর নিয়ে এলে তবে ঐসব রান্না হবে। এদিকে বাবুর বেলা হয়ে যাচ্ছে, তাই আমি তাড়াতাড়ি ঝোল ভাত রান্না করেছি।

বাড়ীর কর্ত্তা ব্যারিস্টার প্রণব ব্যানার্জি শ্লেষহাস্যে কহিলেন, ঝোল ভাত করতে ব'সে এই কাণ্ড হয়েছে ; চপ, কাটলেট, ফ্রাই, কোর্মা রাঁধতে গেলে না জানি কি হ'ত ! তুমি ওকে মিথ্যেই বকছ মীরা, ওসব ও পারবে না। কিন্তু নতুন ঠাকুর যখন, তখন তোমার উচিত ছিল, বেড়াতে বার না হয়ে নিজে দেখিয়ে শুনিযে দেওয়া।

মীরা দেবী—বাড়ীর গৃহিণীর ইহাই নাম, বিধিমত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, কোথায় গেছি খবর না নিয়েই তোমার এক কথা বলা চাই। দয়া ক'রে যদি একটু খবর নিতে তা হ'লে জানতে পারতে, সখের বেড়াতে যাই নি। আজ আমাদের 'শ্রমিক উন্নয়ন' সম্বন্ধে বিশেষ এক অধিবেশন ছিল। বলি, দেশের খবর কিছু রাখ কি ? এই যে চাঁপদানির চটকলের অসহায় শ্রমিক সঙ্ঘের উপর কি নিদারুণ, কি লোমহর্ষণ অন্যায় হয়ে গেল তা জান কি ? ধনীর এই উৎপীড়ন,দরিদ্রের প্রতি এই পশুর মত ব্যবহার—এ আর আমরা কিছুতেই সইব না। এই মর্ম্মে আমাদের মীটিংএ আজ প্রস্তাব গৃহীত হ'ল।

প্রণব ব্যানার্জি মৃদুহাস্য সহকারে কহিলেন, তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু, তোমাদের উদ্যম প্রশংসনীয়। কিন্তু শ্রমিকের দুঃখে যতই প্রাণ কাঁদুক, স্বামী বেচারার দুঃখেও যেন সেটা এক আধবার কাঁদে। সে দিকে একেবারে উদাসীন হয়ো না। কিন্তু একি, বেলা এগারোটা যে প্রায বাজে ! আজ আমার একটা জরুরি মোকদ্দমার দিন, কথায় কথায খেয়াল নেই !

ব্যানার্জি ধড়া-চূড়া পরিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার মোটরের শব্দ মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই আর একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। মীরা দেবীর বাল্যবন্ধু সুহাসিনী, বাগবাজারে তাঁহার অতিশয় পর্দ্দানশীন শ্বশুরবাড়ি হইতে কি একটা ছুতায় বুঝি একটুখানি অবকাশ পাইয়া সখীর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

মীরা কিন্তু তখন কালীমোহনকে লইয়া পড়িয়াছে। লোকটা যে অত্যন্ত অভাবী তাহা তাহার দীন চাহনি, কুণ্ঠিত ধরণধারণ এবং জীর্ণ

বেশবাস হইতেই বুঝা যায়। তাহাকে সবেমাত্র পরশু হইতে এ বাড়ির কাজে বহাল করা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যে রাঁধুনী ছিল, মুখের উপর জবাব করিবার অপরাধে কর্ত্রীঠাকুরাণী তাহাকে জবাব দিয়াছেন।

মীরা কঠোরকণ্ঠে বলিতেছে, কালীমোহন, তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। যখন তোমাকে রাখি তখন স্বচ্ছন্দে বললে, তুমি চপ কাটলেট ফ্রাই এ সমস্তই রাঁধতে জান। সে শুধু চাকরির লোভে মিছে কথা বলেছিলে। তুমি এত নীচ! মানলুম, তোমার পক্ষে নীচ হওয়াই স্বাভাবিক, ইতর-শ্রেণীর লোক, লেখাপড়া জান না। কিন্তু এমনই অনায়াসে এত মিথ্যে কথা বানিয়ে বললে কেমন ক'রে? ছি ছি, নিজের ব্যবহারে তোমার দস্তুরমত লজ্জা পাওয়া দরকার, কালীমোহন!

কালী কিছুই বলিতে পারিল না। সেই প্রদীপ্ত মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভয়ে তাহার কণ্ঠতালু অবধি শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে, জবাব দিবে কি, কোনক্রমে আপনাকে খাড়া করিয়া ঘাড় গুঁজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এমন সময়ে রঙ্গস্থলে সুহাসিনী ঢুকিলেন। মোটাসোটা গোলগাল হাসিখুশি গড়ন। সর্ব্বদাই হাস্যচঞ্চল। একদণ্ডের জন্যও কাহারও মুখভার সহিতে পারেন না। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতেই বন্ধুর উচ্চ কণ্ঠস্বরের তর্জ্জন-গর্জ্জন কিছু কিছু কানে গিয়াছিল। ঢুকিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, মীরা, একে নিয়ে পড়েছিস কেন ভাই? কি হয়েছে?

মীরা নিতান্ত বিরক্তিভরে কহিল, হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! বাস্তবিক এই সব 'লো ক্লাস' ইতর লোকগুলোকে নিয়ে কারবার করা এত যন্ত্রণাদায়ক, সে আর তোকে কি বলব সুহাস! আজ আমাদের সমিতির একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল। দেশের শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর নানাভাবে যে অত্যাচার হচ্ছে, তা আর আমরা সহ্য ক'রে চলব না—এই মর্ম্মে আমরা আপত্তি জানিয়ে এক রেজল্যুশন পাস করেছি। তা সেই সব ব্যাপারে সকালে আমি বাড়ি ছিলুম না। যাবার পূর্ব্বে আমার এই

বাঁদর রাঁধুনীটিকে বার বার ক'রে সব ব'লে বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ইনি এমন কতকগুলি অখাদ্য রেঁধে ব'সে আছেন যে উনি একরকম না খেয়েই কোর্টে চ'লে গেলেন। নাঃ, সংসারের এই সব খিচিমিচি আর ভাল লাগে না ভাই। মনে-প্রাণে দু দণ্ড যে দেশের কাজ করব তারও কি ছাই জো আছে? যাও তুমি কালীমোহন, আর সঙের মত অমন ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু এই তোমাকে জানিয়ে দিলুম, মিছে কথা ব'লে ধাপ্পাবাজি ক'রে আর আমাকে ভোলাতে পারবে না। দিন দুই সময় তোমাকে দোব; ইতিমধ্যে ভাল রান্না দেখাতে না পারলে জবাব দিয়ে দোব। যাও, এই কথাটি শুধু মনে রেখ।

কালী চোরের মত আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

মীরা সুহাসিনীর দিকে এইবার ফিরিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, ব'স, দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আজ যে বড় বেড়াতে যাবার ছুটি মিলল?

সুহাসিনী বলিল, হ্যাঁ, আজ ছুটি পেলুম। আমার শ্বশুর শাশুড়ি সব কালীঘাটে মানতের পূজো দিতে গেছেন। বাড়িতে কেউ নেই। উনি তাই আপিস যাবার পথে আমাকে এইখানে নামিয়ে দিয়ে গেলেন।

মীরা কহিল, নইলে তো আসতে পারতিস নি, নয়?

সুহাসিনী কহিল, তা বইকি! আজ কেউ নেই তাই এসেছি। নইলে ঠিক এই কাজকর্ম্মের সময়ে কি আসতে পারতুম!

মীরা কহিল, বললে অবশ্য তোর মনে কষ্ট হতে পারে, কিন্তু তা হ'লেই দেখ—তোর পরাধীনতার বহরটা। সকল সময়েই পরের দাসত্বে বাঁধা। কিন্তু যাই হোক বাপু, তুই ধন্যি বাহাদুর! আমি হ'লে তো ঐ রকম বাঁধাবাঁধির মধ্যে একদণ্ডও থাকতে পারতুম না, বিদ্রোহ ক'রে বেরিয়ে আসতুম। কেন, মেয়েমানুষের কি একটা স্বাধীন আত্মা নেই নাকি? এই দেখ না কেন, আমি দেশের কাজে যোগ দিয়েছি। আমাদের নারী-সভায় আজ 'শ্রমিক উন্নয়ন', কাল 'বাধ্যতামূলক স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন'

এমনই একটা না একটা প্রস্তাব লেগেই রয়েছে; অথচ তুই হয়তো এ সবের খবরটা রাখবারও হুকুম পাস নি!

সুহাসিনী হাস্যোজ্জ্বল মুখে শুনিতেছিল। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তাহার মানবাত্মা নিপীড়ন সম্বন্ধে এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়াও সে হাসিমুখখানি একটু ম্লান হয় নাই। মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কি আর করব বল? এ জন্মটা এমন ভাবেই গেল। তোবা ভাগ্যবতী সে কথা স্বীকার করতেই হবে।

এই কৈতববাদে মীরা যারপরনাই হৃষ্ট হইয়া আত্মীয়তার সুরে কহিল, তোকে কিন্তু আজ এখানে খেয়ে যেতে হবে ভাই। যখনই তোদের বাড়ি গেছি এত অপর্য্যাপ্ত খেয়ে এসেছি, অথচ তোকে একদিনও আমার বাড়িতে খাওয়াতে পারি নি।

সুহাসিনী পরিহাস করিয়া কহিল, নিমন্ত্রণ তো ক'রে বসলি, কিন্তু খেতে কি দিবি বল? ঐ কালীমোহনের রান্না তো? কিন্তু ভাই, যতই বকিস তাকে, বেটাছেলে রান্নাব কি জানবে বল, সঙ্গে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে না নিলে?

মীরা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কহিল, উনিও ঠিক তাই বলেন। কিন্তু সমানে সেই আগুন-তাতে থেকে যদি আমার মূল্যবান সময় নষ্টই করব, তবে খরচপত্র ক'রে এত লোকজন রাখবার মানেটা কি? আমার চাই অবসর—যে অবসর রান্নাঘরের তদ্বিরের চেয়ে আরও ঢের ঢের জরুরি কাজে ব্যয়িত হবার তাগিদ রয়েছে।

সুহাসিনীর হাসিমুখখানি ক্ষণকালের জন্য ম্লান হইল। সে হঠাৎ যেন গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বলিল, কি জানি, আমি এমন ক'রে কিছুতেই যেন ভাবতে পারি না। হয়তো সেটা আমাব অক্ষমতা। কিন্তু থাক, এ নিয়ে আর তর্ক করব না। সংসারে মতভেদ যখন আছে এবং চিরকাল থাকবে তখন তা স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভাল।

মীরার পক্ষেও এ রান্নাঘরের প্রসঙ্গ আর অধিকক্ষণ সহ্য করা ক্রমশই অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। সে দাসীকে ডাকিয়া দুই গ্লাস বরফ-দেওয়া সরবৎ আনিতে আদেশ করিয়া অন্য গল্প পাড়িল। তাহাদের আজিকার মীটিংএর অদ্ভুত সাফল্য এবং উদ্দীপনার কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিল।

সুহাসিনী শুনিয়া বলিল, মজুরদের দুঃখের কথা তো ভাই অনেক শুনলুম; কিন্তু কেবল মীটিং ক'রে আর রেজল্যুশন পাস ক'রে তাদের ক্লেশ সত্য সত্যই কি কমানো যাবে? এসব বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা অল্প, আমার কেবল মনে হয় এসব দুঃখে আমাদের প্রত্যক্ষ হাত খুব কম। অথচ আমাদের একেবারে অতি নিকটে, চারিপাশে অহরহ এমন সব দুঃখ সঞ্চিত হয়ে রয়েছে যা হয়তো একটুখানি সহানুভূতি নিয়ে দেখতে ইচ্ছা করলেই আমরা দেখতে পাই, এবং একটুখানি সহৃদয়তার সঙ্গে চেষ্টা করলেই দূর করতে পারি। কিন্তু থাক এ সব কথা, চল না একবার দেখে আসি, তোর ইডিয়ট কালীমোহন কি করছে।

মীরার তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও অনুরোধের খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রান্নাঘরের রোয়াকে তখন গামছাটা কোমরে জড়াইয়া কালীমোহন উবু হইয়া বসিয়া মশলা পিষিতেছিল। দুই সখীর একত্র আবির্ভাবে আতঙ্কে, অপ্রতিভতায়, হতবুদ্ধিতায় মিলিয়া মিশিয়া তাহার ভঙ্গিকে এমন দীন করিয়া তুলিল যে সুহাসিনীর সমস্ত মনটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। জীবনের এমনই এক একটা তুচ্ছ ঘটনায় অকিঞ্চিৎকর মুহূর্ত্তে চোখের উপর হইতে কতদিনকার ঘনান্ধকার যবনিকা যে সরিয়া যায়, ভাবিয়া দেখিতে গেলে অবাক হইতে হয়।

সুহাসিনীরও তাহাই হইল। তাহার কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় মনে হইতে লাগিল, ড্রইংরুমে পাখার তলায় বসিয়া বরফ-দেওয়া সরবতে চুমুক দিতে দিতে শ্রমিকদের দুঃখে বুক ফাটিয়া যাওয়া খুব সোজা, কিন্তু সে কেবল ছেলেখেলা। অবশেষে দেখা যায়, বুক ঠিকই

আছে, তাহার লেশমাত্র খোয়া যায় নাই। কিছুদিন আগে বঙ্কিম-বাবুর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসখানি যখন সে বড় যত্ন করিয়া পাঠ করিয়াছিল তখন মনে হইয়াছিল, প্রফুল্লর মত অমন প্রতিভাময়ী রমণীকেও যে তিনি তাহার বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র হইতে টানিয়া আনিয়া সজোরে নিয়োজিত করিয়াছেন ওটা বঙ্কিমবাবুর শিল্পীর খেয়াল নয়, সমাজসংস্কারকের প্রয়োজন। কিন্তু সে মনে হওয়া যে কত বড় ভুল মনে হওয়া, আজ সুহাসিনী তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিল। অদূরে উপবিষ্ট ঐ যে লোকটা ঘাড় গুঁজিয়া মশলা পিষিতেছে, তাহার বসিবার ভঙ্গি হইতে গামছা জড়াইবার ধরণ অবধি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যে কথাটা প্রকাশ পাইতেছিল তাহাতে সুহাসের চোখের সম্মুখে এক নিমেষে যেন অনেক মিথ্যার বুদ্‌বুদ ফাটিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, ঘরের বাহিরে মীটিং করিয়া, মন্ত্রিত্ব করিয়া, এমন কি রাণীগিরি অবধি করিয়া মেয়েমানুষে দুঃখীর দুঃখের বোঝা যতটা না লাঘব করিতে পারিবে, সংসারের বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রে আশেপাশে প্রতিনিয়ত যাহাদের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাদের সহিত মানুষের মত ব্যবহার করিয়া যদি তাহাদের মানুষ হইয়া উঠিবার সুযোগ করিয়া দেয়, তবে হয়তো তাহার চেয়ে অনেক বেশি করিয়াই এ বস্তুটা পারিবে। সংসারের গণ্ডির ভিতর যে প্রফুল্লর সংস্পর্শে আসিয়া নয়ানবউ মানুষ হইয়া গিয়াছিল, দেবীরাণীর আমলে তাঁহার সমগ্র রাজত্বে অতখানি গুরুত্বপূর্ণ কাজ বোধ করি আর একটিও হয় নাই। কিন্তু সুহাসের চিন্তার স্রোত অকস্মাৎ ছিন্ন হইয়া গেল। মীরা তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল, চল চল, এই ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে তোকে আর কষ্ট করতে হবে না। কালী যা পারবে তাই রেঁধে নেবে। এই মাসের .গোটাকতক ভাল রেকর্ড পছন্দ করতে আনিয়েছি, ওপরে ব'সে শুনবি চল।

সুহাসিনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, চল।

চিরন্তন ভ্রান্তি

১

চপলার আজ পাঁচ বৎসর বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু ছেলে হয় নাই। বাঙালী মেয়েরা সাধারণত যে বয়সে মা হয়, সে বয়স তাহার যায় যায়। যদি শ্বশুরবাড়িতে শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি পাঁচটা আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে থাকিত, তাহা হইলে এতদিন তাঁহারা নিশ্চয়ই তাহাকে মাদুলী, তাবিজ, তাগা পরাইয়া এবং মন্ত্রসিদ্ধ ঔষধ ও গাছগাছড়ার দৈবশক্তি-সম্পন্ন শিকড় গলাধঃকরণ করাইয়া ছাড়িতেন। কিন্তু চপলা থাকে সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট শহরে। সেখানে সে একেবারে একা। স্বামী সরকারী বড় চাকরি করেন। গভর্মেণ্ট কোয়াটার্স পাইয়াছেন থাকিবার জন্য—একেবারে ফাঁকা জায়গায়, পাহাড়ে ঘেরা নির্জ্জন বনময় আবেষ্টনের মাঝে। চারিদিকে ফুলের বাগান, বাগানের মাঝখান দিয়া লাল কাঁকরের রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় বনরাজিনীলা উন্মুক্ত প্রান্তর। তাহার পরে বন্ধুর রুক্ষ পাহাড়ের শ্রেণী। চপলার স্বামী হরকুমারকে প্রায়ই টুরে যাইতে হয়। দৈবাৎ যে দু'এক দিন টুর না থাকে, সে দিনেও আপিসের কাজ থাকে বিস্তর। স্বামী বাহির হইয়া গেলে চপলার অসীম অবসর, অপার নির্জ্জনতা। বাড়িতে কোন শিশুর কলঝঙ্কার নাই, শত-উপদ্রব নাই। যেখানে যে জিনিস সাজানো আছে, সেখানে তাহা চিরকাল তেমনই নিখুঁতভাবেই সাজানো থাকে। কেহ দৌরাত্ম্য করিয়া একটি জিনিসও স্থানচ্যুত করে না। কিন্তু চপলা কল্পনা করে। কল্পনায় সে অদূর ভবিষ্যতে একটি তরুণ মানবশিশুর আবির্ভাব যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়। বিশ্বাস তাহার অটল, একদিন

সে আসিবেই। কিন্তু নিজেকে সেই আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই। চপলা মন্তেসরির শিক্ষাপ্রণালী, বার্টরাণ্ড রাসেলের আধুনিক শিশুশিক্ষাপদ্ধতি এবং যেখানে যাহা কিছু শিশুবিষয়ক বই আছে, সমস্ত কিনিয়াছে এবং সযত্নে পড়িয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শিশু ভোলানাথ, ক্রিসেণ্ট মুন এবং আরও অনেক কবিতার বইয়েব প্রত্যেকটি কবিতা তাহার মুখস্থ। শুধু তাই নয়, শিশুর শরীর-বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধেও যত কিছু জানিবার আছে, সমস্তই বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে আয়ত্ত করিয়াছে। এমনই করিয়া একটা দৃঢ় বিশ্বাসকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে জ্ঞানে নিষ্ঠায় সাধনায় আপনাকে সব দিক দিয়া তাহার ভাবী সন্তানের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। যদি আরও অনেক দিন তাহার ছেলে না হইত, তবে হয়তো একদিন তাহার আশা ম্লান এবং সাধনার জ্যোতি নিস্তেজ হইয়া আসিত। কিন্তু বিধাতা দয়া করিলেন, সেই বছরই চপলার একটি মেয়ে হইল। এতদিন চপলা বইয়ের পাতায় যাহা কিছু পড়িয়াছে, সে সমস্তই তাহার মাথায় একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষুদ্র শিশু যদি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আপন মনে হাসে, অমনই তাহাব মা তাড়াতাড়ি আলমারি হইতে মনস্তত্ত্বেব একটা মোটা বই টানিয়া আনিয়া শিশুব স্বপ্ন দেখা অধ্যায় খুলিয়া পড়িতে বসে। যদি কিছুক্ষণ না কাঁদে, তখনই আবার বইযের পাতা উল্টাইয়া দেখে, শিশুর গলাব পেশীসঞ্চালনেব জন্য দৈনন্দিন ঠিক কতখানি কাঁদা তাহার প্রয়োজন। সকল সময় আবাব নিজেব উপবেও ভরসা হয় না। একদিন বাদলা কবায় খুকী নরম লেপের তলায় সারাদিন ঘুমাইয়াছিল, কেবল দুধ খাওয়াব সময় ছাড়া তাহার সুখনিদ্রাব ব্যাঘাত হয় নাই। চপলা নিতান্ত ভীত হইয়া খুকীর নাকের কাছে তুলা লইয়া গিয়া দেখিল, নিশ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমত বহিতেছে কি না। তাহা যদি ঠিকই বহিতেছে, তবে এত ঘুম কেন? তখনই ডাক্তারের কাছে 'কল' গেল। ডাক্তার

যখন তাঁহার ঠাণ্ডা স্টেথোস্কোপ খুকীর বুকে বসাইলেন, তখন খুকী কাঁদিতে লাগিল, তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চপলার মন আশ্বস্ত হইল। এমনই করিয়াই দিন কাটিতেছিল। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া খুকী পাঁচ বছরে পড়িল। এখন আর শুধু তাহার শরীরের প্রতি নয়, শরীর এবং মন দুইয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিবার সময় আসিল। চপলাও আপনার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। খুকী যদি জিজ্ঞাসা করে, মা, দেখ দেখ, পাখীগুলো কি রকম ডাকছে। কাকগুলো ভারী দুষ্টু মা, আমার খাবার খেয়ে নেয় কেন ?

চপলা তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে পক্ষীবংশের ইতিবৃত্তের কাহিনী সুরু করে। কাক এবং চড়ুই পাখীর মধ্যে তফাৎ কোথায় ও কতটুকু— প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেয়! কোন একটা প্রশ্ন করিলেই চপলা সাধ্যমত গোড়া হইতে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে, কিছু বাদ দেয় না। ফলে খুকী তাহার মাকে দেখিলেই ভয় পায়, তাহাব বাবার কাছে আশ্রয় লয়। কাজকর্ম্মেব ফাঁকে বাবাকে যখনই কাছে পায, মহা উৎসাহে তাঁহার সহিত আগড়ম-বাগডম বকে। কারণ শ্রোতা হিসাবে মায়েব চেয়ে সে বাবাকে ঢের বেশি পছন্দ কবে। মা যে সকল বক্তৃতা দেন, সে সব শুনিলে হয় খুকীর ঘুম পায়, নয় তো পলাইযা যাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু বাবা খুকুব কথা ঠিক বুঝিতে পাবেন। তাই তো তাঁহাকে এত ভাল লাগে। খুকী যদি বলে, বাবা, ঐ মস্ত বড় তালগাছটায় কি থাকে ?

বাবা বলেন, ও খুকু, ও গাছটাব তলা দিয়ে যেন যেও না। ওতে মস্ত বড এক একানড়ে রয়েছে। তার কুলোর মত কান, মূলোব মত দাঁত, আর—। খুকু তখন তাহাব বাবাব লেপের তলায় আরও সরিয়া আসিয়া রহস্যে শঙ্কায় দুরু দুরু হৃৎস্পন্দনে অধীর প্রতীক্ষায বাকিটা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইযা থাকে, কিন্তু চপলা তখনই কাছে আসিয়া ভর্ৎসনার সুরে স্বামীকে বলে, ও কি গো, মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?

তুমি জান, বাসেল কি বলেছেন ? ছেলেদের কচি মনে এই সব কুসংস্কার ঢুকিযে দেওযা কত অন্যায ? রাসেলেব নাম শুনিযাই আপিস-ফেবত ক্লান্ত স্বামী বেচারা নিঃশব্দে লেপটা মুখেব উপব আবও টানিযা দেন।

খুকীব যদি আবও দুই একটা ভাই বোন থাকিত, তাহা হইলে হযতো তাহাব জীবনটা এমন দুর্ব্বহ হইযা উঠিত না। কিন্তু সে ছাডা তাহার মাযেব ভাবনা সাধনা বেদনাব আব কোন অবলম্বন ছিল না।

২

এতদিন বেশ ছিল নির্জ্জনতাব মাঝে। চপলা সেই নির্জ্জনে বসিযা নিজেব জীবনেব গভীব দাযিত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যেব দুরূহ সাধনায আপনাকে ডুবাইযা রাখিযাছিল। কিন্তু এবাব যেখানে তাহাব স্বামী বদলি হইলেন, সেটা বড শহব, সাঁওতাল পবগণাব নিভৃত পার্ব্বত্য উপত্যকাব প্রশান্তি তথায নাই, এবং যে পাডায কোযাটার্স পাইলেন, সেখানে চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের বাডি। চাহিলেহ সম্মুখে আব নীল বনানী চোখে পডে না। তাহাব বদলে দেখা যায, ছাদে প্রতিবেশিনীদেব কাপড শুকাইতেছে কিংবা বডিব টিন বৌদ্রে দেওযা আছে।

সে দিনটা ছিল ববিবাব। সাবা সপ্তাহেব হাডভাঙা খাটুনির পবে চপলাব স্বামী হবকুমাব বৌদ্রে পিঠ দিযা আলস্যভবে খববের কাগজ পডিতেছিলেন। নিকটে চপলা বসিযা সেলাইযেব কলে খুকীব জন্য জামা সেলাই কবিতেছিল ঠিক পাশেব বাডিতেই উচ্চকণ্ঠেব কলবব শোনা যাইতেছিল। একটা বলহ উদ্দাম হইযা উঠিযাছে, এবং যাহাবা ঝগডা কবিতেছে, তাহাবা আত্মবিস্মৃত হইযা এত চীৎকাব কবিতেছে যে, প্রতিবেশীদেব বাডি হহতেও ব্যাপাবটাব আভাস পাওযা যাইতেছিল। হবকুমাব বিবক্ত হইযা বলিলেন, সকালবেলাতেই এবা এত চেঁচায কেন ? ব্যাপাব কি ?

চপলা ঘৃণার সহিত কহিল, ছি ছি, ভদ্রলোকের বাড়ির মেয়ে হয়ে অত চেঁচাতে ওঁদের লজ্জাও করে না। ঐ যে, তারাপদবাবু সাব-রেজিস্টারের মা গো, তিনি প্রতিদিন ঐ একই বিষয় নিয়ে ঝগড়া করেন। রোজ শুনে শুনে আজ তাঁর ছেলেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে, তাই তিনিও সমানে চীৎকার করছেন।

হরকুমার উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষয়টা কি ?

স্থচে স্থতা পরাইতে পরাইতে চপলা কহিল, বিষয়টা হচ্ছে চিরন্তন ঈর্ষা। তারাপদবাবুর স্ত্রীর প্রথম ছেলেটি মারা যাওয়ার পর থেকেই সে বেচারার শরীর ভেঙে গেছে। অসুখের জন্যেও খানিকটা, শোকের জন্যেও খানিকটা। কিন্তু তারাপদবাবু স্ত্রীর চিকিৎসার কোন চেষ্টা করলে বা তাঁর প্রতি একটু মনোযোগ দেখালেই মা হয়ে ওঠেন খাপ্পা। এত কেন ? একটা মেয়েমানুষ, তায় আবার বউমানুষ, তার জন্যে এত কেন ? আজ রবিবার, আপিসের তাড়া নেই, তাই বুঝি তারাপদবাবু একজন ভাল ডাক্তার আর একজন লেডি ডাক্তার আনিয়েছিলেন স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে। ডাক্তারদের গাড়ি বিদায় হয়ে দরজা পার হতে না হতেই মায়ের মুখ ছুটেছে।

হরকুমার মৃদু হাস্য সহকারে প্রশ্ন করিলেন, তারাপদবাবু তাঁর মায়ের এক ছেলে নাকি ? আর ওঁর মা বুঝি বিধবা ?

চপলা বলিল, তোমার দুটো অনুমানই ঠিক। তারাপদবাবু এক ছেলেও বটে, আর তাঁর মা বিধবা, সেও ঠিক। কিন্তু এ দুটো কি তাঁর অসংযত এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারের স্বপক্ষে যুক্তি হ'ল ? যাই বল, আমার ভারী রাগ হয় ওঁর মায়ের ওপর। ঐ একটি ছেলে, তারই জীবন যদি অশান্তিময় করে তুললেন, তা হ'লে তো খুব মায়ের কর্ত্তব্য করা হ'ল।

হরকুমার কহিলেন, ওঁর মা, ঠিক কষ্ট দোব বা ছেলের জীবন অশান্তিময় ক'রে তুলব, সে ধারণায় কিছু করেন না। কিন্তু একটা চিরন্তন ভুল

তাঁর হয়েছে, সে ভুল আর তিনি এ জীবনে সংশোধন ক'রে উঠতে পারবেন না। আমার মনে হয়—। এই পর্য্যন্ত বলিয়া হরকুমার স্ত্রীর মুখের দিকে একবার চাহিয়া আবেগভরে আবার বলিলেন, আমার মনে হয়, কোন না কোন প্রকারে অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই এই ভুল করে। তাতে তারা নিজেরাও যথেষ্ট ক্ষতবিক্ষত হয় এবং তাদের প্রিয়জনদেরও বড় কষ্ট দেয়।

চপলা সেলাইয়ের কল চালাইতে চালাইতে বলিল, কি ভুল ?

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া হরকুমার বলিলেন, জায়গা চিরকাল জুড়ে থাকা যায় না—এই ভুল। যখন যার অধিকার, তখন তাকে স্থান ছেড়ে দিতেই হয়—ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক। বিশ্ববিধানের এই নিয়ম। তারাপদবাবুর বাল্যে তাঁর মা তাঁর জীবনের যতখানি জুড়ে ছিলেন, সে জায়গা এখন তাঁকে ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু এই অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

চপলা সংক্ষেপে কহিল, তুমি যতই দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা কর আমি জোর গলায় বলব, তারাপদবাবুর মায়ের দোষই বেশি।

হরকুমার স্ত্রীর সহিত তর্কালাপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ জানিয়া নিঃশব্দে খবরের কাগজে মন দিলেন, আর কিছু বলিলেন না।

হঠাৎ চপলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, ওমা, কথায় কথায় খেয়াল নেই, নটা যে বাজে। মেয়েটার দুধ খাবার সময় হয়েছে, কিন্তু সে কোথা ?

বিশুয়া চাকরকে খুকীকে ডাকিয়া আনিবার আদেশ দিয়া সে পুনরায় অনুযোগের সুরে কহিল, এখানে এসে অবধি খুকী যেন কি রকম হয়ে গেছে। এক দণ্ড ওর বাড়িতে মন বসে না। কোথা থেকে কতকগুলো সঙ্গী জুটিয়েছে। ঐ তারাপদবাবুর ভাগনী চাপা, তার সঙ্গে তো চব্বিশ ঘণ্টাই খেলছে। আমার এক এক সময় এত ভাবনা হয়। নাঃ, এ বাড়িটা আমাকে বদলাতেই হবে। আমি আজই রমেনকে ডাকিয়ে

বলছি, শহরের বাইরে বেশ খোলা জায়গায় একটা ছোটখাট বাড়ি দেখতে। তোমার কাছারি একটু দূর পড়বে বটে, কিন্তু মোটর আছে, বিশেষ অসুবিধে হবে না। ও বিশুয়া, খুকীকে ডাকলি ?

বিশুয়া আসিয়া নিবেদন করিল, খুকীর খেলিবার ঘরে, খুকীর পড়িবার ঘরে, তেতলার ছাদে, রান্নাঘরে, স্নানের টবে—সমস্ত সম্ভব এবং অসম্ভব স্থানে সে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহাকে পায় নাই।

চপলা উত্তেজিত হইয়া বলিল, বাড়িতে কি সে আছে যে পাওয়া যাবে! যা, ঐ তারাপদবাবুদের বাড়িতে দেখে আয়, সে আছে নিশ্চয়। আমার নাম ক'রে এখনই তাকে ডেকে নিয়ে আয়। নাঃ, কালই আমি এ বাড়ি ছেড়ে দোব। আর নয়।

হরকুমাব প্রশান্ত স্বরে বলিলেন, পাগলামি করছ কেন চপল ? ছেলেমানুষ, সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে একটু খেলবে না ? নইলে যে তার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চপলা আরও উত্তেজিত হইযা বলিল, তাই ব'লে ঐ রকম সঙ্গী-সাথী ? জান, ঐ চাঁপা মেয়েটা কি রকম পাকা মেয়ে ? এই তো বযেস, এরই মধ্যে বুড়ীব মত কথা শিখেছে ! না না, ওসব সঙ্গে মিশলে মেয়ে আমাব চোখেব সামনে উচ্ছন্ন যাবে। সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না। কি বলছ তুমি ?

এমন সময় বিশুযাব সঙ্গে খুকী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাব চোখে মুখে ব্যগ্রতাব ভাব। দুয়ারেব বাহিরে একটু আড়ালে তাহাব বন্ধু চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। সেহ দিকে চাহিয়া খুকী মিনতির স্বরে বলিল, দাঁড়া ভাই চাঁপা, চ'লে যাস নি। আমি এই দুধ খেয়ে নিয়েই আবাব তোর সঙ্গে খেলতে যাব। কিচ্ছু দেরি হবে না—পাঁচ মিনিট।

বিশুয়াকে দুধ আনিতে বলিয়া চপলা সস্নেহ স্বরে বলিল, ছি, খুকুরাণী,

রাতদিন কি খেলা করে? জান, কখন তোমার দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে? মনে থাকে না কিছু?

খুকী বলিল, দুধ খেতে যে আমার বিচ্ছিরি লাগে মা। আর খেলতে এত ভাল লাগে। আমি আবার যাব। বিশুয়া জোর ক'রে আমাকে ধ'রে আনলে তাই। চপলা সুরু করিল, জান খুকী, দুধে কি থাকে? এ বি সি যত রকম ভাইটামিন আছে, সমস্তই দুধে আছে। তাইতো পণ্ডিতরা বলেন—। ভীত হইয়া খুকী তখন তাড়াতাড়ি পলাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটা হাত তাহার চাপিয়া ধরিয়া চপলা বলিতে লাগিল, গত যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডের ছেলেরা ভাল ক'রে দুধ খেতে পায় নি, জান, তার ফল কি হযেছিল? কত ছেলে যে রিকেটি হয়েছিল, আর কত ছেলের যে চোখ—। খুকী দুয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল, মা, বিশুয়া এখনও দুধ আনছে না কেন? চাঁপা ভাই, যাস নি। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। আর দু মিনিট। চপলা বলিল, না খুকু, এখন আর তোমার যাওয়া হবে না। এতক্ষণ কি খেলছিলে শুনি যে, বাড়িতে পা দিতে না দিতেই যাই যাই?

আমরা পুতুল খেলছিলাম মা জান, আমার মেযে আর চাঁপার ছেলে। আমি যেন পূজোর তত্ত্ব পাঠিয়েছি মেয়ে-জামাইকে। বেয়ান কিন্তু নাক তুলে বললে, ওরকম জিনিসপত্র ছোটলোকের ঘর থেকে আসে। ভদ্দরলোকে অমন জিনিস দেয় না। মেয়ের শাড়িটা অন্তত বেনারসী হওয়া উচিত ছিল। আমার মেযেকে তাই আটকেছে। মা, মা, তোমার সেই সিল্কের কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে, আমাকে একটু পুতুলের কাপড় করতে দেবে? তাই নিয়ে আমি আবার ভাল ক'রে তত্ত্ব পাঠাব। নইলে যা শাশুড়ী, মেযেকে কি আর পাঠাবে?

হরকুমার কাগজ ফেলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চপলার স্তম্ভিত চোখের সামনে ঘরবাড়ি দুলিতে লাগিল! নিজেকে কোনক্রমে

সংবরণ করিয়া মেয়ের দিকে চাহিয়া সে বলিল, খুকী, তুমি কি তোমার মাকে ভালবাস না? তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, তোমার জন্যে তোমার মা দিনরাত্রি ভাবে? কি ক'রে তোমাকে ভাল ক'রে মানুষ ক'রে তুলবে, এই ভেবে রাতদিন কত বই পড়ে? কত জিনিস তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে? তুমি—

খুকী মায়ের হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, ভালবাসি, কিন্তু খেলতে আমার আরও ভাল লাগে মা। চাঁপাকে আমি আরও ভালবাসি। ও ভাই চাঁপা, চ'লে যাস নি। চল, আমরা যাই, আমি একটু পরে এসে দুধ খাব মা।

অভিভূত আহত মাতার হাত ছাড়াইয়া এঞ্জিনের বেগে ছুটিয়া খুকী তাহার প্রিয়তমা বন্ধু চাঁপার সহিত চলিয়া গেল।

সেই দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া চপলার একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এত বই পড়িয়া, এত কিছু জানিয়া শুনিয়া, এত তপস্যা করিয়া, এত ভালবাসিয়া, সে তাহার মেয়ের কোমল হৃদয়টুকুতে যতখানি স্থান করিয়া লইয়াছিল, কোথা হইতে অজ্ঞাতকুলশীলা এক ক্ষুদ্র সঙ্গিনী আসিয়া বিনা চেষ্টায় বিনা যুদ্ধে তাহার চেয়ে অনেক বেশি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে! হায় অকৃতজ্ঞ সংসার, এবং তাহার চেয়েও অকৃতজ্ঞ মানুষের বিচিত্র মন!

হরকুমার এতক্ষণ নিঃশব্দে সস্নেহ কৌতুকে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বলিলেন, চপলা, তুমি যে কি ভাবছ, বুঝ্‌তে পেরেছি। কিন্তু তারাপদবাবুর মায়ের মত একজন সাধারণ স্ত্রীলোক যে ভুল করেছেন, তুমি শিক্ষিতা এবং অসাধারণ হয়েও ঠিক সেই একই ভুল করছ। মেয়েমানুষের কি এ চিরন্তন ভুল? কেন তোমরা আর কাউকে সূচ্যগ্র স্থান ছেড়ে দিতে চাও না? তোমার সমস্ত শুভকামনা, তোমার সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার এবং তোমার সমস্ত স্নেহ দিয়েও তুমি মেয়ের যে অভাবটুকু

মেটাতে পার নি, ওদের বাড়ির সাত বছরের মেয়ে চাঁপা এক নিমেষে তা মিটিয়েছে। এতে তুমি ব্যথাই পাও, বা এ বাড়ি ছেড়ে চ'লেই যাও, কিংবা তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে আকুলই হও, সে আসন আর চাঁপার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। কিন্তু কাড়াকাড়ি করবার দরকারই বা কি? শুধু বার্টরাণ্ড রাসেল প'ড়ে ছেলেমেয়ে মানুষ করা যায় না চপল, আরও কিছু দরকার হয়। এবার সেইদিকে চোখ মেলে দেখ।

চপলা দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তোমার ওসব দার্শনিক ব্যাখ্যা রেখে দাও। আপিসের কাগজ দেখে দেখে বুদ্ধি তোমার দিন দিন বাড়ছে! আমি রমেনকে ফোন ক'রে দিই। কালই আমি এ বাড়ি বদলাব।

কনে-দেখা

১

লীলার স্বামী অ্যাসিসট্যাণ্ট-সার্জ্জেন, বড় বড় শহরে বদলি হন। পাড়াগাঁয়ে পৈত্রিক বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ প্রায় নাই বলিলেও চলে। স্ত্রীও থাকেন স্বামীর চাকবির জায়গায়। অনেক দিন পরে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন, বড়দার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। লীলার এখানে চমৎকার লাগিতেছে। তাহাব গভীর ভাবুক প্রকৃতি পল্লীব স্নিগ্ধ শান্ত আবহাওয়ার সহিত ভারি চমৎকাব খাপ খাইয়াছে। এখানে পবনিন্দা আছে, কোন্দল আছে, অযথা লোকের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া আছে, কিন্তু লীলার বিশ্লেষণশীল মন এ সকলেব মাঝেই নিজেকে জড়াইয়া না ফেলিয়া বিচার কবিয়া দেখিতে পাবে। দর্শকের মত জীবনপ্রবাহেব অভিনয়ে লিপ্ত না হইযাও তাহার স্রোতের গতিবিধি বিচ্ছিন্ন হইয়া উপভোগ কবিবাব দুর্লভ ক্ষমতা তাহার ছিল।

সকালবেলায় চায়ের বাসন সুমুখে লইয়া বড়বৌ চা তৈযাবী কবিতেছেন, আশে-পাশে অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। লীলা এ-বাড়ীব মেজবৌ। চায়েব পেয়ালাগুলি সে জল দিয়া ধুইয়া পবিষ্কাব কবিয়া সামনে আগাইয়া দিতেছিল।

বড়বৌ কহিলেন, "আহা থাক না মেজবৌ। তুমি দু-দিনের জন্য এসেছ, তোমার দিবাবাত্র এত পরিশ্রম করবাব কি দরকার? ঐ ত এত লোক বয়েছে। দে না নীলু চায়ের বাসনগুলো সব ঠিকঠাক ক'বে।"

নীলু ওরফে নীলিমা এ-বাড়ীর একটি বিধবা অল্পবয়সী আত্মীয়া। সে তটস্থ হইয়া লীলার হাতের কাজ কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেই লীলা

মৃদুমধুর হাসিয়া কহিল, “দু-দিনের জন্যে আসি নি ভাই বড়দি, আমি যে মনে ক’রেছি গরম কালটা এখানেই কাটিয়ে বর্ষার গোড়ার দিকে ফিরে যাব। যান উনি একাই ফিরে। পশ্চিমের সেই গরমের কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না বড়দি।”

লীলা একে বড় চাকুরে কৃতী স্বামীর স্ত্রী, তদুপরি বহুদূর পশ্চিম প্রবাসে থাকে। তাই তাহার সম্বন্ধে সম্ভ্রম এবং নানাপ্রকার অলৌকিক গুজব সত্যকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অসীমা বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, “আচ্ছা মেজকাকীমা, তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?”

“কেন পারব না রে?”

কেন যে পারিবে না সে বিষয়ে অসীমা কোনই সদুত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু লীলার চূর্ণকুন্তল স্বেদসিক্ত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়া আছে, তাহার গলার সরু এক টুকরা চেনহার এবং হাস্য-বিভাসিত মুখখানি—এ সমস্ত লইয়া তাহাকে যেন আশেপাশে সকলের হইতে বড় সুদূর বলিয়া মনে হয়। এই গাঁয়ে এই পচা শ্যাওলাধরা পুকুর এই দলাদলির হিংস্র আবহাওয়ায় তাহাকে মানায় না।

অসীমার মা অবাক স্বরে কহিলেন, “শোন, মেযের কথা শোন একবাব। নিজের শ্বশুরেব ভিটে, এখানে থাকতে পারবে না কেন শুনি? হ’লই বা চাক্‌রে-বাক্‌রে বড়লোক, নিজেব ঘর বলতে তো এই।”

ক্রমে চাযেব পর্ব্ব চুকিযা আসিল, কেবল ছেলেব দল তখনও এক-একটা গেলাস বা বাটি হাতে লইয়া করুণস্বরে আবেদন জানাইতেছিল, “আমি আর একটু চা নেব বড়মা, আমাকে আর অল্প দাও কাকীমা।...”

অতি অল্প বয়স হইতে চা খাইলে লিভার খারাপ হয় এই কথাটা নানাপ্রকারে ছেলেদের বুঝাইতে বুঝাইতে লীলা বেশী দুধ দিয়া পাতলা চা ঢালিয়া দিতেছিল।

বিধবা খুড়শাশুড়ী দোক্তা দিয়া পান সাজিতে বসিয়াছিলেন। মুরুব্বির সুরে কহিলেন, "হ্যাঁ, মেজবৌমা, তুমিও যেমন বাছা। এই হ্যাংলা ছেলেগুলোকে আবার তত্ত্বকথা বোঝাতে এলে। ওরা ত সব কথাই বুঝতে পারছে তোমার, আর সব শুনে ব'সে আছে।...যা যা তোরা সব বাইরে গিয়ে খেলাধূলো কর গে।" তিনি একটা প্রবল হুঙ্কার ছাড়িলেন।

নিমেষে ছেলের দল গেলাস-বাটি হাতে অন্তর্দ্ধান হইল।

লীলা একবার ব্যথিতদৃষ্টিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর ছেলেদের দিকে চাহিয়া অন্য কাজে মন দিল। ততক্ষণে বড় বড় ধামা-চুপড়ি বঁটি-বারকোশ বার হইয়াছে। তরকারি কুটিবার কাজে ইতিমধ্যে কয়েকজন বসিয়া গিয়াছে। তরকারি কুটিতে বসিয়া মেয়েদের আলোচনা যেমন জমে এমনটি আর কিছুতেই জমে না।

ও-পাড়ার চাটুজ্জেদের মেয়ে বিমলার কথা উঠিল। মেয়েটির বয়স সতর পার হইতে চলিল অথচ এখনও কোথাও বিবাহের ঠিক হয় নাই। পল্লী-ইতিহাসে এমনতর ভয়াবহ কাণ্ড আরও দুই-চারিটা যে না ঘটিয়াছে এমন নয়। এই যে সেদিন মিত্তিরদের মনোরমার আঠার বছরে বিবাহ হইল। হ্যাঁ · পাকা আঠার বছর বয়স। ন-খুড়ীমাকে ঠকাইবার জো কি! তিনি হিসাব করিয়া সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন। যে ভাদ্রে তাঁহার বিশ্বনাথ দু-বছরেরটি হইয়া মারা যায় সেই ভাদ্রের পরের ভাদ্রে মনোরমার জন্ম হয়। তবেই দেখ না কেন হিসাব করিয়া ধাড়ী মেয়ের বয়সখানা, মা-মাগী যতই কেননা কমাইয়া বলুক। তারপর বোসেদের দামিনী...তাহারও কোন্ না ষোল পার হইয়া বিয়ের ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত তাহারা সমালোচনা-কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কারণ যত বড় বয়সেই হোক, উপস্থিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিমলা...মাগো অবাক কাণ্ড! ঐ ত বাপের অবস্থা, আজ খাইতে কাল নাই, তবুও মা-মাগীর দেমাক দেখ না, পাত্র পছন্দ হয় না। যা-হয়

একটা খুঁজিযা-পাতিযা মেযে উচ্ছৃঙ্খ কবিযা দে, তা নয উনি আবার বর্ণবিচাব কবিতে বসিলেন।

লীলা ঝোলেব আলুব খোসা ছাড়াইতে ছাডাইতে কহিল, "কিন্তু খুড়ীমা, যেখানে-সেখানে মেযেকে বিযে দিলে তাবপবে সাবাজীবনই ত কষ্ট। তাব চেযে যদি ভাল পাত্র খুঁজতে একটু দেবিই হযে যায, ক্ষতি কি ?"

খুড়ীমা চট্ কবিযা একটা প্রতিবাদ কবিতে পাবিলেন না, কারণ লীলাকে একটু সমীহ কবিযা চলিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাব মতেবও যে খুব একটা পবিবর্ত্তন হইল তা নয। সেই দিনই দুপুববেলায স্নানেব ঘাটে হবি পাসিতেব স্ত্রীকে তিনি হাত-পা নাড়িযা বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা কবিতেছিলেন, "হ্যাঁ, দেখো তোমবা, আমি ব'লে দিলাম ঐ মেযেটি কম নয়। সোযামীব সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘোবে, বলতে গেলে একেবাবে ম্লেচ্ছ হযে দাঁডিযেছে। আজ আমাকে বলে কি না বিমলার বিযেতে যদি ওব মা-বাপ দেবি ক'বেই থাকে, বেশ কযেছে। মেযে-মানুষেব বিযে ভাল পাত্র দেখে দিতে গেলে অমন দেবি হযেই থাকে। কে বলেছে ? ও মা, বুঝতে পাবছ না, আমাদেব বাডীব মেজবৌমা, লালেবতী না কি নাম।"

প্রত্যুত্তবে প্রতিবেশিনী গালে হাত দিযা তাঁহাব বিস্মযের মাত্রা যথোপযুক্ত ভাষায ব্যক্ত কবিলেন। বলিলেন, এমনটি যে হইবে সে বিষযে আগে হইতেই তাঁহাব সন্দেহ ছিল। এখন ঐ মেজবৌযেব পাল্লায পডিযা বাডীব অন্য ঝি-বৌগুলা এক বকমেব না হইযা গেলে বাঁচি।

২

বাযেদেব গৃহদেবতা বাধাগোবিন্দ জীউব প্রস্তবনির্ম্মিত মন্দিব গ্রামেব মধ্যস্থলে। সন্ধ্যাবতিব সময সুবিস্তৃত আটচালায গ্রামেব সকল

স্ত্রীলোকেই প্রায় আরতি দর্শন করিতে আসেন। আরতির যথানির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ আগে হইতেই তাঁহারা আসিতে সুরু করেন, সান্ধ্য মজলিসে এমন সকল কথার আলোচনা হয় যাহার সহিত ভগবানের আরতির কোনই সম্পর্ক নাই।

লীলাও আরতি দেখিতে আসিয়াছে। আসিয়া দেখিল, আটচালার পূর্ব্ব কোণে একটি মেয়ে অতিশয় নিস্তব্ধ এবং সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছে। মেয়েটির বয়স বছর ত্রিশ বা দু-এক বছর বেশী হইবে। সধবা। আধময়লা লালপাড়ের শাড়ী পরনে। দুঃখদৈন্যের সঙ্গে অবিরত লড়াই করিয়া একটা কৃশ কঠোরতার ছাপ মুখে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সে লীলার একটু কাছে সরিয়া বসিয়া কহিল, "ভাই, তুমি নাকি ভারি সুন্দর সুন্দর সেলাই জান। আমার মেয়ের শিখবার বড্ড সখ, কিন্তু সুবিধে পায় না। সে যদি দুপুরে তোমার বাড়ী যায়, অবসরমত একটু শেখাবে ?"

"আপনার মেয়ে ? কি নাম তাঁর ?"—লীলা প্রশ্ন করিল।

"বিমলা। তুমি বোধ হয় চেন না। কিন্তু নাম শুনলেই বুঝতে পারবে।"—বিমলার মা একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, "অন্ততঃ বুঝতে পারবার কথাই ত বটে। মুখে মুখে যা আলোচনা চলেছে।"

লীলা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, এই সেই বিমলা যাহার কথা লইয়া সকালবেলায় এত আলোচনার ঢেউ বহিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "আমি যেটুকু জানি নিশ্চয় শেখাব দিদি। আমি তো দু-মাস এখন এখানেই রইলাম। তাকে আসতে বলবেন।"

বিমলার মা আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু তাহার শীর্ণ মুখের উপর একটি কৃতজ্ঞতা এবং নিঃশব্দ প্রীতির ছায়া ভাসিয়া গেল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কথাবার্ত্তার অবসর হইল না। তথাপি লীলা যেন কেমন করিয়া বুঝিতে পারিল এই স্বল্পভাষিণী সাধারণ

মেয়েটির মধ্যে অসামান্যতা কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে অদূরে সমাগতা ঐ সব মহিলামণ্ডলীর সহিত এক করিয়া দেখা যায় না কিছুতেই।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর লীলা নিজের ঘরে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ হইতে "রাসমণির ছেলে" গল্পটি বাহির করিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় দুয়ারের কাছে একটা ছায়া পড়িল। সে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলে বিমলা ঘরে ঢুকিল। বয়স তাহার পনর-ষোলর বেশী কিছুতেই হইবে না। চমৎকার সুশ্রী দেখিতে। আর সবচেয়ে লীলার ভাল লাগিল চোখে মুখে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা, যে-বস্তুটা এখানে এত মেয়ের সহিত আলাপ হইয়াছে কাহারও মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। সকলেরই মধ্যে প্রাণহীন একটা জড়তার ভাব। এই জড়ত্বের স্থূল অবলেপ অনেক সুন্দরী মেয়েকেও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিমলার বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সে সুন্দরী খুব নয়, কিন্তু তাহার জোড়া ভুরুতে, ঘনকালো তীক্ষ্ণ চোখের অত্যন্ত সপ্রতিভ বুদ্ধির একটা রশ্মি বিচ্ছুরিত। লীলার সম্মুখস্থ বইটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে মৃদুস্বরে কহিল, "রাসমণির ছেলে গল্পটা আমি যে কতবার পড়েছি। এত ভাল লাগে!"

লীলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি এ সব বই পড়?"

বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু সে লজ্জিত হইল। মনে হইল, হয়ত বিমলা মনে করিতে পারে জগতের ভাল বই একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুত সেরূপ মনোভাব লইয়া সে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখানে মেয়েদের মুখে অহরহ যে ধরণের আলোচনা ও পরকুৎসার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়াছে তাহাতে অবাক হইয়া মাঝে মাঝে সে ভাবিয়াছে, ইহারা কখনও কি তারার আলোর দিকে তাকায় না?

বিমলা নতমুখে কহিল, "আমার মা যে খুব ভাল লেখাপড়া জানেন। তিনিই অনেক যত্নে আমাদের শিখিয়েছেন।"

"সে আমি তাঁর সঙ্গে অল্প একটুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলেই বুঝতে পেরেছিলুম।"—লীলা সেলাইয়ের কলের চাবিটা খুলিতে খুলিতে বলিল।

সেদিন দুপুরবেলায় অনেকক্ষণ ধরিয়া একত্রে সেলাই করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে লীলার অনেক কথাই হইল। এই শান্ত সপ্রতিভ অনূঢ়া মেয়েটির মধ্যে একটা তেজ এবং প্রবল আত্মাভিমান রহিয়াছে, অথচ যেখানে সত্যকার সহানুভূতি থাকে মানুষ অজ্ঞাতসারেই সেখানে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়। তাই বিমলা নিজেকে যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াও কখন এক সময় লীলাকে বলিতেছিল, "দেখুন, আমার নিজের কথা বাদ দিন, আমার অনেক বয়স অবধি বিয়ে হচ্ছে না ব'লে লোকে যা তা বলছে, তাতে আমার এক বিন্দুও আসে যায় না। কিন্তু এই সব নির্দ্দয় সমালোচনায় আমার মাকে ব্যথা পেতে হয়।"

একটু পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। নম্রস্বরে কহিল, "আপনার কাছে কয়েকটা ছাটকাট শিখে নেব। কিন্তু তার জন্যে মাঝে মাঝে এলেই হবে। রোজ যদি আসি আপনারও বোধ হয় অসুবিধে হবে।"

"না অসুবিধে কিছুই হবে না। তুমি রোজই এস। আমি সারা দুপুর একা থাকি। উনি তো নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেছেন। আমারই বরঞ্চ সময় কাটে না।"

বিমলা মুখ নীচু করিয়াছিল। মুখ তুলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"হাসলে কেন?"

"বুঝতে পারলেন না? সত্যি?"

"না।"

"আমি এখানে রোজ যদি আসি, হয়ত আপনাকে অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনতে হবে। দরকার কি?"

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন অভিমানে ছলছল করিয়া উঠিল। আর বিশেষ কিছু না বলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

বিকালবেলায় পুকুরে গা ধুইতে গিয়া লীলা একাকী একটি ছায়াচ্ছন্ন বনপথ দিয়া বিমলাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। বিমলার মা দাওয়ায় বসিয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিমলা ছোট একটি নিড়ানি হাতে উঠানের শাকের ক্ষেত এবং বেগুনের চারাগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

লীলাকে দেখিয়া সে হাতের কাজ রাখিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে একখানি জীর্ণ আসন পাতিয়া দিল। তার পর আবার আপন কাজে প্রবৃত্ত হইল। বিমলার মা মৃদুস্বরে তাহার সহিত সাংসারিক সুখদুঃখের নানাবিধ গল্প সুরু করিলেন। লীলা দেখিয়া অবাক হইল, তাঁহার ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা কি সুন্দর সহজ এবং স্বচ্ছ। এক ধনীর গৃহিণী দরিদ্রের কুটীরে আসিযাছেন বেড়াইতে; তবু না আছে কোন লোক-দেখানো হৈচৈ, না আছে কোন বৃথা লজ্জা বা সঙ্কোচের ভান।

বিমলার মা নিজের শৈশবজীবনের কথা গল্প করিতেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন এক জন বিখ্যাত অধ্যাপক। ছেলে এবং মেয়েতে কখনও তফাৎ কবেন নাই। তাঁদের দুই বোনকে যথাসাধ্য যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তবুও বিমলার মায়ের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা এত খারাপ ছিল না। ওঁর স্বামী তখন কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়েন। তার পর ভাগ্যের আবর্ত্তনে সবই বদলাইয়া গেল। সরিকী মামলায় অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির শ্বশুর বিষয়-সম্পত্তিব অধিকাংশই প্রায় উড়াইয়া ফেলিলেন। স্বামীর নিউমোনিয়া ধরিল শক্ত করিয়া। যদিবা অনেক কষ্টে প্রাণটা বাঁচিল সেই হইতে চিররুগ্ন হইয়া আছেন।

লেখাপড়ার কথা ওঠায় কহিলেন, "দেখুন, ছেলেমেয়ের সুখদুঃখ সে তো তাদের ভাগ্য। বাপ-মা হাজার চেষ্টা করলেও ভাগ্য বদলে দিতে

পারে না। আমার জীবনেই তার প্রমাণ দেখলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটা বস্তু মা-বাবা দান ক'রে যেতে পারেন—সেটা শিক্ষা। জীবনে যেমন ভাবে যে অবস্থাতেই থাক, যথার্থ শিক্ষিত হ'লে অসুন্দরতাকে সে প্রাণপণে পরিহার ক'রে চলবেই। বিমলাকে ম্যাট্রিক আই-এ পাস না করাতে পারি, এইটুকু শিক্ষাই আমি যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করেছি।”

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিমলাদের ছোট তুলসীপ্রাঙ্গণে একটি মাটির প্রদীপ মৃদু জ্বলিতেছে। বিমলার মা বলিলেন, “বিমলা, যাও তোমার মাসীমাকে পৌছে দিয়ে এস। সন্ধ্যে হয়ে গেল, অচেনা পথ। না-হয় মন্দির অবধি পৌছে দিয়ে এস। সেখানে এতক্ষণ হয়ত আরতি সুরু হয়ে হয়ে গেছে। আমি আজ আর আরতি দেখতে যাব না। ওঁর শরীরটা ভাল নেই।”

প্রথম শুক্লপক্ষের মৃদুস্ফুট জ্যোৎস্না আঁকাবাঁকা রাস্তা ও তেঁতুলের ঝাড়, বাঁশঝাড়ের উপর পড়িয়া কি এক রকম দেখাইতেছিল। নির্জ্জন রাস্তায় চলিতে চলিতে লীলার মনটি তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এখানে আসার পর হইতে এখন এমন এক বাড়ীর সহিত আলাপ হইল যেখানে আসা-যাওয়া করিলে যথার্থ তৃপ্তি ও আনন্দ পাইবে। বিমলার মায়ের মুখের কথাটি তাহার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল, মা বাপ একটি বস্তু সন্তানকে দান করিতে পারেন, সে এমন শিক্ষা যাহা জীবনে সকল অবস্থাতেই সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করে। কোন প্রকারেই যেন অসুন্দরতাকে মানিয়া না লয়। বিমলাদের বাড়ীর সহিত তুলনা করিতেই এ-কথাটার অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেদিন পাশের বাড়ীতে সেজখুড়ীমাদের ওখানে বেড়াইতে গিয়াছিল। তখন বাড়ীতে একটা হুলস্থুল বাধিয়া গিয়াছে। সেজখুড়ীমা একটা আট হাত শুদ্ধ কাপড় পরিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কুয়াতলায় চর্কিবাজীর মত ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার পুত্রবধূ ম্লান ভীত মুখে সুমুখে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার হইয়াছিল, নীচ জাতীয়া ঝিয়ের মাজিয়া-আনা বাসন আর একবার ভাল

করিয়া জল ঢালিযা ঘবে তোলা হয। ছোটবৌটি সেই কাজেই বত ছিল। কিন্তু সেজখুড়ীমাব কেমন কবিযা মনে হইযাছে, যথোপযুক্তরূপে জল ঢালা হয নাই, অতএব জাতজন্ম সবই গিযাছে। তুচ্ছ একটা ব্যাপাব লইযা কি তুমুল কলবব, শান্তিভঙ্গ, মনঃকষ্ট। জীবনেব সকল মাধুর্য্য অবমানিত হইযা গিযাছে।

৪

স্নান কবিযা আসিযা লীলা পান সাজিতে বসিযাছিল। বডবৌ পাশে বসিযা জাঁতি দিযা সুপারি কাটিযা স্তূপাকাব কবিতেছিলেন। একটুখানি হাসিযা কহিলেন, "এত দিন পবে বোধ কবি বিমলাব বিযেব ফুল ফুটল। শুনছি কোন্ এক জাযগা থেকে নাকি দেখতে এসেছে। তাবা কাল বাত্রিব ট্রেনে এসেছে। গরুব গাড়ী কবে এখানে পৌছতে সেই যাকে বলে গিযে বাত এগাবটা। আজ সকালে বুঝি কনে দেখান হবে।"

লীলা উৎসুক হইযা উঠিযা কহিল, "তাই নাকি? আচ্ছা কেমন জাযগায সম্বন্ধ হচ্ছে দিদি?"

"নেহাৎ মন্দ নয। পাত্রটি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পডেছে। গাঁযে জমাজমা আছে। মোটা ভাত-কাপডেব কষ্ট নেই। তবুও কি খাঁই কম! একটি হাজাব টাকা পণ নেবে। তা ছাড়া অল্পস্বল্প গযনাগাঁটি, বিযের খবচ। কত জাযগায খুঁজে দেখলে। এব চেযে কমে কি আর মেযেব বিযে হয।'

পাড়াব কৌতূহলী মেযেব দল, যাহাবা কোনদিন গ্রামের একপ্রান্তে বিমলাদেব গৃহে পদার্পণ কবে না, আজ একেবাবে দলে দলে ভাঙিযা পডিযাছিল। লীলাও গেল। পাশেব ঘব হইতে দেখিল, সদবেব তক্তপোষেব উপর একটি পরিষ্কাব চাদব পাতা। বব তাহাব এক জন

বন্ধুকে লইয়া দেখিতে আসিয়াছে। বিমলা একখানি সাদাসিদে ধোয়ান কালোপাড়ের কাপড় পরিয়া পিতার সহিত গেল। অত্যন্ত বাহুল্যবর্জ্জিত বেশ। অলঙ্কাব বা প্রসাধন কিংবা জর্জ্জেট বেনারসীর একান্তই অভাব। তথাপি ঐ বেশেই তাহাকে কি চমৎকার মানাইয়াছে। শান্ত মুখচ্ছবিতে একটি আত্মসমাহিত ভাব। কপালেব সিন্দুর-বিন্দুটি জ্বল জ্বল করিতেছে। জীবনের দুঃখদৈন্যকে জানিয়া শুনিয়া বরণ করিয়া লইয়াও ঐ সিন্দূরের টিপটি যেন একটি রক্তগোলাপ হইয়া ফুটিয়া আছে।

বরের বন্ধু কলিকাতার ছেলে, গ্রাজুয়েট। আজকালকার অত্যন্ত নব্য এবং চতুর যুবক। সমস্ত জিনিষেব বাজারদব যাচাই করিয়া বাজাইয়া লইতে পারে। তাই বিশেষ নির্ব্বন্ধ করিয়া তাহাকে এ ব্যাপারে আনা।

বন্ধুটি একটা সিগারেট ধবাইয়া কহিল, "আচ্ছা আপনি ক'রকম সেলাই জানেন? এম্ব্রয়ডারি, কাশ্মীবি ষ্টিচ? ··পিক্‌টোগ্রাফ? ··আচ্ছা বলুন দেখি মাছের কোপ্তা কেমন ক'বে বাঁধে? মুড়ি ভাজতে জানেন? রাঁধাবাড়া বাটনা-বাটা এসব?·· ভাতের ফেন কেমন ক'বে ঝরায় বলুন দেখি? ··আচ্ছা গান? গান কি এস্রাজ বাজিয়ে করেন, না হার্ম্মোনিযাম?"

বিমলা বিশেষ কোন কথাব জবাব না দিয়া স্মিতমুখে নমস্কাব কবিয়া উঠিযা আসিবার সময কহিল, "সাধাবণ অল্পআযেব অধিকাংশ বাঙালী গৃহস্থঘর চালাতে গেলে যা যা শিখতে হয় সেইটুকু মাত্র শিখেছি। তাব বেশী জানি নে।"

শোনা গেল, কন্যা পছন্দ হইযাছে। ববেব বন্ধু বায দিযাছেন, অত্যন্ত সেকেলে, যদিও চেহাবা মন্দ নয। কিন্তু স্বয়ং পাত্র বলিযাছেন, "যাদের দু'খানা হালের জমিতে সংসাব চালাতে হব তাদেব স্ত্রী এস্রাজ বাজিযে গান গায়, না হার্ম্মোনিয়ামেব সঙ্গে গায়, এ-কথাটি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"

লীলার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু সেদিন দুপুরবেলায় যথানিয়মিত সেলাই শিখিতে আসিয়া বিমলা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমি কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ মাসীমা। ভেবে দেখ বাংলা দেশের নিরানব্বই জন মেয়ের ত এমনই ক'রে অর্দ্ধসচ্ছল সংসারে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়। আমি তাদেরই এক জন—একথা ভাবতে আমার মনে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু এই মনে ক'রে কেবল আমার হাসি পাচ্ছে যে, বাংলা-দেশে কনে-দেখা বস্তুটা কি রকম প্রহসনের ব্যাপার! মেয়েটিকে যাচাই করতে এসে জহুরি এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীটস্, বায়রণ পড়েছ?…তুমি ঘুঁটে দিতে পার? অথচ এর হাস্যকরতা, নিষ্ফলতা আর অসঙ্গতির দিকটা তাদের চোখে পড়ে না।"

বাঁশীর সুর

১

মেয়েটি আজ ক'দিন হইল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতে উঠিয়াছে। অসুখটা হইযাছিল শক্ত রকমের। রোগা হইয়া গিয়াছে, মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা। সমস্ত মুখে রোগশীর্ণ একটি অরুণ আভা।

সকালবেলা হইতে একটি কমলানেবু হাতে করিয়া শুধু মোজা পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নেবুটি তখনই খাইতে মীরার মায়া হইতেছে। জানে ফুরাইয়া গেলে মায়ের কাছে আর নাই।

মীরার মা তখন ভাণ্ডার-ঘরের রোয়াকে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। সামনেই কল। সেখানে চাকরে বাসন ধুইতেছে। স্থানটা জলে এবং কাদায় ভর্ত্তি। মীরা মায়ের কাছে ঘোরাফেরা করিতেছে। মা ডাক দিয়া কহিলেন, "ও মাণিক, শুধু মোজা প'রে ঘুরে বেড়ায় না। জলে এখনই ভিজে মোজা নষ্ট হয়ে যাবে আর পায়ে ঠাণ্ডা লাগবে।"

মীরা করুণ ভাবে মায়ের পানে চাহিয়া বলিল, "আমার যে জুতো নেই মা। তুমি তো জান।"

তখন মায়ের স্মরণ হইল তাই বটে। মীরার জুতাজোড়াটা অন্ততঃ দশবার মুচির কাছে পাঠাইয়া তিনি তালি দিয়া আনিয়াছেন কিন্তু আর সেটা দিয়া কাজ চলে না। এত দিন মীরার অসুখ চলিতেছিল, শুইয়া তাহার দিন কাটিত, জুতার প্রয়োজন তেমন ছিল না।

সময়টা শীতকাল, পশ্চিমের শীত দুরন্ত, তাহার উপর মেয়েটা সদ্য এতবড় অসুখ হইতে উঠিল।

মীরার মা মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, কাজকর্ম্ম শেষ হইলে বাক্স

খুলিয়া তাঁহার তহবিল মিলাইবেন এবং যেমন করিয়া হোক ও-বাড়ির ঠাকুরপোকে দিয়া বিকালে তাহার জন্য একজোড়া জুতা আনাইবেন। এখন মেয়েকে কাছে ডাকিয়া পাশে একখানা আসন পাতিয়া বলিলেন, "এখানে এসে বোস্ মা। আজ বিকেলে তোর জন্যে দোকান থেকে নতুন জুতো নিশ্চয় আনিয়ে দেব।"

খবরটা মীরার পক্ষে এমন অভাবনীয় যে আনন্দে তাহার শীর্ণ মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কবে যে তার জুতা কেনা হইয়াছে সে আর এখন তার মনেও পড়ে না। বোধ হয় বছর-তিনেক আগে। অত্যন্ত খুশী হইয়া সে আসনে বসিয়া কহিল, "সত্যি মা?"

—হ্যাঁ, মা। কিনে দেবো বইকি।

নেবুটা আলেষ্টারের ছিন্ন পকেটে গুঁজিয়া রাখিয়া সে স্থির হইয়া বসিল। এখন বোধ হয় ঘড়িটিতে নটা বাজে। আর কিছুক্ষণ পরে দুপুর হইবে, তার পরে বিকাল, আর তার কিছুক্ষণ পরেই তার নতুন জুতা আসিবে। পৃথিবীতে এত সুখও অবশেষে ছিল। মধ্যবিত্ত, অভাবেব ঘরের মেয়ে, এই তো মোটে তার ছ-সাত বছর বয়স হইয়াছে ইহারই মধ্যে ঘরকন্নার কাজ অনেক শিখিয়াছে। বলিল, "দাও না মা তোমার শুক্তনিটা আমি ততক্ষণ কুটে দিই। নটা বাজে, বাবা খেয়ে-দেয়ে কাছারি যাবেন। তুমি রান্না করবে না?"

মা সস্নেহে একবার তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোর রোগা শরীর, থাক না মীরা। ক'টা আনাজ কুটতে আমার কতক্ষণই বা লাগবে।"

তার পরে মীরার বাবা আসিলেন। তিনি চার-পাঁচ বছর হইতে পশ্চিমের এই শহরে ওকালতী করিতেছেন। স্থানীয় বড় উকিল তেজনারায়ণ ধনধনিয়ার কাছে জুনিয়ারি করেন। সকাল সাতটা

বাজিতে-না-বাজিতে তাঁর বাড়িতে ছোটেন এবং কাছারি যাইবার আধ ঘণ্টা আগে বড়জোর বাড়ি ফিরিয়া আসেন। শুধু যে তাঁহার জুনিয়ারি করেন এমন নয়। তাঁহার বোকা ছেলেকে ঘণ্টাতুই করিয়া পড়ান, শহরের একপ্রান্তে গোলাঘাটের এক দোকানে কাশীর জর্দ্দা আর লক্ষৌয়ের সুর্ত্তি এবং কিমাম পাওয়া যায়, সেখান হইতে ধনধনিয়া-গৃহিণীর জন্য তাহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। আরও কত টুকি-টাকি কাজ যে করিয়া দেন, প্রত্যহের কত পুঞ্জীভূত হীনতা, কত মিথ্যা চাটুবাক্যের গ্লানি যে তাঁহাকে বহন করিয়া চলিতে হয়। তথাপি তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। কত বেহারী জুনিয়ার উকিল তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত লোলুপ দৃষ্টির সম্মুখ হইতে প্রতিদিন মোকর্দ্দমা লইয়া যায়, তিনি পান না। কায়ক্লেশে তাঁর সংসার চলে। জীবনযুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং প্রকৃতি রুক্ষ হইয়া গেছে।

২

ঘড়িতে এগারটা বাজিল। মীরাব বাবা মন্মথবাবু স্নান এবং আহার সারিয়া চাপকানের বোতাম আঁটিতে আঁটিতে একায় চড়িয়া কাছারির উদ্দেশে বাহিব হইয়া গেলেন।

মীরা কয়েকটা সুজির রুটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া থাইল। তার মায়ের রান্নাঘরের সব কাজ মিটিল। ক্ষুদ্র অপরিসর বারান্দায় যেথানে রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেইখানে একটি মাতুব বিছাইয়া মীবার মা বসিলেন মীরার ছোট ভাইটিকে লইয়া। এই তো তুপুব কাটিয়া আসিল, এইবারে বিকাল হইবে। তার পরেই মীরার জুতা। আনন্দে মীরা তাহার বহু পুরাতন আলেষ্টারের পকেট হইতে কমলানেবুটি বাহির করিয়া এতক্ষণ পরে তার খোসা ছাড়াইল।

খোকাকে ডাকিয়া কহিল, "চুনি, নেবু নিয়ে যা। তোকে দু-কোয়া দেবো।"

মীরার মা সুমনা বড়লোকের মেয়ে। কলিকাতায় বাপের বাড়ি। কিন্তু আজ দশ-বার বছর বিবাহ হইয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া অভাবগ্রস্ত স্বামীর সংসারের ঘরণী হইয়া সে-সবই ভুলিয়াছেন। একটু পরে খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া উঠিয়া তিনি ঘরে আসিয়া বাক্স খুলিলেন। টাকার ব্যাগ খুলিয়া গুণিলেন, আঠারটি টাকা আছে। আজ ইংরেজী মাসের একুশে, এমাসে রোজকার সামান্য, বাজার-খরচ তিন-চার আনা বাদ দিয়া স্বামীর উপার্জ্জন এই হইয়াছে। এখনও কত বাকী। মাস ফুরাইতে-না-ফুরাইতেই গোয়ালার দুধের দাম, ঠিকা চাকরটার মাহিনা, বাড়িভাড়া সমস্তই দিতে হইবে। কিন্তু ভাবিয়া ফল নাই।

পাশের বাড়ির নিতু তখন দুয়ারের কাছে আসিয়া ডাক দিতেছে,— "বৌদি ডেকে পাঠিয়েছিলে, কিছু দরকার আছে নাকি ?"

"হ্যাঁ, ভাই। মীরার পায়েব এক জোড়া জুতো এনে দিতে হবে।"

"কেমন জুতো চাই ?"

"ওরই মধ্যে একটু শক্ত টেকসই হয়। জানই তো একবার কিনলে আবার যে কিছুদিন পরে কিনে দোব সে সামর্থ্য নাই।"

চোখ-মুখ খুশীতে উজ্জ্বল করিযা মীরা নিতুর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "নিতুকাকা, আমি সেই রকম ফুলওয়ালা জুতো নেব। সেই যে তোমার বোন রুনুর পায়ে দেখেছি।"

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, "না না পাম্‌শু নিতে হবে না। বড্ড তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়।" নিতু মমতাভরা চোখে একবার মীরার দিকে চাহিল। বেচারা জানে না ভাল-কাজ-করা পাম্‌শু, রুনু যেমন পায়ে দিয়েছিল, তার দাম পাঁচ-ছ টাকা। কহিল, "আচ্ছা বৌদি এক কাজ করলে হয় না, মীরাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাই। জুতো কেনা, যার জন্যে কিনব সে সঙ্গে থাকলেই ভাল হয়।"

"বেশ তাহলে ক'টাকা তোমায় দেব ?"

"ঐটুকু বাচ্চার জুতোর দাম আর কত হবে ? আচ্ছা আগে আমি নিয়ে আসি তার পরে সে-সব হবে।"

ঘণ্টা-দুই পরে লাইমজুস্ খাইয়া পিপারমেণ্ট-দেওয়া পানে ঠোঁট দুটি লাল টুকটুকে করিয়া খুব সৌখীন এক পাম্‌শু পায়ে, জুতার বাক্‌সটা বগলে চাপিয়া আনন্দে উদ্বেলিত মীরা যখন তাহাদের বাড়িতে ঢুকিল, ঠিক সেই সময়ে মীরার বাবা কাছারি-ফেরত শুষ্কমুখে টমটম হইতে নামিতেছেন।

নিতু মীরাকে তার মায়ের কাছে দিয়া বলিল, "নাও বৌদি তোমার মেয়ে। আহা বেচারা অসুখে ভুগে বড় দুর্ব্বল হয়ে গেছে। এক দোকান থেকে আর এক দোকানে একটুখানি যেতেই একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষে কোলে ক'রে নিলুম। জুতো কেমন হয়েছে ? কত দাম নিয়েছে ? দাম আর কত, টাকা-দুয়েক।" আসলে জুতার দাম চার টাকা পনের আনা। কিন্তু নিতু ঠিক করিয়াছিল বৌদির কাছে দু-টাকার বেশী কিছুতেই লইবে না।

" ও কি, আবার মোজা, গার্ডার। এ-সব কেন ঠাকুরপো ?'

"হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। তোমাকে বলতে ভুলেছিলুম, জুতোর দাম এক টাকা ছ-আনা। আর মোজা-টোজা সবসুদ্ধ ধরে দু-টাকা। " নিতু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল। সে অনেকবার নিজে হাতে মীরাকে কিছু দিতে গিয়া দেখিয়াছে দারিদ্র্যাভিমানিনী বৌদি তাহা নেন না। তাই এবারে এই ছলনাটুকু করিল।

সুমনা অপ্রসন্ন মুখে বাক্‌স হইতে দুটি টাকা বাহির করিয়া আনিল। মনে মনে ভাবিল, আবার মোজা কেনা কেন। তা না হইলে ত পুরা দুইটি টাকা লাগিত না।

নিতু চলিয়া যাইবার ঘণ্টাখানেক পরে মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে কহিল, "ওগো বাক্‌সে টাকা আঠার আছে, নয় ? কাল যে কাছারি যাবার

আগে গুণেছিলুম আঠার টাকা এগার আনা ছিল। তা দু-দিনের বাজার-খরচে খুচরো পয়সাটা বাদে আঠার টাকাই নিশ্চয় থাকবে। তুমি এক কাজ কর দেখি, খরচের জন্য একটি টাকা রেখে সতের টাকা আমাকে বার ক'রে দাও। আজ আর কাছারিতে কিছুই পাই নি।"

"একসঙ্গে এত টাকা কি হবে ?"

"তোমাকে বলি নি, আর ব'লেই বা কি হবে ! মাসে যা যৎসামান্য পাই, তাতে খরচ চলে কই। প্রত্যেক মাসেই তাবাপদর কাছে কোন মাসে আট কোন মাসে দশ এমনি ধার করতে করতে প্রায় একশো টাকা দাঁড়িয়ে গেছে। আজ বার-লাইব্রেরীতে সকলের সামনেই অপমান ক'রে বসলে। আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। বলেছে আজ পনের টাকা কম ক'রে তাকে দিতেই হবে।"

"তবে সতের চাইছ কেন ?" সুমনা সাহস সঞ্চয় করিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল।

"আর দুটো টাকা জরদা আর কিমাম বিক্রী করে সেই মুসলমানটাকে দিতে হবে। ধনধনিয়া-গিন্নীকে নিজের পয়সায় স্ফূর্ত্তি আর জরদা কিনে ভেট দিতে দিতে ফতুর হবে গেলাম, তবু যদি একটা মক্কেলের মুখ দেখবার জো রয়েছে। আজ মুসলমান বুড়োটা পথের মাঝে এক্কা দাঁড় করিয়ে বলে, 'বাবুজি, আমার দোকানে কমসে কম তোমার পনের রূপেয়া বাকী। আজ পাঁচ মাস ছ-মাস হয়ে গেল এক পয়সা দিলে না। আব আমি কেমন ক'রে অপেক্ষা করব।' তাকেও আজ টাকা-দুয়েক না দিলে অনর্থ করবে।'

"তোমার যে এত জায়গায় ধার রয়েছে সে-কথা আগে ত আমাকে ঘুণাক্ষরেও বল নি।" সুমনা বিহ্বলের মত তার নিজের নাম লেখা ক্যাশ-বাক্‌সটার দিকে চাহিল।

"ব'লে কি হবে ? বলবার মত কথা হ'লে বলতুম। এখন দাও দিকি টাকাটা চটপট বাক্‌স থেকে বার ক'রে।"

আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই। সুমনা মরীয়া হইয়া কহিল, "অত টাকা নেই বাক্সে, ষোলটি টাকা রয়েছে।"

মন্মথ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, "এর মধ্যে এত খরচ ক'রে ফেলেছ? কিসে খরচ করলে? এবার থেকে টাকাকড়ি হিসেবপত্র সব আমি নিজে করব। চাবিও রাখব আমার কাছে। চুপ ক'রে রইলে কেন? জবাব দাও। এত কি নবাবের মেয়ে হয়েছ যে, এক জন মুখের রক্ত উঠিয়ে টাকা রোজগার করবে আর তুমি তা জলের মত খরচ ক'রে যাবে, হিসেবটাও দিতে পারবে না।"

"মেয়েটার জুতা ছিল না।"···সুমনার মূর্চ্ছিতপ্রায় কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিশাইয়া গেল।

"জুতো কিনেচ মীরার? ··দু-টাকা খরচ ক'রে! তাই বটে, আজ কাছারি থেকে ফেরবার সময় দেখলুম মেয়ে নতুন সৌখীন জুতো পায়ে আহ্লাদে ডগ্‌মগ হয়ে আসছে। তোমাদের লজ্জা নেই? দেনার দায়ে স্বামীকে পথের লোকে অপমান ক'রে যাচ্ছে আর এদিকে এই সব হচ্ছে।"

মন্মথর গলার আওয়াজ ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে লাগিল। মীরা ভয় পাইয়া দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। নতুন জুতোটি পা হইতে খুলিয়া বাক্সে ভরিয়া কাগজের বাক্সটা সে বুকের কাছে চাপিয়া ছিল। তাহার দিকে চোখ পড়িতেই মন্মথ যেন ক্ষেপিয়া গেল। ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে বাক্সটা কাড়িয়া লইয়া উন্মত্তের মত বলিতে লাগিল, "এই সব হচ্ছে, এই সব হচ্ছে! আহ্লাদে মেয়ে, অমন জুতোর নিকুচি কর!" বলিয়া জুতাজোড়া সবেগে দেওয়ালের দিকে নিক্ষেপ করিল। একটা জুতার ফুল ছিঁড়িয়া খুলিয়া গেল। মীরা কাঁদিবার উপক্রম করিতেই তাহার বাবা গালে সশব্দে এক চড় মারিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া দিলেন।

মা ছুটিয়া অশ্রুস্তম্ভিত চক্ষে মেয়েকে তুলিয়া স্থির কণ্ঠে কহিলেন,

"রোগা মেয়েকে অমন ক'রে মেরো না। হয়ত এখন তোমার মন খুব উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, অন্য জায়গায় যাও। পয়সা না-থাক্‌লেও মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে, সেটা যায় না। এটুকু অন্ততঃ তোমার কাছে আশা করতে পারি।"



ঘরের মাঝে একটুক্‌রা জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। সুমনা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে। স্বামী এখনও ফেরেন নাই। অদূরে ক্ষুদ্র বিছানায় খোকা আর মীরা শুইয়া আছে। সুমনা বসিয়া ভাবিতে ছিল আগেকার দিনের কথা। বাবা ছিলেন কোলকাতার বড় ডাক্তার, চাল-চলন ছিল একালের মত। সুমনাকে গান শিখাইয়া ছিলেন, মেম রাখিয়া শেলাই শিখাইয়া ছিলেন। বেথুন কলেজিয়েট্‌ স্কুলে সে যখন ফোর্থ-ক্লাসে পড়ে তখন বিয়ে হয়। স্বামী মন্মথ ছিল দেখিতে সুপুরুষ, তাঁহার চেহারা দেখিলে দু-দণ্ড তাকাইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়ে। লেখাপড়ায় অত্যন্ত ভাল হবকুমার-বাবুব সঙ্গে আলাপ হইয়া গেল একদিন কি একটা উপলক্ষে। বুঝি কোন বন্ধুব অসুখে তাঁহাকে ডাকিয়া নিয়া গিয়াছিল। দেখিবামাত্র ছেলেটিকে তিনি কি যে সুচক্ষে দেখিলেন। সুমনাব সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করিবার পবেও বাড়ীর মেয়েবা আপত্তি তুলিয়া ছিল ছেলের আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলিয়া। কিন্তু হরকুমার সে আপত্তি গ্রাহ্যে আনেন নাই।··· সোনার টুকবো ছেলে। ওকালতী পাস করাইয়া কলিকাতায় তাহাকে তিনি বসাইবেন। নিজে যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী, জামাইকে সাহায্য করিয়া দাঁড় কবাইয়া দিয়া যাইবেন। কোথায় বা কি হইল, যে বছর মন্মথ ওকালতী পাস করিয়া বাহির হইল, সেই বছর সুমনার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মারা যাইবার পরে দেখা গেল কিছুই রাখিয়া

যান নাই। বালীগঞ্জে এক সুবৃহৎ বাড়ি, মোটর, ছোট পাঁচ-বছর বয়সের একটি মেয়ে এবং বিধবা স্ত্রী। তবে একমাত্র আশার কথা তাঁর বড় ছেলে বছর দুই আগে বিলেতী ডিগ্রী লইয়া ডাক্তারি সুরু করিয়াছে এবং বাবার পশার আস্তে আস্তে তাহার হাতে আসিতেছে। নরেন্দ্র প্রথমটায় খুব ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। বাবা বাঁচিয়া থাকিতে এত নাম এত ষ্টাইল কিন্তু মৃত্যুর পবে তাঁহাব সিন্দুক শূন্য। এমন গোলমালের সময়ে সুমনা বা তার স্বামীর কথা কেহ ভাবিল না। পশ্চিমে জীবনযাত্রার ব্যয় অল্প, জিনিষপত্র সস্তা, তাই মন্মথ এখানে আসিয়া ওকালতীতে বসিল। সুমনা তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল সেই সব দিন কত আশা কত আনন্দেই না কাটিয়াছে। ওকালতি পাসের খবর যেদিন বাহির হইল সেদিন মন্মথ কত হাস্য-পরিহাস কত আমোদের ভিতব দিয়া তার কানে কানে এই অতিশয় প্রিয় সংবাদটি দিয়াছিল। তাব পরে দুই জনে মিলিয়া ভবিষ্যতের কত ছবি আঁকা…কত স্বপ্ন দেখা…হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত সুমনার বাবা সন্ন্যাসরোগে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলেন। যেখানে অনেক আলো জ্বলিতেছিল, সভা বসিয়াছিল, সঙ্গীত-প্রবাহ বহিতেছিল, সেখানে অকস্মাৎ আলো নিবিয়া গেল। গাঢ় তমিস্রায় সকলের নয়ন অন্ধকার হইয়া গেল। যাহা কিছু ছিল সমস্তই অকালে ভাঙিয়া গেল। সেই হইতে সুমনা বিদেশে। অল্প আয়ে অপরিচিত জায়গায় কোনক্রমে জীবনতরণী বাহিয়া চলিয়াছে। মনে আর আশা নাই, জীবনে আর জ্যোতি নাই। কালে সবই সহিয়া আসিতেছে।…কেবল আজিকার ব্যাপারটায় মনে বড় লাগিয়াছে। রোগা মেয়েটা অত মার খাইয়া কেমন যেন নির্জ্জীবের মত হইয়া পড়িয়াছে। অত যে সখের জুতা তাও অনাদৃতেব মত আলনার তলায় পড়িয়া আছে। সুমনা ভাবিতেছিল সে ছেলেবেলায় দাদার সঙ্গে মোটরে করিয়া নিউমার্কেটে গিয়া কত দিন কত দামী জুতা কিনিয়া আনিয়াছে

আর নিজেব মেযেব একটা সামান্য সখ · না, সখও নয, অবশ্যপ্রযোজনীয একটা সামান্য জিনিষ, তাও কিনিযা দিবাব অধিকাব বা সামর্থ্য তাহার নাই। নানা স্মৃতিব আলোডনে আপন অজ্ঞাতসাবে চোখ দিযা তাহাব জল পডিতেছিল অত খেযাল কবে নাই অস্ফুট চন্দ্রালোকে নিঃশব্দে অপরাধীব মত কে ঘবে ঢুকিল। ঢুকিযা নিদ্রিতা মীবাব পাশে আসিযা বসিল। অনেকক্ষণ ধবিযা বড যত্নে তাহাব নবম বেশমেব মত চুলগুলিব উপব হাত বুলাইতে লাগিল।

আধা আলোছাযাময ঘবে কিছুই স্পষ্ট কবিযা দেখা যায না।

"সুমনা।"

সুমনা চমকাইযা উঠিল। তাহাব পবে আপনাকে সংববণ কবিযা লইযা স্বামীব পানে চাহিযা কহিল "কি বলছ?"

"মেযেটা কি বড বেশী কাঁদছিল?" মন্মথ ধীবে ধীবে অতি সন্তর্পণে ঘুমন্ত মীবাব মুঠিবাঁধা হাতটি খুলিযা দিল।

"না, তেমন আব কি কাঁদছিল। ছেলেমানুষ অল্প সমযেব মধ্যেই সব ভুলে যায। কিন্তু ফিবতে তোমাব এত বাত হ'ল কেন?" · সুমনা তখন সাংসাবিক জগতে ফিবিযা আসিযাছে। একটুখানি আগেকার ক্রন্দনবিবশা স্মৃতিভাবাতুরা নাবী তখন আব নাই, তাহাব জাযগায মমতাময়ী স্ত্রী আসিযা স্থান নিযাছে। সুমনা মনে মনে স্বামীকে ক্ষমা কবিল তখনই। ভাবিল, একে ত লোকটা সংসাবেব ভাব বহিযা নানা জ্বালায উদ্‌ভ্রান্ত। তাঁহাকে আব বৃথা কষ্ট দিই কেন।

"বাত অনেক হযেছে। এবাবে তুমি খেতে বসো। ভাতটা ঠাণ্ডা হযে যাবে ব'লে গবম জলেব কডাব উপব বসিযে বেখে দিযেছি। চলো দিইগে।"

কিন্তু মন্মথ যেন শুনিতেই পায নাই, সে আপন মনে বলিযা চলিযাছিল, "ছুটে পালালুম দাঁডিযে দাঁডিযে মীবাব কান্না শুনতে পারলুম না।

আহা, মা আমার কতদিন পরে সবে দুটি ভাত মুখে দিয়েছিল। কি মনে করলে যে! এমনিতেই ত অনেক কষ্ট সুমনা, ছেলেমেয়েকে কখনও না-দিতে পেরেছি একটা সখের জিনিষ, না একটা খেলনা। বলে, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, আমারও হয়েছে তাই। সামনে পিছনে কোনদিকে তাকাবার আর অবসর নাই।"

"নাও, কি যে বকতে সুরু করলে পাগলের মত তার ঠিক নেই। রাগের সময় মানুষের অত ঠিক থাকে না। ছেলেমেয়েকে তখন অন্যায় ক'রে দুটো বকে, মারে। তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আর সত্যিই ত, তোমার মাথা কি ঠিক রয়েছে, এক জনের উপর কত ভার।" সুমনা সান্ত্বনামাখা স্নিগ্ধ সুরে কহিল। দুই জনেই এবারে দুইজনের মনের কথা বুঝিল। বুঝিয়া চুপ করিয়া থাকিল। আর কথা হইল না, মন্মথ খাইবার জন্য উঠি-উঠি করিতেছে এমন সময় হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতাকে চিরিয়া কোন্‌খান হইতে বাঁশীর একটা আওয়াজ আসিল। ক্রমে সিন্ধু, তার পর বাঁরোয়া, তার পরে ইমনকল্যাণ এবং তারও পরে বেহাগ বাজিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল সুরের সেই তরঙ্গাবেগে জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম উত্তরীয় যেন কাঁপিয়া কাপিয়া উঠিতেছে। মন্মথ অস্ফুট স্বরে কহিল, "ধনধনিয়ার সেই বেকার ভাইপোটা, রামখেলাওন্‌, এ তারই বাঁশী। ছোক্‌রা বাজায় ভাল। যেদিন তার মন খুলে যায় সেদিন প্রাণ দিয়ে বাজায়।" বাঁশী বাজিয়াই চলিল। অনেকক্ষণ পরে থামিল। কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনা যেন থামিতেই চায় না।

সুমনা আর মন্মথ চুপ করিয়া আছে। সুমনা ভুলিয়া গিয়াছে আর খাওয়ার তাগিদ দিতে। এখন যে তার অনেক কাজ বাকী। মন্মথর খাওয়া হইলে সে খাইবে তার পর রান্নাঘর ধুইবে, হেঁসেল তুলিবে। সে-সব কথা নিঃশেষে ভুলিয়া গিয়াছে। মন্মথ ভুলিয়া গিয়াছে তাহার পাওনাদারের তাড়া, ভুলিয়া গিয়াছে তাহার নিরীহ রোগা মেয়েটাকে

বিনা দোষে মারিয়া ফেলার মর্ম্মজ্বালা। বাঁশীর সুর তাহাকে প্রতিদিনের কাঁটার ঘা হইতে তুলিয়া আরও অনেক ঊর্দ্ধলোকে লইয়া গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্নার আলো-হাওয়ার কম্পন, আকাশের তারা সমস্তই কেন্দ্র করিয়া আছে একটি অনিন্দ্যসুন্দর কিশোরী মুখকে। বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিয়া মন্মথ মৃদুস্বরে কানে কানে কথা বলার মত করিয়া কহিল, "মনে পড়ে সু—সেই যে তোমাকে বলতুম, বাড়ি থেকে যখন কলকাতায় আসতুম, কলকাতা ষ্টেশন যত এগিয়ে আসত ততই বুকের মধ্যে কি রকম করত। চোখে জল এসে পড়ত। মনে হ'ত, আর একটু পরে, তার পরেই তোমাকে দেখতে পাব। এর চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি আছে!"

সুমনা কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রীতিভরা চোখে সে একবার স্বামীর দিকে একবার ঘুমন্ত ছেলে-মেয়ের পানে চাহিল। একটু আগে মেয়েকে অন্যায় করিয়া অমন মারার জন্য স্বামীর উপর তাহার মনে যত অভিমান যত ক্লেশ সঞ্চিত হইয়াছিল, যত অশ্রুবাষ্প ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত কাটিয়া গেল। বাঁশীর সুরের মায়ায় তাহার একটানা ক্লান্তিকর জীবনের উপর হইতে এক নিমেষে যেন সকল আবরণ খসিয়া পড়িল। ছেলে অসুস্থ হইলে, রাগ অভিমান করিলে সব সময়ে ত তাহার মেজাজ ভাল থাকে না, তখন মায়ের উপর অযথা পীড়ন করে। মাকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তাই বলিয়া মা কি ছেলের উপর রাগ করিয়া থাকিতে পারেন? মাতার সেই বিশাল ধৈর্য্যপূর্ণ অন্তর লইয়া সুমনা তাহার স্বামীর সমস্ত কঠোর ব্যবহার ক্ষমা করিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, 'বাইরের নানা অপমান নানা ধাক্কা ওঁকে সইতে হয়। তাইতেই আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন ব্যবহার ক'রে ফেলেন। না-হয় মানলুম আমার ছোট সংসারে অনেক দৈন্য অনেক অভাব-অনটন। কিন্তু আমার মত এমন ক'রে

ভালবাসবার সুযোগ পেয়েছিল ক'জনে, আর এত বেশী ক'রে তা ফিরে পেয়েছিলই বা কে।"

কয়েকটা বাড়ির পরে ধনধনিয়াদের মস্ত বড় ত্রিতলের ছাদে তখন রামখেলাওন বাঁশীতে কানাড়ার সুর ধরিয়াছিল। আকাশের তারা অতন্দ্র হইয়া চাহিয়াছিল, আর নিভৃত জ্যোৎস্না ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছিল।

পাশের ঘর

"মা, মালীকে তুমি ব'কবে না বলে পণ করেছ না কি? আজ দু-দিন থেকে আমার ফুলদানিতে বাসি ফুল রয়েছে। একবার চেয়ে দেখে না, এত যে গোলাপ ফুটেছে একটা তোড়াও কোনদিন বেঁধে দেয় না। সপ্তদশবর্ষীয়া মালতী চঞ্চল চরণে মায়ের নিকটে আসিয়া অভিযোগ করিল। রাগে তাহার সুন্দর মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বেণী দুলিয়া উঠিতেছে, কর্ণাভরণ ঝিকিমিকি করিতেছে, হাতের চুড়িবালার রিনিঝিনি শব্দ উঠিতেছে। মা মেয়ের ক্রোধে উত্তেজিত অপরূপ সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "রাগিস নে মালু, গোয়ালাটা আজ দিনকতক হ'ল ছুটি নিয়েছে। মালীকে দিয়ে আমি গরুর জাব না কাটাচ্ছি, ঘাস-জল দেওয়াচ্ছি। এই ক'দিন সে বেচারা বড় সময় পায় নি যে ফুলের তোড়ার তল্লাস করবে।"

মালতী কহিল, "ওই হ্যাষ্টি গরুর পালের জন্যে তুমি খামকা মালীকে আটকে রাখবে? এদিকে বাবার এত সখের ফুলবাগান, তার দশা যাই হোক না কেন?"

"না রে, ফুলের বাগানের দশা কিছুই হবে না। মালী ছুটি পেলেই জল দেয়, আগাছা পরিষ্কার ক'রে রাখে। কিন্তু হ্যাঁ রে, তাও বলি, তোরা কি একটু বাগানের কাজ করতে পারিস নে? পড়িস নি শকুন্তলার কথা, আগেকার দিনে রাজার মেয়েরাও ঝারি-হাতে ফুলের গাছের গোড়ায় জল দিতেন।"

"বিকেলে যে আমার রাজ্যের কাজ, আমার কলেজের টাস্ক আছে, গা-ধোয়া, চুল-বাঁধা শেষ হ'তে-না-হ'তেই উর্ম্মিলারা দল বেঁধে আসবে

ব্যাডমিণ্টন খেলতে। ভদ্রতা আব চক্ষুলজ্জা বলেও তো একটা জিনিষ রয়েছে। তাদের শুধু শুধু ফিবিয়ে দিই কেমন ক'বে। খেলতে খেলতে কতদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়। আমাব মিউজিকের লেস্‌ন নেবাব সময় হয়ে আসে। কখন সময় পাই ব'লো ?"

মালতীব কথা শেষ হইতে-না-হইতে পাশেব ঘব হইতে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং মিহি গলায় কে ডাকিল, "মালতী। মালতী।"

"ঐ দেখ মিলি আব উর্ম্মিলা এসেছে। চল্‌লুম। তুমি যেন কুমুদাকে দিয়ে পেয়ালা-চাবেক চা আমাব বসবাব ঘবে পাঠিয়ে দিও। যত শীগ্‌গীব হয়।"

মালতী বেণী দুলাইয়া ক্ষিপ্রপদে বাহিব হইয়া গেল।

মিলি, উর্ম্মিলা আব লটি ততক্ষণ উর্ম্মিলার ব্লাউজের অভিনব কাটছাঁট সম্বন্ধে আলোচনা কবিতেছিল। তাহাকে ঢুকিতে দেখিয়া মিলি কহিল, "কি কবছিলে ভাই এতক্ষণ। আমরা সেই কোন্ কাল থেকে এসে ব'সে আছি। যদিও ভদ্রতা নয়, তবুও শেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'বে থেকে থেকে তোমাকে ডাকলুম।"

মালতী অত্যন্ত অপ্রতিভ হইযা কহিল, "সবি, আমাব আজ একটু দেবি হয়ে গেছে।"

লটি হাসিয়া উর্ম্মিলাব গায়ে পডিতে পডিতে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "কাব কথা ভাবছিলে ভাই ? ভাবনায় এত অন্যমনস্ক যে আমাদেব ডাক শুনতে পাও নি।"

"কাব কথা আবাব ভাবব। তোমবা একটা কিছু বানিয়ে না বললে সুখ পাও না।"

"আশা কবি আমাদেব বানিয়ে বলবাব অবসব যেন আব বেশী দিন না থাকে। অচিবে সমস্তই সত্য হয়ে উঠুক।"

"আমরাও তাই আশা কবি।"

মালতী উত্তর দিল না। গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

"ও কি, রাগ করলে না কি ভাই? আমরা কিন্তু মনে করেছিলুম মিঃ দের অধ্যবসায় এবারে সফল হয়ে আসছে। আমাদের বাড়ির পার্টিতে তোমাব মা'ও সেদিন এই ধবণেব কি-একটা চৌধুবী-মাসীকে বলছিলেন। আমি আড়ি পেতে শুনেছি।"

এইবারে মালতী কথা কহিল, "আমার মা যা খুশী তা বলতে পারেন, তাঁর ইচ্ছামত। কিন্তু আমার মনে হয—"

"তোর কি মনে হয় রে?"—উর্ম্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিল।

"আমাব মনে হয় মেযেদের জীবনযাত্রায় পুরুষকে যে একান্ত প্রয়োজন এই মনোভাবটাই ভুল।"

"ওরে বাস্ বে, তুই যে মস্ত কথা বললি! জানি নে বাপু এসব কথার উত্তর। তোর মত আমরা আধ্যাত্মিক চিন্তাও অত করি নে, আর সমাজতত্ত্ব কিংবা মনস্তত্ত্ব নিযেও অত মাথা ঘামাই নে। কিন্তু দেরি কি, এবার চল ব্যাডমিন্টন খেলবি নে?"

মালতী তাহাব বন্ধুদেব সহিত কথা কহিতেছিল এবং ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিল। কুমুদাব এতক্ষণ চা আনিবাব কথা। কিন্তু এখনও আসিল না। আঃ, আজ বিবক্তিতে তাহাব সমস্ত মন ভবিয়া উঠিয়াছে!

"আমি এখনই আসছি ভাই, তোমবা দযা ক'বে একটু অপেক্ষা কব।"

ভিতবে চাযেব তাগাদা দিতে আসিযা দেখিল, বাবা সেই মাত্র কোর্ট হইতে ফিবিযা আসিযা একটা সোফায বসিযা জিবাইয়া লইতেছেন। অদূবে ষ্টোভে চাযেব জল চডানো। মা চাযেব সবঞ্জাম বাহিব কবিয়া ধৌত কবিতেছেন। কিন্তু দূবে বা নিকটে কোথাও দাসী কুমুদাব চিহ্ন অবধি নাই।

মালতী বিরক্তিপূর্ণ স্ববে কহিল, "কুমুদা কোথায় গেল? মা দেখছি প্রশ্রয় দিযে দিয়ে ঝি-চাকরগুলোকে একেবাবে মাটি ক'রে দেবে!"

তাহার মা মিনতি করিয়া কহিলেন, "রাগ করিস নে মা। কুমুদা আজকের মত ছুটি নিয়েছে। কালীঘাটে তার কি মানত আছে শোধ দিতে গেছে। তুই অনেকক্ষণ চা চেয়ে গেছিস, আমি তখন থেকে ছটফট করছি। কিন্তু তোব বাবা এসে পড়লেন। মানুষটা তেতে-পুড়ে এল! জুতো-মোজা খুলে নিলুম, দু-দণ্ড হাওয়া করতে একটু ঠাণ্ডা হলেন। ঐ তো দেখি চায়ের জল ফুটছে, তা তুই এক কাজ কর না মা, ততক্ষণ চা ভিজতে দে। ক' পেয়ালা তৈরি ক'রে নে। তোর বাবাকেও এক পেয়ালা দিস্। আমি ততক্ষণ চট্ ক'রে ওঁর জন্যে ডিমেব কচুরি ক'খানা ভেজে নিই।"

মালতী অনেক চেষ্টায় আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, "মা, তোমাদের ভদ্রতাবোধ কি একেবারে নেই? আমার বন্ধুদের বসিয়ে রেখে এখানে আমি ডিমের কচুরি আব চা করি। আর তারা হাঁ ক'রে কড়িকাঠ গুণতে থাক!"

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির মায়ের সঙ্গে দেখছি বুড়ীর এক দণ্ড বনে না। কেন তুমি ওকে রাগিয়ে দাও গো। যা যা বুড়ি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগাছা কব গে। তোর মাকে দিযে চা তৈরি করিয়ে আমি দু-মিনিটের মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছি, পাহারা রইলুম। একটুও দেরি হ'তে দেব না।"

মালতী রাগ করিয়া কহিল, "তোমার না থাকতে পাবে কিন্তু আমাব ভদ্রতাজ্ঞান যথেষ্ট রয়েছে। দাঁড়াও, আমি ওদের ব'লে আসছি, আর আমার ছবিব-এ্যাল্‌বামটা বার ক'বে দিয়ে আসছি। ততক্ষণ সেইটে দেখতে দেখতে ওদের কাটবে। আমি এসে চা করছি। কিন্তু বাবা দেখো, আমি ব'লে দিলুম, ঝি-চাকবকে মা এত প্রশ্রয় দেয় যে শেষপর্য্যন্ত সবাইকে বিগ্‌ড়িযে না দিয়ে থাকতে পারবে না। কুমুদা গেল কালীঘাটে মানত শোধ করতে, কেন গেল? কেনই বা এসব কুসংস্কারকে আমল দেওয়া!"

মালতীর মা এবারে একটু ক্ষুব্ধ স্বরে কহিলেন, "ছিঃ মা, অমন ক'রে বলতে নেই। কুমুদা দুঃখী মানুষ হ'লেও তারও তো জীবনে এমন অনেক বিশ্বাস থাকতে পারে যা তার কাছে কুসংস্কার নয়, পরম ধর্ম্ম।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।" মালতী চলিয়া গেল।

মালতীর বাবা সহাস্যে কহিলেন, "বুড়ির প্রকৃতিটা একটু অসহিষ্ণু। একটুতেই রেগে ওঠে। কিন্তু রাগলে ওকে চমৎকার দেখায়।"

কচুরি-ভাজা শেষ করিয়া একটা প্লেটে সাজাইতে সাজাইতে মালতীর মা কহিলেন, "মিছে নয়, তুমি হাসি-তামাসা করছ বটে, কিন্তু ভয়ে এক এক সময় আমার হাত-পা ওঠে না।"

"কেন ?"

"তোমার ঐ মেয়েটির কথা ভেবে। কি আদরই দিয়েছ ওকে, আর কেমন ক'রে মানুষ করলে। আমি শুধু ভাবি মাঝে মাঝে তোমার ঐ নাকতোলা মেয়ের বিয়ে হ'লে কেমন করেই বা সে সুখী হবে, আর কেমন করেই বা পাঁচ জনকে সুখী করবে।"

"তোমার এ-ভাবনা মিছে। বুড়ির মনটি আসলে খুব কোমল আর স্নেহশীল। আর দেখ, আমার মনে চিরকালের একটা ক্ষোভ রয়েছে, বুড়ির বিষয়ে আমি আর কারও কথা শুনব না। ওকে আমার মনের মত ক'রে মানুষ করব। বিয়ের কথা পরে ভাবলেও চলবে।"

স্বামীর এ-কথায় গৃহিণীর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল, স্বামী প্রথমে ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতার হাইকোর্টে কিছুদিন ওকালতি করেন। আইন পাস করিবার চার-পাঁচ বছর আগেই তাঁহাদের প্রথমা কন্যা কমলার জন্ম হয়। কয়েক বছর আদালতে বাহির হইয়া কিছুই যখন সুবিধা হইল না তখন জ্যোতিষচন্দ্র সঙ্কল্প করিলেন বিলাতে গিয়া ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া আসিবেন। স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে অনেক পরামর্শ অনেক কথা হইতে লাগিল কিন্তু

আসলে তখনও তাঁহার বাবা জীবিত, তাঁহাব মত কোনমতেই পাওযা গেল না। তিনি আচাবনিষ্ঠ সেকেলে ভাবাপন্ন ছিলেন। অত্যন্ত কড়া, বাশভারি লোক। কিন্তু জ্যোতিষ বাবার কাছে উৎসাহ না পাইয়া স্ত্রীব অলঙ্কাব কিছু কিছু বিক্রয কবিযা কযেকজন অন্তবঙ্গ বন্ধুব সাহায্যে এক বকম জোর কবিযাই ব্যারিষ্টাবী পডিতে গেলেন। সেই হইতে পিতাপুত্রে ছাডাছাডি। জ্যোতিষ ফিবিযা আসিবার আগেই তাঁহাব বাবা মাবা গিযাছিলেন। কিন্তু মাবা যাইবাব আগে তিনি জ্যোতিষেব বডমেযে কমলাব অত্যন্ত অল্প বযসে বড় কুলীনেব ঘবে বিবাহ দিযা দিলেন। প্রবাসী জ্যোতিষকে এ-সম্বন্ধে কোন কথা জানাইলেন না। তাঁহাব মতামত নিলেন না। হযত এ তাঁব পুত্রেব উপব এক প্রকাব প্রতিশোধ লইবাব প্রবৃত্তিসঞ্জাত কাজই হইযাছিল। অবশ্য নাৎনীব বিবাহে তিনি ধুমধাম খবচপত্র কবিযাছিলেন যথেষ্ট। কুলীন এবং সম্পন্ন বনিযাদি বংশেব ঘবে তাহাকে দিযাছিলেন। কিন্তু যাহা আশা কবিযাছিলেন তাহা হইল না। ক্রমশঃ দেখা গেল সে-পবিবাবে বাহিবেব ঠাট-ঠমকেব চেযে ঋণেব বোঝা বেশী। যে ছেলেটিব সহিত কমলাব বিবাহ হয, সে বিযেব সময আই-এ পডিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই পাস কবিযা উঠিতে পাবিল না। কযেকবাব ফেল কবিয বাড়িতে আসিযা বসিল।

জ্যোতিষ ফিবিযা আসিযা সমস্ত শুনিলেন এবং বক্তবর্ণ মুখে দৃঢবদ্ধ ওষ্ঠাধবে কহিলেন, "এত সামান্য কাবণে যে বাবা আমাব উপব এমন ক'বে প্রতিশোধ নেবেন, তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। যদি জানতুম, তাহ'লে কখন যেতাম না।"

সেই হইতে কমলাব জীবন আব কমলাব অদৃষ্ট পিতামাতাব মনেব উপব ভাবেব মত চাপিয়া বহিযাছে। প্রতিকারহীন বেদনায তাঁহাদেব দিন বাত্রি নিঃশব্দে বিবর্ণ হইযা উঠিতেছে। প্রতিকাব কবিবাব তেমন কিছু ছিল না। কমলাব শ্বশুব বিলাত-ফেবৎ বৈবাহিকেব বাডিতে বধূ-

মাতাকে কখনও পাঠাইতেন না। ম্যালেরিয়ার সময়টাও নয়। ম্যালেরিয়ার সময়ে তাহার এক পাল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া কমলা জ্বরে জ্বরে কঙ্কালসার হইয়া উঠিত, এমনি করিয়া ভুগিতে ভুগিতে তাহার দুই-তিনটি ছোট ছেলেমেয়ে অত্যন্ত অকালে সংসার ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তথাপি সে একটি দিনের জন্যও পিতামাতার সস্নেহ আকুল আহ্বানে বাপের বাড়ি যাইতে বা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পায় নাই। বছর দুই হইল তাহার শ্বশুর মারা গিয়াছেন। অতটা কড়াকড়ি শাসন আর নাই।

বড় মেয়ে অমন করিয়া দূরে চলিয়া গেল, চিরজীবনের জন্য অশেষ দুঃখ-দুর্ভাগ্যের মাঝে নিমজ্জিত হইয়া রহিল, এই কথা যত মনে পড়িয়া যায়, ছোট মেয়েটিকে তাহার বাবা ততই আকুল আগ্রহে বুকের মাঝে টানিয়া নেন। মালতীর তাই বাবার কাছে আদরের সীমা নাই। মা'ও আদর করেন। কিন্তু তাঁহার মনের মাঝে ভবিষ্যৎদর্শী শঙ্কাকুল মাতৃহৃদয় আছে। তিনি মনে জানেন, মা বাবার কাছে বাপের বাড়িতে যতই আদর-যত্ন হোক, মেয়েমানুষের ভাগ্যবিধাতা তাহার ভাগ্যে ঠিক কি যে লিখিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে। আর কমলার জন্য তার মায়েরও মনে দুঃখ হয়। কিন্তু সে দুঃখের সঙ্গে দৈবের উপর বিশ্বাস বলিয়া একটা বস্তু জড়িত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে তত তীব্রতর করে না। তিনি এক-এক সময়ে ভাবেন, "কমলার অদৃষ্টই অমনি। কে জানে আমাদের হাত থাকলেও হয়ত জীবনে ওর অমনি কষ্টই হ'ত। অদৃষ্ট ছাড়া গতি নেই মেয়েমানুষের।'

জ্যোতিষ অমন করিয়া ভাবিতে পারেন না। তাঁহার বলিষ্ঠ পুরুষ-হৃদয় এই অন্যায়, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা তাঁহার নিদ্রাহীন রাত্রিকে তপ্ত, ব্যাকুল করিয়া তোলে। আর সেই অতৃপ্ত রোষ এবং ক্ষোভ হইতে যত মেঘ জমা হয় সে সকলই স্নেহধারা রূপে ছোট মেয়েটিকে অভিষিক্ত

করিতে থাকে। হাজার বার তিনি আপন মনে বলেন, "একে আমি সুখী করব। আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে একে সুখী, আনন্দময়ী ক'রে তুলব।"

*   *   *

পরের দিন—

মালতীর কলেজের 'বাস' বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। সে প্রস্তুত হইয়া খাতা এবং বই হাতে লইয়া ড্রেসিং-টেবিলেব কাছে দাঁড়াইয়া কেবল চুলে একটা সোনাব ক্লীপ্ আট্‌কাইয়া লইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঝরণা-ধাবার মত তাহার গুন্‌গুন্ গানের সুর উৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল—

চাঁদিনী রাতে বল কে গো আসিলে……

পবক্ষণেই তাহার তীক্ষ্ণ তিরস্কারের স্বর শোনা গেল, "মা, মালী কি আজও বাগানের কাজ করে নি? আজ মণিকাদির জন্যে আমার দুটো ফুলের তোড়া নিয়ে যাবার কথা ছিল। তাকে আমি সকালেই সে-কথা বলেছি।··নাঃ, তোমাদের ঘর-বাড়ির অবস্থা এত বিশৃঙ্খল···আর দেবি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কি অপ্রস্তুতেই না আমাকে আজ পড়তে হবে।"

মালী একপ্রকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে প্রকাণ্ড দুইটা ফুলের তোড়া আনিয়া বাসে চড়াইয়া দিল। এতক্ষণ সে প্রাণপণে তাড়াতাড়ি কবিতে-ছিল, কিন্তু তবুও কপালগুণে খানিকটা দেরি হইয়া গেছে। দিদিমণিব কাছে বকুনি খাওয়া তাহার কপালে অনিবার্য্য।

মালতীর বাবা খাইতে বসিযাছেন, মা সামনে বসিয়া হাতপাখায় করিয়া মাছি তাড়াইতেছেন। পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—চিঠ্‌টি!

বেয়ারা চিঠি লইয়া আসিল। জ্যোতিব হাত মুখ ধুইয়া রুমালে মুছিতে মুছিতে খামখানা খুলিলেন, পত্রখানিতে অনেক বর্ণাশুদ্ধি ছিল। সে সমস্ত সংশোধন করিয়া এইরূপ পড়িলেন:—

শ্রীহরি সহায়

১২ই আশ্বিন
সাং রসা। পলাশডাঙ্গা

অসংখ্য প্রণামান্তর নিবেদন,

মা, আজ দুই বৎসর হইতে আমার বড় ছেলেটিকে লইয়া ভুগিতেছি। তাহার পেটে লিভার ও পীলে দুই প্রকাণ্ড হইয়াছে এখানে মহকুমা হইতে ডাক্তার আনিয়া অনেকবার দেখাইয়াছি। কোন ফল পাই নাই। তোমার জামাইও বহুদিন হইতে ভুগিতেছেন। আমার মনে বড় সাধ ছিল, কলিকাতায় তোমাদের ওখানে লইয়া গিয়া একবার বড় ডাক্তার দেখাই এবং হাওয়া পরিবর্ত্তন করি। কিন্তু জানই তো আমার শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতে একটা দিনের জন্যও ওখানে যাইবার উপায় ছিল না। তাঁর অবর্ত্তমানে যাইবার উপায় হইয়াছে। ওঁর মত করাইয়াছি। এখন তোমরা একটি ভাল দিন দেখাইয়া লোক পাঠাইলেই আমার যাওয়া হয়। সে বাটীর কুশল সংবাদ অনেক দিন পাই নাই। তুমি ও পিতাঠাকুর মহাশয় আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

সেবিকা কন্যা কমলা।

চিঠিপড়া শেষ হইয়া গেল। জ্যোতিষ কহিলেন, "আজই কমলাকে আনবার ব্যবস্থা করি।···কিন্তু কে যাবে? আচ্ছা এক কাজ করি, মনি-অর্ডার ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিই, আর জামাইকে লিখে দিই সঙ্গে ক'রে আসুক। এই আশ্বিন মাসে, ওখানে ভর্ত্তি ম্যালেরিয়ার সময়। কাল-বিলম্ব না ক'রে যেন ও চলে আসে"

ইহারই দিন তিন-চা পরে একখানা সেকেণ্ড ক্লাস ভাড়াগাড়ীর মাথায় গুটি-তিন-চার ষ্টিল ট্রাঙ্কের বাক্স, ছোটবড় গুটিকতক পুঁটুলি-পোঁটলা, এক নাগরি খেজুরগুড়, একটা বড় চাঙাড়িতে বড় বড় কদমা

বাতাসা এবং আবও বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমেত কমলা তাহাব পিতৃগৃহে পৌঁছাইল। এ-বাড়িতে তাহাকে যেন বেমানান দেখায়। সে নিজেও বিস্মিত হইয়া চাবিদিকে চাহিতে লাগিল। দীর্ঘ বাবো বৎসব সে পিতৃগৃহে আসে নাই। বাশভাবি শ্বশুবের বর্ত্তমানে পিতৃগৃহে যাইবাব কল্পনামাত্র তাহাব কাছে সুদূব স্বপ্নেব মত ছিল। মালতী দোতালার বাবান্দায় দাঁড়াইযা দেখিতেছিল, তাডাতাড়ি নামিযা আসিল। এই তাহাব দিদি! অসাধাবণ সুন্দবী। কিন্তু গৌববর্ণ অত্যন্ত পাণ্ডুব। কৃশ দেহবেখা। অবগুণ্ঠনেব অন্তবালে মুখখানিতে একটি সলজ্জ দীনতাব ভাব। পাযে আলতা। লালপাড়েব একটি শাদা ফবাসডাঙ্গা শাড়ি সাদাসিধা ধবণে পবা। এই বযসেব এমনি অনেক সুন্দবী মেযেকে মালতী দেখিযাছে। জর্জ্জেট্ ক্রেপ সিল্ক পবা, উজ্জ্বলতায, অজস্র হাসি-আমোদেব বন্যায ভাসমান কিন্তু সে সকলেব চেযে অন্য বকম এই ম্লান দীননযনা তাহাব প্রায অপবিচিতা দিদিব পানে একবাব চাহিবামাত্র তাহাব মনেব ভিতব কি বকম কবিযা উঠিল।

সে নামিযা আসিযা দিদিকে প্রণাম কবিযা উঠিযা কমলাব একটা হাত ধবিযা ফেলিযা কহিল, "দিদি এস।'

মালতীব পাশেব ঘবে তাহাব দিদিব থাকিবাব স্থান হইযাছে। বহুদিন পবে কমলা আপন পিতৃভবনে আসিযাছে। তাহাকে তাহাব মা-বাবা কত দিন নিজেব কাছে পান নাই। তাহাব বাবা তাহাব প্রতি পিতৃকর্ত্তব্য পালন কবিতে পান নাই, তিনি যখন সুদূব বিদেশে ছিলেন তখন তাঁহাব অজ্ঞাতসাবে তাঁহাব প্রাণাধিকা কন্যাব কোন অপাত্রে বিবাহ হইযা গিযাছিল। তাহাব মা আপনাব স্নেহবুভুক্ষিত অন্তবে কত দিন মেযেকে টানিযা লইতে পান নাই। তাই এত দিন পবে সে আসাতে সকলেই ব্যস্ত, সকলেই তাহাব সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে উৎসুক। তেতালায মস্ত খোলা ছাদ। স্নানেব ঘর, পাশাপাশি দুইখানি শযনকক্ষ এবং ঢাকা বাবান্দা,

তেতালার এই দুইখানি পাশাপাশি ঘরে কমলা ও মালতী থাকে। বারান্দার একাংশে ফুলের টব সাজান। সেইখানে বসিয়া মালতী কোন-কোন দিন জ্যোৎস্না-উদাস সন্ধ্যায় কোন নির্জ্জন অপরাহ্ণে এস্রাজ বাজায়। রবীন্দ্রনাথের পুনশ্চ, বনবাণী, মহুয়া পড়ে। বারান্দার অপরার্দ্ধ কিন্তু সবুজ স্ক্রীন দিয়া আড়াল করা। সেখানে কমলার গৃহস্থালী। রাত্রিবেলায় বুঁচিকে উঠাইয়া দিতে হয়, নয়ত প্রায়ই সে বিছানা নোঙ্‌রা করিয়া ফেলে। স্বামী বিজয়নাথের আজ মাস ছয় হইতে শক্ত ম্যালেরিয়া হইয়াছে, কুইনাইন পেটে পড়িবামাত্র বমি আরম্ভ হয়। স্ক্রীন-দেওয়া এই ঢাকা-বারান্দায় জলের বালতি, ঘটি গামছা তোয়ালে বেড্‌প্যান সমস্ত সরঞ্জামই রাখিতে হয়।

* * *

রাত্রি প্রায় দশটা বাজে। মালতী আপন মনে রবীন্দ্রনাথের উৎসর্গ হইতে পড়িতেছিল।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে।
হে মোর স্বপনবিহারী
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।...

শরতের সুনীল আকাশে বহু দূর দিগন্ত অবধি মেঘের লেশ নাই, জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভাসিতেছে। নির্জ্জন কক্ষের বাতায়নে বসিয়া তরুণী আপন মনের ঘনায়মান স্বপ্নের অঞ্জন মাখাইয়া পড়িতেছিল, "মোর কিছু ধন আছে সংসারে, বাকী সব ধন স্বপনে, নিভৃত স্বপনে।"

তখন পাশের ঘরের একাংশে সংসারের সুখ-দুঃখ লইয়া যে আলোচনা হইতেছিল সেখানে স্বপ্নের ঘোর মাত্র ছিল না। কমলার স্বামী বিজয়নাথ

বলিতেছিল, "কালকে মাসের পয়লা, অগস্ত্যযাত্রা যেতে নেই। তার পরের দুটো দিন অশ্লেষা, মঘা, তাও বাদ গেল। তার পরে ৪ঠা কার্ত্তিক আমাকে যেতেই হবে।" কমলা নতমুখে কহিল, "কার্ত্তিক মাসে ওখানে ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়ায় পড়ে আছে সবাই। এ-সময়ে ওখানে নাই বা গেলে। তা ছাড়া মা বাবা যখন এত ক'রে বারণ করছেন।"

"তোমার মা বাবার কি বলো, সংসারে কোন অভাব নাই, অনটন নাই। পাথার হাওয়ার তলায় দিব্যি আছেন। এদিকে আমাদের যে এখনও লাটের কিস্তি যায় নি। জমিজমা যা ক্ষুদকুঁড়ো আছে, তাও কি শেষে নীলেম হয়ে যাবে। এখানে বসে থাকলেই পেট ভরবে ?

কমলা কোন উত্তর করিতে পারিল না। এমন সময়ে তাহার ছোট ছেলে কানাই জাগিয়া উঠিল, "মা খিদে—" তাহার আজ সাত আট দিন হইতে খুব জ্বর হইয়াছে। উপবাসে আছে। পথ্যের মধ্যে জলবার্লি আর খইয়ের মণ্ড খাইযাছে।

"মা আমি খাব।"

"তুই কি স্বপ্ন দেখছিস কানাই ? এই মাঝরাত্রিতে খাবি কি রে, ঘুমো ঘুমো। ঐ শোন এখনই চৌকিদার হাঁক দিচ্ছে। তোর কি ভয়ডর নেই রে প্রাণে। নে নে, ঘুমো।"

কানাই ততক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছে। মিটিমিটি করিয়া বৈদ্যুতিক আলোটার পানে চাহিয়া বলিতেছে, "এখানে চৌকিদারের হাঁক কোথা পাবে। সে তো সেই পলাশডাঙায় হাঁকতো। দাও, দাও, আমাকে খাবার দাও, সেই তখন পটলা সুজির রুটি খেলে, আমাকে কিছু দাও নি।"

কমলার রাত্রি-জাগরণ-ক্লান্ত মৃদু সকরুণ স্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মী বাবা আমার। সোনা মাণিক আমার।...ঈস্, গা জ্বরে যেন আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে। আবোলতাবোল ব'কো না বাবা। চুপ

ক'রে ঘুমাও।" কিন্তু অবোধ বালকের প্রলাপ তাহাতে লেশমাত্র কমে না।

কমলার স্বামী বিজয়নাথ রাগিয়া গিয়া কহিল, "এই হতভাগা ছেলেগুলোর জ্বালায় রাত্রিবেলায় পর্য্যন্ত একটু ঘুমবার জো নেই। মরণ হ'লে বাঁচি ওদের।"

"বালাই, ষাট! অমন ক'রে বলতে নেই।" কমলা সভয়ে মনে মনে সহস্রবার ঠাকুর-দেবতার নাম লইয়া রুগ্ন বালকের শিয়রে হাত রাখিল।

পাশের ঘরে মালতীর কবিতা-পড়া কখন থামিয়া গিয়াছে। কাল রবিবার, কলেজ যাইবার কিংবা পড়াশোনার তাড়া নাই। তাই সে ভাবিতেছিল, এস্রাজটা পাড়িয়া বসিবে কি না, কিন্তু পাশের ঘরের বিচিত্র কলরব তাহাকে আকৃষ্ট করিল। কমলা তখন অশান্ত জ্বরপীড়িত ছেলেকে শান্ত করিতেছে, "ছি বাবা কাঁদে না। বাবা যদি একটু বকে তা'হলে কি কাঁদতে হয় ধন। আসলে উনি তোমাকে কত ভালবাসেন।"

মালতীর মনের উপর দিয়া তাহার দিদির ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। দিদি মাসের মধ্যে ঊনত্রিশ দিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পায় না। সকাল হইতে উঠিয়া স্বামীর আর ছেলেদের পরিচর্য্যা, ছেলেদের নিত্য রোগ। স্বামী অর্দ্ধশিক্ষিত সঙ্কীর্ণমনা। কিন্তু তবুও তার মুখে কি পরিতৃপ্তির আভাস! সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত দিদি নিজের কথা বোধ হয় এক মিনিটের জন্যও ভাবে না। পাশের ঘরের কথোপকথন শুনিতে তার ভাল লাগে। মনে হয় তাহার সম্পূর্ণ অজানা এক জগতের যবনিকা যেন আস্তে আস্তে উঠিতেছে।

কমলার স্বামী বিজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "ওকি আবার যাচ্ছ কোথায়? এই তো দু-ঘন্টা ধস্তাধস্তির পরে ছেলেটা ঘুমল, এইবার নিজে একটু ঘুমিয়ে নাও। কতক্ষণই বা ঘুমতে পাবে, এখনই আবার একটা-না-একটা কেউ উঠে পড়বে।"

" এখনই আসছি। যাই দেখে আসি একটি বার গিয়ে কুমুদা কেমন আছে। তারও আবার তিন দিন থেকে জ্বর হয়েছিল কি না। আজই সবে ছেড়েছে। একটু সাবু আর খান দুই পটলভাজা ক'রে দিয়ে এসেছিলুম, দেখে আসি খেতে পেরেছে কি না।"

মালতীর মনে পড়িয়া গেল, বাড়ির দাসী এই কুমুদার যে আবার একটা অস্তিত্ব আছে এমন কথা সে কোনদিন মনেও করে নাই। এই কুমুদা একদিন মানত রাখিতে গিয়া সারাদিন উপবাস করিয়া কালীঘাট গিয়াছিল ছুটি লইয়া, সেজন্য মায়ের সঙ্গে সে কত কলহ করিয়াছিল। ঝি-চাকরের দুর্নীতি এবং কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেছেন বলিয়া মাকে শুনাইয়াছিল সে লম্বা বক্তৃতা। মালতীর এস্রাজ বাজান আর হইল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া আকাশের দূর তারার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল, তার দিদি কমলা জীবনে কি পাইয়াছে যে এমন সহজে এত দুঃখ, এত অশান্তি এত খাটুনি স্বচ্ছন্দ চিত্তে বহন করিয়া চলিতেছে। কোন অসন্তোষ নাই, মনে কোন ভার নাই। নিজের কথা সে অহরহ ভাবে না, বরঞ্চ নিজের কথাটাকে অনেকের কথায় অনেকের কল্যাণে একেবারে চাপা দিতে পারিলেই যেন বাঁচে। তার দিদির জীবন হইতে প্রতিফলিত হইয়া একটা নূতন আলো যেন তার মনের উপর আসিয়া পড়িল। আসিয়া পড়িয়া অনেক গর্ব্ব অনেক ধারণাকে যেন আস্তে আস্তে গলাইয়া দিয়া ভাঙিয়া গড়িতে লাগিল।

পাশের ঘরে মৃদু গুঞ্জনে তখনও কথাবার্ত্তা চলিতেছে। বিজয়নাথ আস্ফালন করিতেছে, "সৌরিশ সরকারকে আমি দেখাব মজা, বুঝলে কমলা। আমাদের বারিত্ পুকুরের সীমানা দিয়ে হেঁটে গেলে আমি তার পা ভাঙবো। পুকুরে সরা তো দূরের কথা। মনে নেই তোমার সাজার উঠোনের এক কাঠা জমি নিয়ে আমাকে কত কথাই না শুনিয়েছিল। বাছাধন টেরটি পাবেন এইবারে। দাঁড়াও বাইরে থেকে

আসি মুখ হাত ধুয়ে একবার। এসে অমনি শুয়ে পড়ব।"—বিজয়নাথ দরজাটা খুলিল। পাশের ঘর—মালতীর কক্ষ হইতে তখন এস্রাজের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী এইবারে এস্রাজটা টানিয়া লইয়াছে। বিজয়নাথ মুখ হাত ধুইতে গিয়া থমকিয়া খানিকক্ষণ শুনিল। রুগ্ন সুপ্ত পুত্রের পাশে বসিয়া মুক্ত দ্বারপথে কমলা অনেকক্ষণ সেই সুর শুনিল। ক্ষণকালের জন্য তাহাদের মন হইতে বারিত্ পুকুরের সীমানা, সৌরিশ সরকারের স্পর্দ্ধা, এক কাঠা জমি লইয়া মামলা করিবার প্রয়াস সমস্তই মুছিয়া গেল।

ননীদি

১

সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। ভাঙ্গা একতলা দালানটার ছাদ দিয়া চারিধারেই জল পড়ে; শয়ন-কক্ষটিতেই শুধু জল পড়ে না। দু'খানি ঘর ও একটি বারান্দা লইয়া গৃহস্থালী। সাম্‌নের ঘরখানি বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হয়। সেখানে গৃহস্বামীর দুই-চারি জন বন্ধুবান্ধব আসিয়া বসে। সে ঘরটিও বাদ নাই; জীর্ণ গৃহ, ছাদের ফাটল দিয়া বামদিকের কোণে টুপ্‌ টুপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে। বৈঠকখানার পাশের অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটি শয়নকক্ষ। সাম্‌নে একটা টানা লম্বা বারান্দা। এই বারান্দাখানিই মীরার গৃহ-সংসার। ইহার একপাশে দরমা দিয়া ঘিরিয়া-লইয়া তাহার রান্নাঘর। অপর প্রান্তে ছোট একটু অংশে কাঠের 'পার্টিশন্' দিয়া সেইটুকু স্নানের জায়গা করিয়াছে। মাঝখানে ছোট একখান তক্তাপোষ পাতা আছে। সেই তক্তাপোষে সারাদিন বসা, ছেলেদের পড়া-শোনা ইত্যাদি চলে। তাহার হাত চার-পাঁচ দূরে গোটা-দুই প্যাকিং বাক্স উল্টাইয়া পাতিয়া টেবিলের মত করিয়া তাহার উপর চায়ের সাজসরঞ্জামগুলি সাজাইয়া রাখা আছে। দেয়ালের গায়ে ছোট একটি কাঠের আলমারী টাঙ্গান; তাহাতে ঘর-গৃহস্থালীর ছোটখাট খুচরা জিনিষপত্রগুলি, দাঁতমাজন, মাখনের কৌটা, চায়ের, চিনির পাত্র ইত্যাদি সাজান। মীরা লেখাপড়া শিখিয়াছে, যখন তাহার বিবাহ হয়, তখন সে কলেজে থার্ড-ইয়ারে পড়িত। মেয়েটির শিক্ষার সঙ্গে সৌন্দর্য্য এবং রুচিজ্ঞানও যথেষ্ট আছে। এই অভাবের সংসার। অতি ক্ষুদ্র পরিধির মাঝে জীর্ণ ছোট বাড়ী। তবু মীরার

তর যে সৌন্দর্য্য-কুশলা স্থনিপুণা চিরন্তনী নারী আছে, তাহার হাতের চিহ্ন ছোট ভাঙ্গা বাড়ীখানির চারিদিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বারান্দায় যে খাটখানি পাতা আছে, তাহাতে গালিচা না হোক ছেঁড়া শাড়ীর চওড়া পাড় জুড়িয়া-জুড়িয়া নকল গালিচার মত সেলাইকরা একখানি আস্তরণ পাতা। কাঠের প্যাকিং বাক্স ঢাকিয়া তাহার নিজের হাতের সেলাইকরা একটি আচ্ছাদন। দরমা দিয়া ঘেরা যে জায়গাটুকু তাহার রাঁধিবার স্থান, সেখানেও প্রত্যেকটি জিনিষ স্থবিন্যস্তরূপে স্থরক্ষিত। একটি জলচৌকির উপর মাজা বাসনগুলি সাজানো। কাচের খালি হর্লিক্সের শিশিতে খালি মাখনের কৌটায় নানা রকম আচার ও মশলা সঞ্চিত আছে।

তখন প্রায় পাঁচটা বাজে, বর্ষায় কলিকাতায় গলির ভিতর এই জীর্ণ বাড়ীতে ম্লান, কর্দ্দমাক্ত সন্ধ্যার আলো ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। আফিস হইতে স্বামীর ফিরিবার সময় হইয়া আসিয়াছে, মীরা তাড়াতাড়ি উনুনে কয়লা দিয়া, চুলগুলি বাঁধিয়া লইতেছিল। কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে, তবু এই সময়টা মীরার সারাদিনের মধ্যে একটু ভালো লাগে। চুল বাঁধিয়া গা ধুইয়া, সারাদিনের পর ইহারই মধ্যে একটু ফর্সা একখানি কাপড় পরিয়া কপালে একটি সিন্দুরের ফোঁটা দেয়। এক গ্লাস জল খাইয়া একটি পান ভালো করিয়া সাজিয়া মুখে দেয়। গলির ভিতরকার এই জীর্ণ বাড়ী, এই অন্ধকারে ভাঙ্গা বারান্দাটার মধ্য হইতেও যেন তখন সৌন্দর্য্যের স্থর আসিয়া বাজে। উনুন ধরিতে তখনও দেরী আছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল হইতে আসিয়া জলখাবার খাইয়া সাম্‌নের পার্কে খেলিতে গিয়াছে। বারান্দায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। আফিস-ফেরত রমেশ বাড়ী ঢুকিল। সারাদিনের খাটুনির পর তাহার সমস্ত মুখে-চোখে দুর্ব্বহ ক্লান্তি যেন ছায়া ফেলিয়াছে। মীরা তাড়াতাড়ি তাহার হাত হইতে ছাতাটা লইয়া ঘরের কোণে রাখিল,

টুইলের সার্টটা খুলিয়া লইয়া আলনায় টাঙ্গাইয়া দিয়া একটা হাতপাখা লইয়া বাতাস করিতে সুরু করিল।

আজ ফিরতে দেরী হ'ল কেন গো !

সমস্ত মাসের হিসেব-নিকেশগুলো সারবার ভার আমারই উপর পড়েছিল। তাই শেষ করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। রমেশ জীর্ণ ইজি-চেয়ারটার উপর শুইয়া পড়িয়া কথাগুলি বলিল।

এই অসময়ে শুলে কেন ? চল, বারান্দায় বসবে। আমি ষ্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল বসিয়ে দিই। খাবার সাজিয়ে রেখেছি।—মীরা ত্বরিত পদে আসিয়া ষ্টোভ ধরাইতে বসিল।

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া সুদীর্ঘ আরামের একটা নিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ বলিল, সামান্য এই ক'টা টাকার জন্যে কতই অসম্ভব খাটুনি ! মাঝে মাঝে আর ভালো লাগে না।

বঁটি পাতিয়া তরকারির ঝুড়িটা সামনে রাখিয়া আনাজ কুটিতে কুটিতে মীরা বলিল, কি আর করবে বল ? আমাদের দেশে চাকরীর এমনই অবস্থা। এইটুকুর জন্যেই কত হাঁটাহাঁটি, কত চেষ্টা ! না পেলে কত নিরাশা, কত মনঃক্ষোভ ! আর পেলে কতই আনন্দ। মনে নেই, প্রথম যখন তোমার চাকরি হওয়ার খবর পেলাম, আমি তখন পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে বসে কাকীমার তেঁতুল ছাড়াচ্ছিলাম। কাকীমা একটা হল্‌দে খাম গায়ের উপর ফেলে দিয়ে বল্লেন, এই দেখ, জামাইয়ের চাকরি হয়েচে, তাই ক'লকাতা থেকে তারে খবর এসেচে। আনন্দে আমার এমন হ'লো যে, বঁটিতে আঙ্গুলটাই কেটে গেল ! তার পরে ঠাকরুণদের মন্দিরে পাঁচ টাকা আর রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পাঁচ টাকা ভোগের জন্যে দিইনি বুঝি ? তাই তো পঞ্চান্ন টাকায় ঢুকেছিলে, এই পাঁচ বছরে মাইনে বেড়ে ষাট টাকা হয়েচে।

পত্নীর রহস্যমধুর কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে রমেশের ক্লান্তি এবং ক্ষোভ দূর

হইয়া গেল, সেও হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, তা দিয়েছিলে, আমার বেশ মনে পড়ে। নতুন চুড়ি গড়াবার জন্যে যে বানীর টাকাটা জমিয়েছিলে অনেক কষ্টে, সেটা ঠাকুরদের ভোগ-পূজা বাবদে খরচ করেছিলে, সেটা আমার এখনও মনে পড়ে। কিন্তু তোমার কাকাবাবুর পাগলামিটা বুঝতে পারি না, এমন শিক্ষিতা লক্ষ্মী-প্রতিমার মত মেয়ে কি বলে এমন দরিদ্রের হাতে সমর্পণ করলেন? একেই বলে অদৃষ্ট!

মীরা বঁটি রাখিযা কহিল, ফের একশো বার ঐ কথা! কেন কাকাবাবু মন্দ কি দিয়েছিলেন শুনি? আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলেই বা এর চেয়ে ভালো আর কি দিতে পারতেন? তুমি এম-এ পাশ করেছ, চেহারা সুন্দব, স্বাস্থ্য ভালো, কলকাতায় যাহোক ছোট এই একটা বাড়ী রয়েচে। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, সহরে মামাবাড়ী, মামাবাড়ীতে তাঁদের চেষ্টায় না হয় একটু লেখাপড়াই শিখেচি। ম্যাট্রিকে স্কলাবশিপ পেলাম আর কলেজের মাইনেটাও ফ্রী হবার ব্যবস্থা হলো; তাই মাকে বলে-কয়ে বড়মামা যত দিন না বিয়ে হয় লেখাপড়া করাবার প্রস্তাবে রাজী করিয়ে নিলেন। এই তো ব্যাপার! অথচ তুমি এমন করে কথা বল যেন আমার দু'টো পাখা গজিয়েচে! নাও, ও-সব বাজে কথা রাখ তো, এইবার বল, রাত্রিতে কি খাবে? রান্না-বান্নাগুলো চট্ করে সেরে নিই। আমাকে আবার আটটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত জজ প্রমদাবাবুর মেয়ে ডলিকে পড়াতে যেতে হবে। আর তাও বলি, তোমার এত হতাশ হয়ে পড়লে চলবে কেন? আমাদের অবস্থা এমন কি খারাপ? তুমি আফিসে মাইনে পাচ্ছ, সকালে একটা টিউশনি কর, ডলিদের বাড়ী থেকে আমিও গোটা কুড়িক টাকা পাচ্ছি। তা ছাড়া, সুরেশ ঠাকুরপোর কারবারে আচার, জেলি, মোরব্বা, ছেলেদের জামা-সুট, ব্লাউজ, এমব্রয়ডারি এই সব পাঠিয়ে যে লাভ থাকে, তাও নিতান্ত মন্দ নয়।

রমেশ একটুখানি ক্ষোভ-মিশ্রিত হাস্য করিয়া কহিল, হ্যাঁ, সবই ভাল, কেবল চোখের উপরে তোমার উদয়াস্ত এই অবিশ্রান্ত খাটুনিটা দেখতে ভাল লাগে না। একটা ঠিকা ঝি মাত্র সকালে-বিকালে গোটা-কতক বাসন মাজে আর বাজার করে দিয়ে যায়; তার পর থেকে আমাদের চার বার করে চা জলখাবার রান্না সমস্তই একা হাতে তোমাকে করতে হয়। তাও আবার শুধু গৃহস্থালীর খাটুনি খেটে নিস্তার নেই, বাইরে উপার্জ্জনের জন্যে সন্ধ্যেটায় পড়াতে হয়। দুপুরে যেটুকু সময় বিশ্রাম নিতে পারতে, সে সময়টা কলের সেলাই, জ্যাম্, জেলি এই সব করে টাকার জন্যে চালান দিতে কেটে যায়। কেনই বা এ-সব করতে যাও? এত করেও তো ভাঙ্গা ঘরের চারিদিকে জল পড়চে!

মীরা তরকারি-কোটা শেষ করিয়া বঁটি, ঝুড়ি ইত্যাদি নিপুণহস্তে যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, আমি মিস্ত্রাকে খবর পাঠিয়েচি, কালই ঘর মেরামতের কাজে লাগবে। কমলার টাইফয়েডে ওষুধের দোকানে যে দেনাটা জমেছিল, সেটা শোধ করতে না হ'লে কোন্ দিন বর্ষার আগে আমি ছাদটা মেরামত করিয়ে নিতে পারতুম।

মীরার ছেলেমেয়ে কমলা ও নরেশ পার্ক হইতে বেড়াইয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ঘরে ঢুকিতেছিল এতক্ষণে। ডালটা নামাইয়া তরকারি চড়াইয়া দিতে দিতে মীরা বলিল, সদরের ঘরে তুমি ততক্ষণ ছেলেদের নিয়ে পড়াতে বসাওগে। আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রান্নাটা সেরে নিই।

রমেশ উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে ঠিক পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী ললিতবাবুর বাড়ী হইতে একটা গোলমাল চীৎকারের শব্দ আসিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, ব্যাপারটা কি?

মীরা সংক্ষেপে কহিল, ওদের নিত্যনিয়মিতকার ঝগড়া। আজ দেখ্‌চি মাত্রা ছাড়িয়েচে! ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান কম। আর ননীদির

মুখখানাও একেবারেই মিষ্টি নয। এ ছাড়া আব বিশেষ কিছু ব্যাপার নয। এমন প্রায বোজই হয।

বমেশ উঠিতে উঠিতে কহিল, বাঙ্গালী ঘবেব ট্র্যাজিডি! আফিসে কলমপেষা এবং অন্তঃপুবে বীবদর্প। বাঙ্গালী মেযেদেবও বান্নাঘব এবং আতুব-ঘবেব উদ্‌বৃত্ত সময যেটুকু থাকে, সেটুকু বসনাব সঞ্চালনেই খবচ হয। আমাব বেলায শুধু বিধাতা অন্য বকম লিখেছেন। কে জানে, হয তো পূর্ব্বজন্মেব পুণ্যেব ফল!

বমেশেব কণ্ঠস্বব ছাপাইযা তখন পাশেব বাড়ীতে প্রবল নিনাদে উত্তেজিত নাবী-কণ্ঠ হইতে সুধা ক্ষবিত হইতেছিল,—পাডা ঝেঁটিযে যত বন্ধু-লোক নিযে তাস খেলা! বেশ বাপু, যত ইচ্ছে খেল। কিন্তু মিনিটে মিনিটে চা চাই! ঘডি ঘডি পানেব কাঁডি উডে যাচ্ছে! পাববো না এত আমি। গতবে কুলিযে উঠচে না। আবাব সেই আটটা বাজতে না বাজতে টাইমেব ভাত চাই। দাসী-বাঁদিবাও সংসাবে একটুকু বিশ্রাম পায। আমাব কপালে তাও নেই—ইত্যাদি।

ললিতবাবুও কেবাণী, বমেশেব সহিত একই আপিসে চাকরি কবেন। কযেক বছবেব সিনিযব। গোটাকযেক টাকা বেশি মাহিনা পান। তাঁহাব মেঘগর্জ্জনেব মত গলাব স্বব মীবাব ননদিব কণ্ঠনাদকেও ছাড়াইযা গেছে। তিনি বীববিক্রমে বলিতেছেন, পাবব না বল্লে চলবে কেন? আলবৎ পাবা চাই। কাজেব মধ্যে কাজ তো দু'বেলা দু'টো বেঁধে দেওয়া, তাব জন্য এত তেজ কিসেব? বেশিব ভাগ দু'পেযালা চা কবতে বল্লে, দু'টো পান সেজে দিতে বল্লে ফোঁস ক'বে উঠবে একেবাবে! গেবস্থ ঘবেব মেযে কে কোথায বসে বসে খায শুনি। এখনই আমাব বন্ধুবা এসে পডবে, আব না চেঁচিযে আস্তে আস্তে ঘবে যাও। চাযেব সঙ্গে অমনই দু'খানা পাঁপবভাজা আব দু'খানা ডালপুবি তৈযেবী কবোগে। ঠিক টাইমে না পেলে কিছু বাকী বাখব না বলে দিচ্ছি।

অতঃপর ননীদির গলার জোর আর তেমন রহিল না বটে, কিন্তু নেপথ্যে তখনও যে তিনি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছেন, তাহার কিছু কিছু আভাস এখানেও ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

২

দ্বিপ্রহরে বাড়ীখানি নিস্তব্ধ, রমেশ আফিসে গিয়াছে। নরেশ স্কুলে গিয়াছে। শুধু কমলা তাহার ইংরেজী বইখানি ও শ্লেট লইয়া মায়ের পাশে বসিয়া সে-দিনকার পড়া অভ্যাস করিতেছে। মীরা সেলাইয়ের কলটা পাড়িয়া তাহার নিত্যনৈমিত্তিক সেলাই লইয়া বসিয়াছে। সামনে পূজা আসিতেছে, কমলা ও নরেশের জন্যও কিছু কিছু নূতন জামা করিয়া ফেলিতে হইবে। নূতন পরিচ্ছদ উপহার পাইয়া তাহাদের কচি মুখগুলি কেমন অপরূপ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, কল্পনানেত্রে তাহাই দেখিয়া মীরার হাতের কাজ দ্রুত চলিতেছিল। কমলা ছোট বলিয়া স্কুলে যায় না, বাড়ীতে মায়ের কাছেই পড়ে। সে নিবিষ্ট মনে পড়া তৈয়েরী করিতেছিল। কাল সারা সন্ধ্যা এবং সারা রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতের পর আজ সমস্ত আকাশ নির্ম্মেঘোজ্জ্বল। বাহিরে রৌদ্রপুলকিত দ্বিপ্রহর, এবং ঘরের ভিতরকার নিস্তব্ধ আবেষ্টনের ভিতর সেলায়ের কলের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়া মীরার মনে একটি আবিষ্ট মধুরতা ঘনাইয়া তুলিয়াছিল। প্রথম শরতের নীল আকাশ ও বাতাসের মধ্যে কি জানি কি আছে, যাহাতে অতীতের যত মধুস্মৃতি মনের দুয়ারে আসিয়া ভীড় জমায়। সেই স্মৃতি-সমুদ্রে মীরার মন তলাইয়া গিয়াছিল, অধরে একটুখানি মৃদু হাস্য হয় তো ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এমন সময় মীরার ননীদি উলের সেলাইয়ের ছোট বাস্কেটটি হাতে ঝুলাইয়া পাশের বাড়ী হইতে আসিয়া তাহার নিকট হাজির হইলেন। আসিয়া হাতের বাস্কেটটি নামাইয়া রাখিয়া আঁচল হইতে খুলিয়া পান-জর্দ্দা মুখে দিয়া মস্ত এক হাই তুলিতে তুলিতে কহিলেন, তোমার ভাই শরীরে

একটু আলিস্যি নেই, সারাদিনই একটা না একটা কাজে লেগে রয়েচ! আমি কিন্তু ভাত দু'টি মুখে দিয়ে একটু গা গড়িয়ে না নিলে আর পারি নে। এই ঘুম থেকে সবে উঠেচি, উঠে ভাবলাম, সেলাইটা আর শেষ হয় না, যাই তোমার কাছে একটু দেখিয়ে আসি।

এই সেলাই বস্তুটি—উলের একটি সোয়েটার। গত বৎসর হইতে ননীদি কর্ত্তার জন্য এইটি সুরু করিয়াছেন। আজিও তাহা শেষ হয় নাই, কিন্তু ননীদিব অধ্যবসায়ের আর বিরাম নাই! এই সেলাইটি উপলক্ষ করিয়া প্রতিদিন দুপুরবেলায় তিনি মীরার কাছে একবার করিযা আসিয়া বসেন, এবং সুখ-দুঃখের পাঁচটা গল্প-সল্প করিয়া যান।

যে সুটটা আরম্ভ করিয়াছিল, সেটা শেষ হইয়া যাওয়ায় মীরা কলের মুখ হইতে সেটা তুলিয়া ভাঁজ করিয়া রাখিয়া ননীদির আরব্ধ সোয়েটার-খানি তুলিয়া হাতে লইয়া বলিল, ওমা, এ যে কিছুই হয়নি! এখনও সবই বাকী! ভাদ্রমাস শেষ হতে চল্ল, এ শীতে শেষ করে পরাতে পারবেন কেমন করে? হাত চালিয়ে চট্ করে শেষ করে ফেলুন।

ননীদি আর একবার হাই তুলিয়া সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার সুরে বলিলেন, আর ভাই বল কেন? সারাদিন খেটে খেটে হাড় কালি হবার যো হয়েচে! সোয়েটার বুনতে কি সময় পাই? তার উপর মুখে একটা ভালো কথা নেই, দিবারাত্রি চড়া কথা আর গালমন্দ যেন লেগেই রয়েচে! তুমিই বল না ভাই, এতে কি আব মন ভালো থাকে, না সেলাই-ফোঁড় ও-সব ভালো লাগে? কোন রকমে দিন টেকে গেলেই হলো।

ননীদির স্থূল মুখে এমন একটি ভাব ছায়া ফেলিল—হয়তো তাঁহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে—যে, মীরার মনটি সমবেদনায় ভরিয়া উঠিল। কমলা পড়া শেষ করিয়া হাতের লেখা লিখিবার জন্য তথা হইতে চলিয়া গিয়াছে তখন। ননীদির মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মীরা মৃদুস্বরে কহিল, কাল সন্ধ্যাবেলায় আপনার চড়া গলার বকুনির আওয়াজ

খুব শোনা যাচ্ছিল। আফিসের সারাদিনের খাটুনির পর তেতে-পুড়ে বাড়ী আসেন, তখন ঐ রকম করে না বল্লেই কি নয়? ওতে যে অতি-বড় ভালো মানুষেরও মেজাজ ঠিক থাকে না। তা ছাড়া, খাটুনিটা বেশ আনন্দের সঙ্গেই করে যাবেন, দেখবেন, তাতে মনের সব অবসাদ :কেটে যাবে, জোর পাবেন খুব মনে। খাটুনিটাই একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখুন না; আপনার তবু তো দিন-রাত্রি থাকবার একটা চাকর আছে, আমি তাও রাখিনি। তার উপর ঘরের কাজ সেরে সন্ধ্যের দিকে প্রমদাবাবুর বাড়ীতে পড়াবার কাজ নিয়েচি বছর-খানেক থেকে। দুপুরে জেলি তৈয়েরী, সেলাই ফোঁড়ের এই সব কাজ। এরই মধ্যে আবার সময় করে কমলাটাকে একটু গান শেখাতে হয়, পড়াতে হয়।

ননীদি মুরুব্বির ভঙ্গীতে কহিলেন, তুমি ও-সব করতে যাও কেন? মেয়েমানুষে আবার রোজগার করবে কেন? আর তাই যদি করবে, তাহ'লে এত পরাধীন—এত লাথি-ঝাঁটা-গঞ্জনা সইবে কেন তারা? তোমার বুদ্ধি নেই—তাই ঘরে-বাইরে খেটে মর।

ননীদির এলোমেলো কথার ভঙ্গীতে মীরা হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চাইছেন তা বুঝেচি। পুরুষেরা আমাদের ভরণ-পোষণের ভার নিয়েচে, সেই জোরেই তারা আমাদের লাথি-ঝাঁটা মারে কিন্তু সেই ভার যদি তারা না নেয়, তবে আর কিসের জোরে তারা আমাদের লাঞ্ছনা করবে? কিন্তু কথাটার কি আর এক দিক নেই ভাই ননীদি? ধরুন,· সংসার তো আর শুধু একা ললিতবাবুর নয়, আর আমাদের এঁর নয়? আমাদের ছেলে-মেয়ে আমাদের সংসার। এক জন একা যদি না পেরে ওঠেন, আমাদের সাহায্য হ'লে যদি সংসারটা ভালো চলে, তবে সে জায়গায় আমাদের এগিয়ে না এসে উপায় কি। আমার খাটুনিটাই দেখচেন, কিন্তু আমার সৃষ্টির আনন্দটা যে কতখানি

প্রবল, তা আপনার চোখে পড়চে না? আমার সামান্য উপার্জ্জনে নরু আর কমলাকে যখন পূজায় নতুন জামা-কাপড় পরাব, যখন তাদের অল্প দিনের জন্যেও এই গলি আর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া থেকে দূরে কোন ভালো জায়গায় একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসতে পারব, তখন তাদের হাসিমুখে কি আমার খাটুনির পুরস্কার পাবো না? নিজের ক্ষমতা একটুখানিও না খাটিয়ে শুধু বসে বসে দু'বেলা স্বামীকে গঞ্জনা আর খোঁটা দেব, সেটা কি ভালো? ভালো তো নয়ই, তা ছাড়া সম্পূর্ণ নিষ্ফল।

ননীদি মুখ গোঁজ করিয়া বলিলেন, কি জানি ভাই, আমরা সেকেলে মেয়েমানুষ, এল-এ, বি-এও পাশ করিনি, আর কি করে রোজগার করতে হয়, তাও জানিনে। বাপ-মায়ে গেরস্থ ঘরের মেয়ের মত রান্নাবাড়া শিখিযেছিল, দু'বেলা তাই দেহ কালি করে হেঁসেলে হাঁড়ি ঠেলছি; কামাই নেই!

পাশের ঘরের ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া চারিটা বাজিল। আর একবার হাই তুলিয়া আর একটা পান এবং খানিকটা দোক্তা মুখে পূরিয়া ননীদি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, ঐ দেখ ভাই, একটু বসতেই পোড়া ঘড়িতে চারটে বেজে গেল! যাই, আর কি বসবার যো আছে? বাবু পাঁচটায় আসবেন। উনুনে আঁচ দিয়ে খাবার-দাবারের জোগাড় করতে করতেই কোন্ দিক দিয়ে বেলা কেটে যাবে! আজ আবার ফরমাস আছে, কলাইয়ের রসবড়া, মেথি আর জীরে দিয়ে নিম্‌কি। রান্না-ঘরেই সারা-দিনটা কাটে, কখন সেলাই-ফোঁড় করি বলো?—এই বলিয়া বহু দিনের অসমাপ্ত সোয়েটারটা আর একবার ভাঁজ করিযা উলের বাক্সে ভরিতে ভরিতে গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মীরা হাসিমুখে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল, দোহাই ননীদি, আজ আর কালকের মত চেঁচামেচি করবেন না। অত সব সুখাদ্যের যে নাম করলেন, সেগুলো যখন অত সব তৈয়েরীই করবেন, তখন পরিবেষণের সময়

অন্ততঃ মুখেও একটু মিষ্টরস বিতরণ করবেন। সে-টুকুতেই বা এত কৃপণতা কেন?

ননীদি যাইতে যাইতে একটু দাঁড়াইয়া কহিলেন, অমন কথাটি ব'লো না ভাই! এই মুখের জোরেই আজও বেঁচে আছি। তোমার গিয়ে ভোটই বলো আর স্ত্রী-স্বাধীনতাই বলো—ও-সব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বইয়ের পাতাতেই পড়ি। কই, আমাদের কোন কাজে আসে কি? পুরুষ মানুষের অত্যাচারে এত দিন কোন্ কালে তলিয়ে গুঁড়ো হয়ে যেতাম—যদি না এই মুখের জোরটুকু থাকত। তাই আজও আমাকে ঘাঁটাতে ভয় পায় মনে মনে জানে, এখানে বেশি চালাকি চলবে না।

ননীদি আর দাঁড়াইলেন না। তেজোদৃপ্ত ভঙ্গীতে মিলিটারি কায়দায় পা ফেলিয়া আপন গৃহের পথ ধরিলেন।

বিনাপণের মর্য্যাদা

১

বৈশাখের সন্ধ্যা, সারা দিন অসহ্য গুমোট গিয়াছে, এখন দক্ষিণ দিক হইতে স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। চামেলী দোতালার ছাদে মাদুর পাতিয়া নতুন গানটি অভ্যাস করিতেছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি কলি পুনঃ পুনঃ গায়িতেছিল,—

"জীবনে জেগেছিল মধুমাস
রঙে-রাঙা হ'য়েছিল সকল আকাশ।"

তাহার মা ছাদের সংলগ্ন টিনের শেড্-দেওয়া ছোট রান্নাঘরে রুটি বেলিতে-বেলিতে মেয়ের গান শুনিতেছিলেন। চামেলী কহিল,—মা, ঠিক হচ্চে তো? কোথাও ভুল হয়নি? মা কহিলেন,—না, ভুল হয়নি, সুরটা ঠিকই, তবে আর একটু মিষ্টি ক'রে ভাবের আর একটু উচ্ছ্বাস দিয়ে গাইবার চেষ্টা কর। প্রাণ ঢেলে গাইতে না পারলে গানের অনেকখানিই ব্যর্থ হ'য়ে যায়।

চামেলী মায়ের কথা শুনিয়া আরও ভাব দিয়া গায়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে তাহার বাবা আফিস-ফেরত এক বাণ্ডিল কাগজ বগলে তথায় উপস্থিত! চামেলী বাজনা এবং গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার হাত হইতে কাগজের তাড়াটি ঘরে লইয়া যাইবার জন্য গ্রহণ করিল। বাবা সাবধান করিয়া দিলেন,—দেখো মা, আফিসের জরুরী কাগজপত্র! হারায় না যেন একখানিও। আমার টেবিলের দেরাজে রাখোগে।

চামেলী যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে কাগজ রাখিতে গেল। তাহার মা রুটিবেলা

রাখিয়া উদ্বিগ্ন স্বরে কহিলেন,—তোমার আজ ফিরতে এত রাত হ'লো কেন গো? সেই কোন্ সকালে দু'টি ভাল তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে গুঁজে আফিসে ছুটেছো! আমি তখন থেকেই ভাবচি। এই ছাদেই ঠাণ্ডায় একটুখানি বোসো। এক পেয়ালা চা ক'রে দেব কি?

দাও।—শিবনাথ ক্লান্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মাদুরে বসিলেন। দরিদ্র-ঘরের স্বল্প কিন্তু সযত্নে সংরক্ষিত জলখাবারের রেকাবি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল, চামেলী তাহা আনিয়া তাঁহার সামনে ধরিল।

চা ও খাবার খাইয়া তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া শিবনাথ কহিলেন,—আজ নতুন গান কি শিখ্‌লি চামেলী? আমাকে শোনাবিনে?

কমলাদেবী কন্যাকে কহিলেন,—তুই ততক্ষণ ওঁকে একটু গান-টান শোনা, তার মধ্যেই আমার রান্না শেষ হ'য়ে যাবে।

রাত্রির সমস্ত গৃহকর্ম্ম শেষ হইলে, শয়ন-কক্ষে বসিয়া শিবনাথের স্ত্রী কমলা নিজের জন্য মস্ত বড় করিয়া একটা পাণ সাজিতেছিল—সাজিতে সাজিতে কহিল,—আজ যেখানে যাবার কথা ছিল, সেখানে গিয়েছিলে না কি?

শিবনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"না যাইনি, আজ আফিসের কাজের ভীড়ে আর সময় হ'য়ে ওঠেনি কিন্তু গিয়ে যে কি লাভ হবে তা বুঝতে পারচিনে! আজ ছ'মাস ধ'রে কত জায়গাতেই ঘুরলাম, বিনা-টাকায় কোথাও হয় না। তা-ও আবার সোজা টাকা নয়, কম ক'রেও অন্ততঃ চার-পাঁচ হাজার। কোথায় পাব অত টাকা? জানো তো সবই।

কমলা একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,—কেন, টাকাই কি সব? আমার অমন মেয়ে, যেখান-সেখান থেকে একটা খুঁজে বার করুক দিকি? দেখতে সুন্দরী, তা'ছাড়া গান বাজনা, সেলাই, লেখাপড়া সব দিকেই সমান।

স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল—তাহাদের একমাত্র কন্যা চামেলীর বিবাহের বিষয়ে। শিবনাথ অল্প বেতনে কলিকাতায় কেরাণীগিরি করেন। ভদ্রভাবে থাকিয়া এই স্বল্প আয় হইতে কিছুই জমান যায় না; তবু এই কয়েক বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় পোষ্টাপিসের খাতায় হাজার-খানেক টাকা জমিয়াছে। এদিকে শিবনাথের স্ত্রী কমলা দরিদ্রের ঘরণী হইলেও রীতি-মত বিদুষী। আই-এ পাশ করিয়া বিবাহ হইয়াছিল, বিবাহের পর স্বামীর কাছে পড়িয়া প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়া বি-এ পাশ করিয়াছে। বিবাহের পূর্ব্বে পিতৃগৃহে সে গান, এস্রাজ শিখিয়াছিল; এখনও তাহার চর্চ্চা ভোলে নাই, মেয়েটাকে সযত্নে তাহা শিখাইতেছে। চামেলী এ বছর প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দিয়া পাশ করিয়াছে; বাড়ীতে এখনও পড়িতেছে। আই-এ দিবে ইহাই তাহার আন্তরিক আশা।

অন্ধকারাচ্ছন্ন জানালা দিয়া শিবনাথ ততোধিক অন্ধকারাবৃত আকাশের পানে চাহিয়া ছিলেন; একটু ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন—আমিও আগে ভাবতুম, আমার এমন মেয়ে, তার বিয়ের জন্যে আবার টাকার ভাবনা কেন? কিন্তু ঘা খেয়ে-খেয়ে সে কথা আর এখন ভাবতে পারচি কৈ? আজ অবনীবাবু এক জায়গা থেকে একটি সম্বন্ধ এনেছেন। ছেলেটির অবস্থা মোটামুটি ভালো; পাড়াগাঁয়ে চাষ-বাস আছে। এখানকার কলেজে বি-এ পড়ে। এবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে ল' পড়বে। তেমন কিছু চায় না, মেয়ে পছন্দ হ'লেই হ'লো।

কমলা নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া কহিল—পাড়াগাঁয়ে বাড়ী! না না, সেখানে আমি মেয়ে দোব না। ম্যালেরিয়া আছে, তা' ছাড়া যত অশিক্ষিত লোকের বাস! অমার্জ্জিত বুনো জায়গা!

শিবনাথ কহিলেন,—কেন ছেলেটির জমিজমা আছে। নিজের বাড়ী আছে,—নিজের গোটা একটা বাড়ী; আর তোমার কি আছে কমল? ভাড়া-বাড়ী,—তা-ও তেতালার উপরে একটুক্‌রো ফ্ল্যাট্!

স্বামীর এ কথার উত্তরে কমলার শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। পুরাণ দিনের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল! প্রথম জীবনে তার কতই আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ছিল! শিবনাথের যখন বিবাহ হয়, তখন তিনি কলেজে এম-এ পড়েন। সামনে ছিল কত উচ্চ আশা! বমণীয় সুদীর্ঘ পথ কল্পনালোকে কেমন সুরঞ্জিত ছিল! আর আজ—? তবু নিজেদেব সেই সমস্ত ব্যর্থ আশা এবং বিফল স্বপ্ন একেবারে নিরর্থক হয নাই, চামেলীর মধ্যে তাহা যেন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিয়াছে; নব ভাবে পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া। তাই কমলা তাহাব এই মেয়েটিকে লইয়া কত স্বপ্ন দেখে; আপন-মনে কতই ভাঙ্গাগড়া করে! নিজের জীবনে যে সাধ মেটে নাই, যত আশা নিবিয়া গেছে, তাহাদের সমস্তগুলি দিয়া এক একটি করিয়া দীপ জ্বালিয়া মুগ্ধ মানস-চক্ষে চামেলীর ভবিষ্যৎ জীবনকে দীপান্বিত করিয়া তোলে।

ক্রমে রাত্রি বাড়িয়া উঠিল। কমলা আলো নিবাইয়া দিয়া শয়নেব উদ্যোগ করিতে করিতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় বলিল,—হ্যাঁ, তোমাকে একটা কথা ব'লতে ভুলে গিযেছিলাম। গাযত্রীদি' বিশেষ-ক'রে ব'লে গেছেন—কাল সকালের দিকে তাঁর বাড়ী একবার যেতে। তাঁব মেযে সিপ্রাকে কাল পাকা-দেখতে আসবে। কাল ওঁব ওখানেই আমাদেব নিমন্ত্রণ। তুমি তখন ছিলে না, আফিসে ছিলে, তোমাকে শুদ্ধ বাব বাব ক'রে যেতে ব'লে গেছেন।

শিবনাথ পাশ ফিরিয়া শুইয়া কহিলেন,—বেশ তো, যেযো তুমি; আর চামেলীও যাবে। আমাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? গরীব মানুষ, অত 'হাইসার্ক্‌লে' মেশবার অভ্যেস তো নেই।—তা' ছাড়া আফিসও আছে।

কমলা অনুযোগের সুরে কহিল,—ওরা বড়লোক আছে তা থাকুক না; তাই ব'লে আমাদের তো আর ধ'রে গিলে খাচ্ছে না! বরঞ্চ

নিজে বাড়ী ব'য়ে-এসে হাতে ধ'রে ক'ত করে যেতে ব'লে গেল। অবশ্য না যাও, সে তোমার ইচ্ছে ; কিন্তু তাই ব'লে কাল রবিবারের দিনটাতে আর আফিসের তাড়ার অজুহাত দেখিও না! গায়ত্রীদি' বলছিলেন, রবিবার ব'লেই কাল পাকা-দেখার দিন ক'রেচেন। রবিবার ব'লে সকলেই আসতে পারবে ; আফিস সবারই বন্ধ।

গায়ত্রী কমলের খুড়তুতো বোন। এই কলিকাতা অঞ্চলেই সে প্রকাণ্ড সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে। স্বামী এক জন নামকরা বড়-লোক। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কমলা আবার কহিল,—যাদের অদৃষ্ট ভালো তাদের কি সবই ভালো? গায়ত্রীদি' বলছিলেন, মেয়ের বিয়েতে একটি পয়সা পণ লাগছে না ; অথচ এমন ভাল পাত্রও সচরাচর মেলে না! বিধি সদয় হ'লে সব দিকেই সুবিধে হয়।

শিবনাথ ঔৎসুক্যভরে কহিলেন,—কি ব'ললে, একপয়সাও পণ লাগবে না? কমলা সায় দিল,—হ্যাঁ, মেয়ের মা তাই তোমার বার বার ক'রে ব'লে গেলেন। চল না কাল। তুমি কুনো স্বভাবের লোক, কোথাও বেরোতে চাও না, কারও সঙ্গে মিশতে চাও না। অমন ক'রে থাকলে কি আর মেয়ের জন্যে ভাল পাত্র জোটানো যায়?

বিনাপণের ব্যাপার শুনিয়া শিবনাথ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন ; সম্মতি জানাইয়া বলিলেন যে, গায়ত্রীদি'র নিমন্ত্রণ রাখিতে তিনিও যাইবেন। আর তিনি আপত্তি করিলেন না।

২

কলিকাতার যে অঞ্চলে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বাস, সেই অঞ্চলেই গায়ত্রী দেবীর স্বামী বিজয়নাথের প্রাসাদোপম অট্টালিকা। সকাল হইতে মোটরের ভীড় লাগিয়াছে, দ্বারের কাছে দেশীয় প্রথায় নহবত বাজিতেছে। গায়ত্রীদি' মৃদু হাসিয়া কমলার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—ওটা ওরিয়েণ্টাল

ব্যাপার! আমাদের আর্টিষ্ট নকুলবাবুর মাথাতেই প্রথমে এই নহবতের মৌলিক পরিকল্পনাটির উদয় হয়, সে জন্য তাঁকে অগণ্য ধন্যবাদ।

নকুলবাবু কাছাকাছি ঘুরিতেছিলেন; শুনিতে পাইয়া ওরিয়েণ্টাল ধরণে হেঁ-হেঁ করিয়া প্রাণখোলা মৌলিক হাসি হাসিলেন। কমলা সবেমাত্র আসিয়া পৌছিয়াছিল। চামেলী সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাকে কেহ বড়-একটা আমোল দিল না। এ সভায় সে নিজেকে ঠিক মানাইয়া লইতে পারিতেছিল না। এক জায়গায় গুটি-তিন-চার তরুণী একত্র বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছিল। তাহাদের নিকটস্থ হইয়াছিল বলিয়া কথাবার্ত্তার যে দুই-একটা প্রক্ষিপ্ত ভগ্নাংশ তাহার কাণে আসিতেছিল, তাহাতেই চামেলী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রচুর হাসি এবং প্রচুরতর কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, এবং অজস্র মুখভঙ্গী করিয়া তাহারা যে আলাপ-আলোচনা চালাইতেছিল, তাহা চামেলীর কাছে বিশেষ মার্জ্জিত বা মধুর হৃদয়ের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিল না। এত দিন এই উচ্চ সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিতা নরনারীর সহিত মিশিবার কোন স্থযোগই সে পায় নাই। পায় নাই বলিয়া যে কোন ক্ষতি হইয়াছে, আজ তাহাদের খুব নিকটে দাঁড়াইয়া সে কথা তাহার মনে হইল না।

সিপ্রা একবার ভদ্রতা করিয়া কহিল,—বোসো না ভাই! দাঁড়িয়ে রয়েচ কেন?

চামেলী সঙ্কুচিত হইয়া নিকটস্থ একখানা কৌচে বসিল। সবুজ কাপড়পরা একটি তরুণী হাতের স্থচিত্রিত জাপানী হাল্কা হাত-পাখাখানা দিয়া তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনীর গায়ে একটা ঠোকর দিয়া কহিল,—মণির আজকাল কপাল ভালো, অশোকবাবুর ঘন-ঘন দেখা পাওয়া যাবে তার বাড়ীতে গেলে।

মণি শ্লেষ করিয়া কহিল,—কেউ তো আর ধ'রে রাখে না তাকে। যেখানে তার ভালো লাগে সেইখানেই যায়।

সিপ্রা মৃদু হাসিয়া কহিল,—ভালো লাগাবার আর্ট জানা চাই ; শিখিয়ে দাও না ভাই আমাদের।

বেলা বলিল,—সে আর্ট শিখতে বেশ-খানিক সময় লাগে। অত সোজা নয় সিপ্রাদি ! মণির টয়লেট্-টেবিলের সামনে কখনো দাঁড়িয়েছেন ? তা'হলেই বুঝতে পারবেন আমার কথাটা।

প্রত্যুত্তরে হাতের পাখাটা দিয়া মণি বেলাকে কৃত্রিম কোপের সহিত ঠোকর মারিল, এবং তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না থাকিলেও এ কথা শুনিয়া চামেলী লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

চিত্রা এই দলের মধ্যে রাশভারি এবং বিদুষী। কি একটা নারী-প্রগতিমূলক কাগজের সে সম্পাদিকা। সে রুমাল দিয়া চশমাটা একবার মুছিয়া-লইযা কহিল,—কি সিপ্রা, এ মাসে তোমার যে একটা প্রবন্ধ দেবার কথা ছিল, তার কত দূর ?

মণি ঠাট্টা করিয়া বলিল,—হ্যাঁ, ও আর প্রবন্ধ লিখেছে ! বিয়ের আনন্দেই একেবারে মশগুল্ ! এবারে পুরুষদের চরণের দাসী হ'তে চ'ললো, এখন ওর লেখার সে ধার, ষ্টাইলের সেই তেজস্বিতা আর থাকবে না কি ?

সিপ্রা ফোঁস করিয়া বলিল,—সব্বাইকে নিজের মত ভেবো না। আমাদের বিয়ে মানে বাঁদীগিরি নয় পার্টনারশীপ। সমান অধিকার। সমান দাবী। আর বিয়ে ক'রেচি বলেই যে,ভবিষ্যতে পুরুষদের অন্যায় এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে কিছু লিখবো না—তা-ও সত্য নয়। আপনার প্রবন্ধ ঠিক সময়েই পাবেন চিত্রাদি ! এই ক'দিন 'এন্‌গেজড্' থাকাতে হ'য়ে ওঠেনি।

গৃহের অপরাংশে কমলা তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে বলিতেছিল,—তোমার কিছুই তো পণ লাগেনি ভাই গায়ত্রীদি', নয় ? আজকালকার দিনে এমনটি কিন্তু আর দেখা যায় না।

গায়ত্রী তখন আর এক জন মহিলাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—

গয়নাগুলো সব হীরেরই দিলুম। ওঁরা বলে পাঠিয়েছিলেন কি না, যা দেবেন কম ক'রেই দেবেন, কিন্তু হীরেরই যেন হয় সব ক'টা।

কমলা বোকার মত প্রশ্ন করিল,—তবে যে তুমি ব'ললে, গায়ত্রীদি', ওঁরা কিছুই নেননি ?

উপস্থিত মহিলাটি অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ ভৌমিক বলিলেন,—নেননি তো সত্যই কিছু। ওঁদের যেমন ছেলে, ইচ্ছে করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা গুণে নিতে পারতেন যে! কিন্তু তাই ব'লে সমাজে নিজেদের একটা মান-সম্ভ্রম আছে তো? ওঁদের বাড়ীর বৌ হ'য়েচে, সে হীরে-ছাড়া কিছু পরেনি কখনো। সেটুকু বজায় রাখতে হবে তো।

গায়ত্রী সগর্ব্বে কহিলেন,—সে কথা একশো বার! আমারও শুধু ঐ হীরের স্যুটটাতেই হাজার-পঁচিশেক লেগে গেল! তা'ছাড়া এখনও ফার্ণিচার, রূপোর টি-সেট, সোনার গোলাপ-পাশ, আর ফ্লাওয়ার-ভাস্, আংটি, ঘড়ি—সমস্তই বাকী। মেয়েদেব কাপড়-কেনা—রং ম্যাচ ক'বে—সে-ও এক বিরাট পর্ব্ব! তা' এতে মিসেস্ মল্লিক আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেচেন। তাঁর 'টেষ্ট অনুসারে 'সিলেক্ট' না কবলে এত সুন্দর জিনিষ নিজের চেষ্টায় বোধ হয় আমি জোগাড় ক'রে উঠ্‌তে পাবতুম না।

সমাগত মেয়েবা কেহ কেহ কাপড় দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কমলা অবাক হইয়া চাহিয়া ছিল! তাহাব গাযত্রীদি'ব কথা শুনিয়া প্রথমে মনের অতি সঙ্গোপনে আশাব যে ক্ষীণ বশ্মিটি প্রভা বিকাশ করিয়াছিল, মুহূর্ত্তেই তাহা নির্ব্বাপিত হইল। প্রথমে মনে মনে এইরূপই আশা করিতেছিল যে, বিনাপণে যদি গায়ত্রীদের সমাজে বিবাহ হয়, তবে সেখানে যাওয়া-আসা মেলামেশা করিতে করিতে চামেলীবও হয় তো এক দিন······কিন্তু আশার সেই নব কিশলয় দেখিতে-দেখিতে শুকাইয়া গেল—গায়ত্রীর মুখে বিরাট ফর্দ্দ শুনিয়া।

গায়ত্রী মিসেস্ ভৌমিকের হাতে আলমারির চাবি দিয়া বলিলেন,—আপনি দয়া ক'রে কাপড়-চোপড়গুলো দেখান এঁদের। সে এক বিরাট ব্যাপার। ভালো ক'রে দেখাতে অন্ততঃ একটি ঘণ্টা সময় লাগবে। আমার আবার ওদিকের সমস্ত কাজই বাকী এখনও। আশীর্ব্বাদের সময় হয়ে এলো, বেশী দেরী নেইও আর।

দুয়ারের কাছে গায়ত্রীর স্বামী ডাকিলেন,—শুনে যাও একবার। ওঁরা ফার্ণিচার-ডিলারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই কোম্পানীই চিরকাল ধ'রে ওঁদের জিনিসপত্র দিয়ে আসছে, সবই জানে-শোনে ওরা। কিছু আর নতুন ক'রে বোঝাতে হবে না।

গায়ত্রী মস্ত একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—যাক, বাঁচলাম। ফার্ণিচারগুলোর একটা কিনারা হওয়ায় এতক্ষণে স্বস্তি পাওয়া গেল।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—ওরা ক্যাটালগ নিয়ে এসেচে। তোমাকে একবার দেখিয়ে নিয়ে যাবে। তার পরে যথাসময়ে ঠিক জিনিষ নিজেরাই প্যাক ক'রে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবে। একটা ড্রইংরুম আর বেডরুমের সরঞ্জাম,—পিয়ানো-শুদ্ধ প্রায় হাজার-তিন সাড়ে তিন পড়বে আর কি।

গায়ত্রী তাচ্ছিল্যের সহিত কহিলেন,—টাকার জন্যে কিছু যায়-আসে না। ভালো জিনিষ দিতে বোলো।

গায়ত্রীর স্বামী বলিলেন,—বেয়াই পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁদেরই বাড়ীতে ফার্ণিচার সরবরাহ করে যারা বরাবর—তাদেরই, সুতরাং জিনিষ যে ভালো হবেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকো।

মিসেস্ ভৌমিক প্রকাণ্ড আলমারি খুলিয়া কাপড়ের একটি দোকান সাজাইয়া বসিয়াছিলেন। মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া নানারূপ মন্তব্য করিতেছিল।—যোগিয়া রংয়ের জর্জ্জেটটা বেশ নূতন ধরণের হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদী ও হাল্কা বেনারসীর রং এবং জমিও চমৎকার! অন্যূন শ'-খানেক কাপড়-জামার স্তূপে পরিবেষ্টিত হইয়া মেয়েরা এইভাবে বিরাট সমালোচনা জুড়িয়া দিয়াছিল।

গায়ত্রী কহিলেন,—বেয়াই যে যে কাপড়ের ফর্দ্দ দিয়েছিলেন ও তাঁদের বরাবর কেনা হয় যে সব দোকানে—তাদের নাম বলে দিয়েছিলেন, সেই হিসাবেই কেনা হ'য়েচে। হ'লে হবে কি, সায়েবি দোকানগুলোতে বাপু—জিনিষের বেজায় দাম নেয়! তবে ওদের একটা নাম-ডাক আছে কি না, সেই অনুসারে বাঁধা দোকানও আছে।

অনেক বেলায় নিমন্ত্রণ সারিয়া কমলা শিবনাথ ও চামেলী সহ ফিরিয়া আসিতেছিল। কমলা ভাবিতেছিল, বেয়াই গয়নার দোকান এবং ফার্ণি-চারের দোকান বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া কেমন বিনাপণে ছেলের বিয়ে দিতেছেন—এ এক অদ্ভুত সমস্যা! অথচ লোকের মুখে-মুখে ঐ একই কথা! আহা, এমন হীরের টুকরো ছেলে, বিনাপণে বিয়ে হচ্ছে! গায়ত্রীর কপাল-জোর! শিবনাথ ঠিক এই কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন,—বিনা-পণের বিয়ে কেমন দেখে এলে?

কমলা অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিল, চমকিত হইয়া কহিল,—হ্যাঁ, দেখে এলাম। চমৎকার! দেখ, কাল তুমি ঐ যে ছেলেটির কথা ব'ল-ছিলে, বি-এ পড়ে, গ্রামে সঙ্গতি আছে, বাড়ী আছে—তাদেরই সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের ঠিক-ঠাক ক'রে ফেল।

তৃষ্ণা

হরকুমারবাবু প্রথম জীবনে ছিলেন সাবেক-পন্থী। টিকি রাখিতেন; পূজা, আহ্নিক প্রভৃতি ধর্ম্মকর্ম্ম দু'বেলা নিয়মিত ভাবেই করিতেন। বাল্যবিবাহ এবং পর্দ্দাপ্রথার তিনি অত্যুৎসাহী সমর্থক ছিলেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁহার মতটা বদলাইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর হরকুমার ব্যাঙ্কের পাশবইখানি খুলিয়া দেখিতে পাইলেন, দানধ্যান ও বারো মাসে তের পার্ব্বণ সুসম্পন্ন করিয়া পিতা বিশেষ কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার সাহায্যে পৈত্রিক ক্রিয়াকলাপ ও সাবেক চাল বজায় রাখিয়া দেশে বাস করা সম্ভবপর নয়। স্থানীয় জমিদারবাবু হরকুমারের পিতাকে খুব ভালোবাসিতেন। তাঁহাকে ডিরেক্টার খাড়া করিয়া কলিকাতায় একটা নূতন ব্যাঙ্ক খুলিবার উদ্যোগ চলিতেছিল; হরকুমার তাঁহাকে মুরুব্বি ধরিয়া সেই ব্যাঙ্কে একটা চাকরী জুটাইয়া লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাহার পর পাঁচ-ছয় বৎসর কাটিয়া গিয়াছে; হরকুমারের কর্ম্মজীবনে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। এখন তিনিই ব্যাঙ্কের প্রধান ম্যানেজার। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজে তাঁহাকে 'সায়েব-সুবোর' সঙ্গে প্রায়ই ডিনার খাইতে হয়, তাঁহাদের সহিত লেন-দেন করিতে হয়। এখন তাঁহার টিকিটা হ্যাটের তলায় আত্মগোপন করিয়াছে, এবং 'নমো নমো' করিয়া সন্ধ্যাটা কোন রকমে সারিয়া লইবার অবসরও হয় তো সকল দিন ঘটিয়া ওঠে না। তাঁহার বড় মেয়ে সুভাষিণীর বিয়ে পিতার আমলেই সম্পন্ন হইয়াছিল। এখন ছোট মেয়ে মিস্ সুনীতি চ্যাটার্জ্জির জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান চলিতেছিল। হরকুমারের গৃহিণীর এখন খুব উঁচু নজর;

তিনি বলেন, ব্যারিষ্টাব কিংবা আই, সি, এস্ ভিন্ন আর কাকেও তিনি জামাই কবিবেন না। স্ত্রীলোকেব জীবনের পবিবর্ত্তনশীল ঘটনাবাজিব সহিত মানাইযা লইবাব ক্ষমতাব বুঝি বা অবধি হয না। শ্বশুবেব আমলে যিনি একগলা ঘোমটা টানিযা, মটকাব মোটা শাডী পবিযা বান্না এবং ভাঁড়াব ঘবেব এলাকায দিবসেব অধিকাংশ সময যাপন কবিতেন, তিনিই এখন কলিকাতাব অগাধ জলে মোটেই হাবুডুবু খাইতেছেন না, ববঞ্চ জলচব মাছেব মতই স্বচ্ছন্দে বিহাব কবিতেছেন। যখন তখন চাকব-বাকব এবং ছেলেপিলেদেব সহিত ইংবেজী বুকনি দিযা কথা বলিতেও তাঁহাব বাধিতেছে না, এব° বাঙ্গালা সিনেমা দেখিযা আসিযা আর্টেব উৎকর্ষতাব আলোচনাও বেশ নিপুণ ভাবেই কবিতে পাবিতেছেন। কিন্তু সে যাই হোক, সুনীতিব জন্য পাত্র খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে এক জন সদ্য-পাশকবা ডাক্তাবেব সঙ্গে তাহাব সম্বন্ধ স্থিব হইল। ব্যাবিষ্টাব বা আই, সি, এস্-এব জন্য তাহাব মা কম চেষ্টা কবেন নাই, কিন্তু সেই প্রকাব দুর্লভ জাতীয একটি পাত্র ক্রয কবিতে যে পবিমাণ অর্থেব প্রযোজন, তাহা তাঁহাদেব প্রায সাধ্যাতিবিক্ত। কিন্তু এ পাত্রটিও মন্দ নয। বালীগঞ্জ অঞ্চলে নিজস্ব বাড়ী আছে, আধুনিক ধবণ-ধাবণ। বেশ শিক্ষিত এবং উদাব মতাবলম্বী—মেযেকে কষ্ট পাইতে হইবে না।

সুনীতিব বিবাহেব দিন মাসেব প্রথম সপ্তাহে স্থিব হইযাছে। হবকুমাবেব বড মেযে সুভাষিণীব আজকাল পিত্রালযে আসা সহজে বড-একটা ঘটিযা ওঠে না। একে তো প্রকাণ্ড স°সাবেব ঘবণী-গৃহিণী তিনি—সমযও পান না, তাহাব উপব তাঁহাব শ্বশুববা বনেদী আমলের মস্ত বড জমিদাব। তাঁহাদেব বীতি-পদ্ধতি সমস্তই সেকেলে। হবকুমাবের গৃহস্থালী তাঁব পিতাব আমলে যেমন ছিল, আজকাল যে আব তেমন নাই, ববঞ্চ নোঙব-ছেঁড়া নৌকাব মত আধুনিকতাব ঘাটে-ঘাটে জল ভাঙ্গিযা ফিরিতেছে, এ-খবব তাঁহাব বৈবাহিকেরা বাখিতেন। তাই বাগ কবিযা

তাঁদের বাড়ীর বৌটিকে বড়-একটা পাঠাইতে চাহিতেন না; কিন্তু সুনীতির বিবাহ উপলক্ষে তিনিও আসিয়াছেন। আর ঝি, চাকর, দারোয়ান, স্বামী ও গুটি সাত-আট পুত্র-কন্যাও তাঁহার লেজুড় হইয়া সঙ্গে আসিয়াছে। বিকাল বেলায় শুচিতা বাঁচাইয়া, গঙ্গাজলের জালা হইতে একটুখানি জল তুলিয়া লইয়া মুখে-মাথায় ছিটাইয়া, সুভাষিণী তসরের কাপড়খানি পরিয়া চায়ের জল চড়াইতে যাইতেছেন—এমন সময় একটা মোটর-গাড়ী আসিয়া বহির্দ্বারে দাঁড়াইল, বাড়ীতে যেন একটা আনন্দের হিল্লোল বহিল,—সুবোধবাবু এসেছেন! সুবোধবাবু এসেছেন।

এই সুবোধবাবুই সুনীতির জন্য নির্ব্বাচিত পাত্র। স্ত্রীজন-সুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সুভাষিণী দ্বারের আড়াল হইতে একবার ডিঙ্গি মারিয়া দেখিলেন, দিব্যি ছেলেটি—গৌরবর্ণ, ছিপ্‌ছিপে দেহ, মুখে একটি নম্র সুকুমার ভাব।

সুবোধ ঘরে আসিয়া বসিলে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া নানাপ্রকার হাসি-তামাসা গল্প করিতে লাগিল। চাকরেরা অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে ডাবের জল, ঘোলের সরবৎ, জলখাবার, চা, সিগারেট প্রভৃতি সরবরাহ করিতে লাগিল। কে একটি ছোট মেয়ে বলিয়া উঠিল,—জানেন না বুঝি, কাল বড়দি' এসেছেন যে!

সুবোধ বলিল,—বা রে, আমি জানিনে তো কিছু! কোথা আছেন দিদি? তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ক'রতে হবে যে।

সুবোধ ইতিপূর্ব্বেই সুনীতির কাছে তাহার দিদির বিষয় অবগত হইয়াছিল। সুভাষিণী অনেক অনুরোধ-উপরোধ, মায়ের ব্যাকুলতা, এবং সুনীতির আবদার এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা তসরের কাপড়খানা মাথায় বেশ করিয়া টানিয়া দিয়া সুবোধ যে ঘরে বসিয়া ছিল, সেই কক্ষে আসিলেন। সুবোধ প্রণাম করিয়া বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিল,—দিদি যখন এসে পড়েছেন, তখন তো আমার অর্দ্ধেক ভাবনাই কমে গেল।

শুধু কনের দিদি হ'লে চল্‌বে না, আমারও দিদি হ'তে হবে। শুনেছেন বোধ হয়, আমার মা-বাবা, বড় ভাই বা বোন কেউই নেই ; তাই নিজেই নিজের অভিভাবক। এতক্ষণ ভেবে ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলেম না—কি ক'রে কি ক'রব। এখন তা হ'লে আপনিই গাড়ীটা নিয়ে কি সব দিতে-থুতে হয়, তত্ত্বের জিনিষ-পত্রগুলো কিনে-কেটে আন্‌বেন। আমার দিকে আর তো কেউ নেই।

সুভাষিণী ঘোমটা টানিয়া অবাক্ হইযা দাঁড়াইয়াছিলেন। যে ছেলেব আর তিন-চার দিন পরে বিবাহ হইবে, সেই বর যে ভাবী শ্বশুর বাড়ী আসিয়া এতখানি অসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা বলিতে পারে, এমন অদ্ভুত প্রস্তাব করিতে পারে—এ যেন তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর! সুবোধ একটু থামিয়া, দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মানা সুনীতির দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া হাসিয়া কহিল,—যদি ইচ্ছে করেন, তবে বোনটিকেও না হয় সঙ্গে নিয়ে যাবেন। উনিও সঙ্গে গেলে ভালোই হয়। নিজেব জিনিষ নিজের ইচ্ছায় পছন্দ ক'বে বেছে আন্‌বেন।—এ বেহায়াপণার চরম! সুভাষিণী আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ঘোমটাটা আব একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে তথা হইতে চলিয়া আসিলেন। এ পাশের বারান্দায় পা দিবামাত্র স্বামী ত্রৈলোক্যনাথ কোথা হইতে আসিয়া পরুষ কণ্ঠে কহিলেন,—ও-ঘবে কোথায় যাওয়া হ'যেছিল শুনি? কোন্ কুলেব বৌ তুমি—যার-তার সামনে বাব হ'লেই হ'ল? আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। সাবধান, বেশী বাড়াবাড়ি ক'রলে মজাটা টের পাইয়ে ছাড়ব!

প্রত্যুত্তরে সুভাষিণী সভয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলিল,—আমি নিজেই ও-সব ভালোবাসিনে, কেবল মার আর সুনীতির জেদে প'ড়ে···

ত্রৈলোক্য তাঁহার কথার মাঝখানেই বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন,—সুনীতির জেদে প'ড়ে?···কেন, এখনও বিয়ে হযনি, এখনই সুনীতিব সঙ্গে ওর সুবাদটা কি শুনি?—আর যদি কখনও তোমাকে বাপের বাড়ী

পাঠাই, তবে ত্রৈলোক্য ঘোষাল বেহারী ঘোষালের ছেলে নয়—জানবে। বিয়ের আগে থেকেই পুরুষ-মানুষের সঙ্গে যে বাড়ীর মেয়েরা মেলামেশা—ইয়ার্কি করে, ফষ্টিনষ্টি করে—সে বাড়ী, সে পরিবার উচ্ছন্নে গেছে জানবে। যাও, অন্দরে যাও।

একটা কেলেঙ্কারি হবার ভয়ে সুভাষিণী বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া-সুঝাইয়া স্বামীকে তখনকার মত শান্ত করিল বটে, কিন্তু রাগে তাহার সমস্ত মন জ্বলিতে লাগিল। এই রাগে ঘৃতাহুতি পড়িল নীচে আসিয়া। নীচে তখন কয়েকটি বান্ধবী ও তাহার দাদার সঙ্গে সুনীতি মোটরে চড়িতেছিল—মার্কেট হইতে জিনিষপত্র কিনিয়া আনিবে বলিয়া। গাড়ীর ড্রাইভারের পরিবর্ত্তে সুবোধ স্বয়ং 'ষ্টিয়ারিং হুইলের' উপর হাত রাখিয়া বসিয়া ছিল—সেই স্বয়ং চালাইয়া লইয়া যাইবে। গাড়ীখানা চলিয়া গেলে ভাঁড়ার ঘরের প্রাঙ্গণে সমবেত মেয়েদের কাছে সুভাষিণী কহিল,—মাগো, এ কেমনতরো খৃষ্টানি কাণ্ড! এমন জান্‌লে আমি এ বিয়েতে আসতাম্ না। দু'চক্ষে এ-সব দেখতে পারেন না উনি।

সুনীতির বান্ধবী মঞ্জু বলিল,—কেন সুভাদি', এতে এত নিন্দের কি পেলেন? সুনীতির জুতো-জামা-কাপড়—যা সে নিজেই ব্যবহার করবে, তা ওর নিজের রুচি এবং পছন্দ-মাফিক কেনাই উচিত নয় কি? তা' ছাড়া, একা তো আর যায়নি। সঙ্গে দাদা গেছেন, বন্ধু-বান্ধবীরা গেছে। আপনার 'উনি'ই বা দু'চক্ষে ও-সব দেখ্‌তে পারেন না কেন?

সুভাষিণী ক্রোধ ও বিরক্তিতে মুখখানা হাঁড়ির মত করিয়া চা-দানি হইতে পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিলেন। রেবা কৌতুক-হাস্যে কহিল,—কাল আমরা দম্‌দমের বাগানে চড়িভাতি কর্‌তে যাচ্ছি। সারা দিন হল্লা, গান, আমোদ ক'রব। আপনাকেও যেতে হবে সুভাদিদি! তবে যদি নেহাৎ না যান, নারায়ণীকে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না, সঙ্গে নিয়ে যাব।

সুভাষিণীর একাদশবর্ষীয়া কন্যার নাম নারায়ণী। সুভাষিণী তীব্র

কণ্ঠে কহিলেন,—না না, গেরস্তর ঘরের মেয়ের উপযোগী শিক্ষা-দীক্ষাই ওকে দিতে দাও বাছা! তোমাদের ও-সব বেহায়াপণার মাঝে ওকে আর টেনো না। তা' ছাড়া, উনি এ-সব একেবারেই ভালোবাসেন না। শুন্‌লে রাগে জ্বলে উঠ্‌বেন।

রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে আসিয়া সুভাষিণী ত্রৈলোক্যনাথকে বলিলেন,—বিয়ের পরের দিনেই আমি চলে যাব বাপু! এই তিন-চারটে দিন কোন রকমে কাটাতে পারলে বাঁচি। তুমি এই কয়েকটা দিন থেকে যাও, একেবারে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। নিজের বাপের বাড়ী হ'লে কি হয়, দশ বছর আসিনি, এমন সব ব্যাপার দেখ্‌তে হবে, তা কি জানতাম? আমার নিজেরই যেন দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে।

ত্রৈলোক্যনাথ স্ত্রীর এই কথায় যৎপরোনাস্তি খুসী হইয়া কহিলেন,—আমিও জান্‌তাম না, জান্‌লে ত্রৈলোক্য ঘোষাল কখনও এ-বাড়ীতে পা দেয়? সে যাই হোক, যখন এসে পড়া গেছে, তখন বিয়েটা চুকে যাওয়ার আগে চ'লে গেলে, সেটা ভারি খারাপ দেখাবে। বিয়েটা চুকে গেলেই দুর্গা-দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড়ব।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ কি মনে পড়িয়া যাওয়ায় ত্রৈলোক্য বলিলেন,—আজ সন্ধ্যাবেলায় জানালার ধারে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? এই নিয়ে আমার কাছে কত গালাগালি খেয়েছ, বোধ হয় মারও খেয়েছ; কুলবধূ যে, তার জানালার ধারে দাঁড়ানো কেন? পই-পই বারণ করেছি······

ত্রৈলোক্যের গলার সুর ক্রমশঃ চড়িতে লাগিল। পাশের বিছানায় শায়িত ছেলে-মেয়ের দিকে তাকাইয়া সুভাষিণী ভীত কণ্ঠে কহিল,—না, ইচ্ছে ক'রে দাঁড়াইনি, 'বন্দে মাতরম্' গান গাইতে-গাইতে এক দল লোক শোভাযাত্রা ক'রে যাচ্ছিল। কত রকম বাজনা, কত লোক! সবাই গেল তাই দেখ্‌তে। সুনীতি, মা, সবাই ডাকাডাকি করছিল, তাই···

ত্রৈলোক্য গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—করুক ডাকাডাকি। ওরা সব গেরস্ত ঘরের কুলবধূ না কি? ওরা যে কি, তা আর বলবো না। কিন্তু খবরদার বল্‌ছি, আর যেন আমাকে সাবধান ক'রে দিতে না হয়! সামলে চ'ল।

কোলের খোকাটি চেঁচামেচি শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিবার জন্য সুভাষিণী সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

ত্রৈলোক্য নিজের বিছানা হইতে হাঁকিয়া বলিল,—কাঁদুনে ছেলেটাকে ঘুম-পাড়িয়ে রেখে এসে আমার পা-খানা একটু টিপে দাও দিকি। ওঃ, ভারি কামড়াচ্ছে। এই ক'দিন না আছে নাওয়া-খাওয়ার নিয়ম, না আছে শরীরের যত্ন, গা-হাত-পা কামড়াবে তার আর আশ্চর্য্য কি! এস, টিপে দাও পা দু'খানা!

সুভাষিণী প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া বহু যত্নে নীরবে নতমুখে পতি-দেবতার পা টিপিয়া দিয়া বোধ করি বা জানালার সাম্‌নে দাঁড়ান পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিল। এমন সময় ক্ষমার মা দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল,—বড় দিদিমণি, তোমাকে মা একবার নীচেয় ডাক্‌ছেন। শীগ্‌গীর ক'রে এস। দেরী ক'র না বাপু!

ক্ষমার মা এ বাড়ীর পুরাণ আমলের বহুদিনকার দাসী। দরজা খুলিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেই ক্ষমার মা অনুযোগ করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল,—দিদিমণি যে একেবারে কুটুম্বেরও বেহদ্দ হ'য়েছ গা। কাল গায়ে হলুদ, এয়োরা সব জুটে রাত্তির থেকে ছিরি-গড়া, কুলো-সাজানো ক'রে রাখবে, তা নয়, সন্ধ্যে থেকেই ঘরে ঢুকে কপাট দিলে! ওনারা সব নীচেয় এসে কতক্ষণ বসে আছেন।

যদিও রাত হইয়াছিল, তথাপি বিয়েবাড়ীতে এ কিছুই নয়। নীচের হলঘরের মধ্যস্থলে অনেকগুলি সধবা মহিলা এয়ো হইয়া নানাপ্রকার

মাঙ্গলিক বস্তু লইয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন। আধুনিক অধিকাংশ আলোকপ্রাপ্ত হিন্দুপরিবারের মত সুনীতির বিবাহেও নিউ মার্কেটের লেশফ্রিল এবং হিল্‌তোলা জুতার সহিত উলু-দেওয়া, বরণডালা সাজানো, শ্রী-গড়া, আলিপনা দেওয়া—এ সবেরও বরাদ্দ ছিল।—সুভাষিণীর মা তখনও আসিয়া জুটিতে পারেন নাই, এবং স্বয়ং সুনীতিও অনুপস্থিত। মোটরে চড়িয়া সেই যে মেয়ে মার্কেটে গিয়াছে, তার এখনও পর্য্যন্ত দেখা নাই! সমাগত মহিলাদের মধ্যে সব শ্রেণীর মেয়েই ছিলেন। পাশেব বাড়ীর পোষ্টাফিসের কেরাণীব স্ত্রী হইতে সুরু করিয়া মুন্সেফ-বাবুর এবং এস-ডি-ওর স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এ সকল মাঙ্গলিক কাজে সধবাদের প্রতিপত্তি খুব বেশী। পদ-মর্য্যাদা তাঁহাদের যাহাই হৌক না কেন, এই একটা দিনের জন্যই সে সব বিস্মৃত হইয়া কেবল মাত্র সীমন্তিনী—এই গৌরবেই তাঁহারা একাসনের অধিকারিণী।

কেরাণীবাবুর বৌ একটু বাঁকা-সুরে জনান্তিকে কহিলেন,—বড় লোকের বাড়ীর কাণ্ড-কারখানাই আলাদা বাপু! এ-সব লক্ষণের কাজ, মঙ্গলের কাজ। এই সব ভালো ক'রে কর, তা নয়, বুট জুতো আর জর্জ্জিয়েট কিন্‌তে মোটর নিয়ে রাতদিন দৌড়াদৌড়ি! এ-সব নইলে নয়, তাই যেন নমো-নমো ক'রে কোন রকমে দায় সারা! দেখ না, এই কতক্ষণ থেকে বসে আছি, তা না-আছে মেযেব মাযেব দেখা, না-আছে ক'নের পাত্তা। তাও ভালো যে, ভাই, তুমি এলে।

সুভাষিণীর নিজের মনের ভিতরটাও পুড়িতেছিল, তাই কেরাণীর বৌয়ের কথায় সায় দিয়া কি একটা কথা বলিতে গিয়াই অকস্মাৎ খোলা জানালা-পথে নীচের গেটের দিকে তাঁহার নজর পড়িয়া গেল। তীব্র বৈদ্যুতিক আলোকে সমস্ত কম্পাউণ্ড ও বাগানটা আলোকিত হইয়াছিল। একটা মোটর আসিয়া তথায় দাঁড়াইয়াছে। সুনীতির সহপাঠিনী বান্ধবীরা এবং তাহার দাদাও একরাশ জিনিষপত্র নামাইতে ব্যস্ত।

সুনীতি সলজ্জ স্মিতমুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে, সুবোধ গাড়ী হইতে না নামিয়াই সাম্‌নে একটু ঝুঁকিয়া-পড়িয়া প্রকাণ্ড একটা গোলাপের তোড়া তাহার হাতে দিতেছে। আলোর তলায় সুবোধের মুখ স্নেহ, মুগ্ধতা এবং অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যের রেখাপাতে অপূর্ব্ব মনে হইতেছে। এই দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ অল্পক্ষণ পূর্ব্বেকার তাহার নিজের শয়ন-কক্ষের দৃশ্য—সেই জানালার সাম্‌নে দাঁড়ানোর জন্য ত্রৈলোক্যের অশ্লীল, অকথ্য ভাষণ,—সেই তাহার ভীত লজ্জিত ভাবে, এগারো বছরের মেয়েটা জাগিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইবে কি না, ভাবিয়া ব্যাকুল হওয়া—সমস্তই চোখের সামনে যেন ছবির মত ভাসিয়া উঠিল। এই ছবিই তো তাহার জীবনে চিরাভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ন'বছর বয়স হইতে এই ছবির মাঝে অহরহ বাস করিয়া বরঞ্চ এমন হইয়াছিল যে, ইহার চেয়ে অন্য রকম কিছুর আভাসেই তাহার নাসাগ্র কুঞ্চিত, এবং রসনা প্রখর হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ বাগানের অজস্র আলোকের ঝর্ণাধারার মাঝে এবং ফুলের মদির সৌরভের পটভূমিকায় সমুখের ঐ ক্ষণিক দৃশ্যটুকুতে তাহার হঠাৎ দুই চোখ জ্বালা করিয়া জল আসিয়া পড়িল। কেরাণীবাবুর স্ত্রীর কথায় সায় দেওয়া আর হইল না। বরঞ্চ যে সব অত্যুগ্রকঠিন কথাগুলা রসনাগ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহারা যেন কোন উষর মরু-ক্ষেত্রে মুহূর্ত্তে মিলাইয়া গেল, এবং যে তৃষ্ণার বিন্দুমাত্র আভাসও সে জীবনে অনুভব করে নাই—সেই তৃষ্ণা যেন সর্ব্বগ্রাসী হইয়া তাহার মনের ভিতরে মোচড় দিয়া উঠিল।

চির নবীন

শীতকালের সকাল বেলাটি কী মধুর হয়েই না দেখা দিয়েছে। সোণার বর্ণের রোদের ছটা এসে আমলকী তলায় পড়েচে, সেখানে বুধি গাইটা বাঁধা আছে, বেচারী রোগা হয়ে গেছে। সুধীরা করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবচে, বেচারা খেতে পায় না ভালো করে, তাই না রোজ রোজ এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। আজ আমি যেমন করে পারি মা'র কাছ থেকে কপির পাতা চেয়ে এনে দেব। শিশির ভেজা ঘাসের উপর ক্রমশঃ সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েচে। সুধীরার বয়স মোটে সাত আট বছর। তার আলেষ্টারের সাত আট জায়গায় রিপু করা, দু'এক জায়গায় তালি লাগানো। তবুও সে অবাক নয়নে শীতপ্রভাতের মেঘলেশহীন আকাশ ও সুপ্রচুর আলোর দিকে চেয়ে আছে। মনে এসে লাগচে একটা খুসীর আমেজ।

তাদের বাড়ীটা একটা পোড়ো আমবাগানের মধ্যে। এ দিকটা একেবারে ফাঁকা, লোকের বসতি প্রায় নেই বললেই চলে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তা গঙ্গার ধার অবধি গিয়েছে। গঙ্গা এখান থেকে এক মিনিটের রাস্তা। যেখানে বুধি গাই বাঁধা আছে সেই-খানে দাঁড়িয়ে সুধীরা গঙ্গার শীত-সঙ্কুচিত শীর্ণ চেহারা, আর সাদা বালির চড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই পুরান বে-মেরামত একতলা বাড়ীখানি খুব শস্তা ভাড়ায় পেয়েচেন বলে উকীল বিজয়বাবু নিয়েচেন। এই বছর নিয়ে ঠিক ছ'বছর হোল তিনি পশ্চিমের এই নামজাদা শহরটিতে ওকালতী করতে আরম্ভ করেচেন। প্রথমে অনেক আশা ছিল, আদর্শ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন আশার পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এমন হয়েচে যে, তাঁর ওকালতীর আয় থেকে তাঁর সংসারটা চলে গেলেই তিনি খুসী।

আব বড বেশি কিছু চা'ন না। অথচ তাও চলচে না। আজ ছ'মাসের বাড়ী ভাডা বাকী, মুদীব দোকানেদেনা। ঠিকে ঝি একটা ছিল, সেটাকেও তাঁব স্ত্রী মালতী কতদিন হোল ছাড়িযে দিযেচেন। নিজেব হাতেই সব কাজ কবেন। বাসন মাজা থেকে আবম্ভ কবে—বান্না কবা, কাপড কাচা, ঘুঁটে দেওযা, সবই। এততেও কিন্তু খবচ চালানো যাচ্ছে না।

বান্না ঘবেব দাওযায একখানা দীর্ণ কম্বলেব আসন পাতা, সামনে কলাই কবা গোটা তুই চাযেব পেযালা, একটা চাযেব কেট্‌লি। একটা পেযালায অনেকখানি অ-পীত চা পডে বয়েচে। মালতী বিষণ্ণ মুখে কপিব শাক এবং ডাঁটা দিযে একটা তরকাবী বনিযে রাখচেন। এই একটুখানি আগেই স্বামী এসেছিলেন, এসে ঐ আসনে বসে চাযেব পেযালাটি সবে-মাত্র হাত তুলে নিযেছিলেন। মালতী ভযে ভযে মৃহুস্ববে বললে, "ওগো, শোন, বাডীওযালাব মা আজ আবাব খুব ভোবে গঙ্গাস্নানেব পথে এইখানে এসে আমাকে যা নয তাই বলে গেলেন। ক'টাই বা টাকা বাকী। দিযে দাও না।"

বিজযকুমাবেব প্রকৃতি খুব শান্ত। বিযেব পবেব প্রথম কযেক বছব মালতী মনেও কবতে পারে না, তিনি কোনদিন একটি গডা কথা বলেচেন। কিন্তু ইদানীং হযে উঠেচে অন্য বকম। বাতদিন সংসাবেব প্রকাণ্ড দাযিত্ব এবং অর্থকষ্টেব সঙ্গে লডাই কবতে তাঁব প্রকৃতি অসহিষ্ণু হযে দাঁডিযেচে। অল্পতেই হয রেগে ওঠেন, হঠাৎ যা তা ব'লে ব'সেন। স্ত্রীব এই ভীত করুণ অনুযোগ শেষ হতে না হতেই তিনি বারুদেব মত বিস্ফাবিত হযে উঠ্‌লেন, হাতের পেযালা জোব কবে সুমুখেব দিকে ঠেলে দিযে বললেন, "তুমি কী মনে কবেচ? আমি কি ইচ্ছে কবে বাডী ভাডাব টাকা দিচ্ছিনে, তুমি কি মনে কব আমি অনেকগুলো টাকা লুকিযে বেখে সবাইকে ফাঁকি দিযে মিথ্যে কবা বলে বেডাচ্ছি? তা মনে কববে না কেন বল? এ তোমাবই উপযুক্ত কথা হযেচে। তোমাব হাডে লক্ষ্মী

নেই। সংসারে কত কত মেয়ে দেখা যায়, যাঁরা ঘরে পা দিতে না দিতেই ঘরের অবস্থা ফিরে যায়। সংসারের শ্রী উথ্‌লে ওঠে। তাই না, কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। আর তোমাকে দেখো না, যখন থেকে তোমাকে বিয়ে করেচি, দুঃখ কষ্টের আর পার নেই।

বাড়ী ভাড়ার টাকা আমি লুকিয়ে রাখি নাই গো, লুকিয়ে রাখি নাই। তোমাদের জন্যে এবারে আমাকে ছুটে কোন এক দিকে পালাতে হবে।

মালতী আব দ্বিতীয় কথা বলে নাই। চুপ করে বিবর্ণ মুখে নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা ঢালছিল, বিজয়বাবু হঠাৎ আসন থেকে উঠে পড়ে আলনা থেকে মান্ধাতার আমলের পুরাণ গায়ের কাপড়খানা টেনে নিয়ে দ্রুতপদে বাব হয়ে গেলেন। রুটির রেকাবি, আর চায়ের পেয়ালা, তাঁর অমনি পড়ে রইল। মালতীর চোখ দিয়ে টপ টপ কবে জল পড়তে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মসংবরণ করে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সংসাবের শত সহস্র করাল বাহু যেখানে উদ্যত সেখানে মনভাব নিয়ে বসে থাকবাব, সৌখীন শোক করবার অবসর তাদের মত অবস্থার লোকেদের রয়েচে কি? ...উনুনে আঁচ ধরে উঠেচে, ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে সে যা হোক একটা কিছু তরকারী বনিয়ে নিতে বসেচে, এমন সময় সুধীরা কাছে এসে বললে, "মা, বুধি খেতে পায় না। রোগা হয়ে গেছে কত, তাকে কপির শাক দেবে না মা?"

মালতী মেয়েকে তাড়া দিলেন, "না, না, গরুকে দিয়ে নষ্ট করতে হবে না। ওতে তরকারী হবে।"

সুধীরা তবুও একটুখানি জিদ করবার উপক্রম করতেই ঠাশ ঠাশ করে তার মা তাকে মেরে ব'সল। সুধীরা অবাক হয়ে তার মায়ের দিকে চাইল, যেন কাঁদতে ভুলে গেল। অভিমানে স্তব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলে গেল।

এব পবে মালতীর হাতের কাজ আর চলে না। সংসারের ভূমিকা

প্রকাণ্ড একটা ভারের মত তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল। শীতের স্বচ্ছ শীর্ণ গঙ্গা—বহুদূর বিস্তৃত শুভ্র বালুচর এবং তীরপ্রান্তবর্ত্তী কাশগুচ্ছের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। আকাশে কী অমলিন সূর্য্যালোক, পৃথিবীতে যদি এত সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির মাঝে এত শান্তি, তবু মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে এত কষ্ট কেন? রান্নাঘরের একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে শূন্য মনে বাইরের দিকে চেয়ে এই প্রশ্নটাই মালতীর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগ্‌ল।

ঐ একটিমাত্র মেয়ে, কত আদর যত্নে মানুষ করেচে তাকে, প্রথম যখন সে হয়, অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঝরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে যেয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে খুকীর কথা মনে করে, তাকে কেমন করে মানুষ করবে, তাকে কত ভাল করে শিক্ষা দেবে, কি আদর্শে মানুষ করবে; এই চিন্তা নিয়ে কত নিশুতি প্রহর কাটিয়ে দিয়েচে। তাকেই আজ প্রায় বিনা কারণে নির্দ্দয়ভাবে মেরে ব'সল।

সকাল থেকেই আজ মনটা ভাল নেই। সুধীরাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্নান করিয়ে খাইযে দিয়েছে। স্বামী আজ সকাল্ সকাল কোর্ট চলে গিয়েছেন। মালতী চুপ করে নিজের ঘরে বসে আছে। উপস্থিত অনেকখানি সময়ের জন্য আর হাতে কোন কাজ নেই। মনটা তাই কত কি না ভাবচে। সামনের পতিত জমিটা ভাগে দেওয়া হয়েচে। মালীবৌ আর মালী দু'জনে মিলে তাতে সিঁচ করচে, শীগ্‌গীর বাঁধা-কপির আর মূলার চারা লাগাবে বলে। ইঁদারা থেকে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার থলিতে করে বলদকে দিয়ে তারা জল তোলাচ্ছে। আর নালা দিয়ে বয়ে বয়ে সমস্ত ক্ষেতময় জল আসচে। জল তোলার একটা এক-টানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ দুপুর বেলার নিস্তব্ধ প্রহরগুলির নিঃশব্দতাকে আরও ঘনীভূত—আরও প্রগাঢ় করে তুলেচে। সুধীরা চটি পায়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মায়ের উপর থেকে অভিমান তার এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

মালতীর মনে পড়ছিল এমনই শীতকালে, তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সাতাশে অগ্রহায়ণ তার বিয়ে হয়। বিয়ের দিনে তার এত শীত করছিল, বেনারসী কাপড়, এক গা গয়না···কিন্তু কি একটা অজানা পুলক, বিস্ময, ভয়ে বুকটা কাঁপছিল। শীতে ইচ্ছা করছিল, খুব গরম একটা আলোয়ানে সমস্তটা মুড়ে চুপটি করে বসে থাকে। সেদিনও বাতাসে এমনই হিমগন্ধী শিশিরভেজা আদ্র´তা ছিল। বাইরে অনেকক্ষণ থেকে একটা মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে। সুধীরা দৌড়ে এসে বল্লে, “মা মা শান্তি মাসীমা এসেছেন!” শান্তি দেবী এই পাড়ারই বিখ্যাত উকীল শ্রীশবাবুর পুত্রবধূ। মালতীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অনেকদিনেব। অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও মালতীর মধুর স্বভাব এবং গুণের জন্য শ্রীশবাবুব পরিবারে তার অত্যন্ত সমাদর ছিল।

চওড়া কালোপাড়ের শান্তিপুরি শাড়ী পরে একজন সুন্দরী মোটাসোটা মহিলা ঘরে ঢুকে ব’ললেন, “চল, চল, তোকে নিতে এসেচি। এদিকে ভারি মুস্কিলে পড়েচি ভাই, কলকাতার এক জায়গায় আমার ছোট ননদ ইলার বিয়ের কথাবার্ত্তা চ’লছিল। তাদের অনেকদিন থেকেই দেখতে আসবার কথা ছিল, আজ হঠাৎ এসে পড়েচে। ববের মামা, এক বন্ধু, আর বর নিজে। এইমাত্র এগারোটার ট্রেণে নামলো। মা বাড়ী নেই, বাবা কোর্টে গিয়েছেন! আমি তো ভেবে অস্থির। বাবাকে আর ওঁকে কোর্ট থেকে আসবার জন্য খবর পাঠিয়ে দিয়ে—আর ওঁদের নাবার খাবার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েই আমি তোর কাছে ছুটে আসচি। জানিস তো ভাই সবই, এদিকে সবটি ভালো হ’লেও ইলার রঙ্গের ততটা জৌলুষ নেই। তাই ভাবচি ক’লকাতার লোকের চোখে ধরলে হয়। মা আমার উপর সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে পুরী, মাছুরা, কাশী, বৃন্দাবন করে বেড়াচ্ছেন। যাবার সময় বলে গেলেন, ‘তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস বৌমা। তোমার হাতে এ সংসার

আমার চেয়েও ভালো চলবে এ যদি না বুঝতে পারতুম, তবে কি আর এত নিশ্চিন্ত মনে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম মা!'

এখন তিনি যদি এসে শোনেন, ইলাকে দেখতে এসেছিল, পছন্দ হয়নি, তাহলে কি মনে করবেন, ভেবে দেখ দিকি। ভয়ে আর ভাবনায় আমার হাতে পায়ে বল আসচে না। চল ভাই চল। ভালো করে তাকে সাজিযে দিবি, শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিবি। তোর মত করে আর তাকে কে সাজাতে পারবে বল।"

মালতী মৃদু হেসে বললে, "চল না ভাই, যাচ্ছি। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে যেন ছুটে এসেচ। ব'স না দু'দণ্ড। এক গ্লাস জল খাও, একটা পান···" "না রে না, আমার মরবারও ফুরসৎ নেই। আমার কথা কেমন করে বুঝতে পারবি বল। নিজে তো বেশ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস, সংসার বলতে একটি মাত্র মেয়ে, নিজে আর উনি। আমার মাথার উপরে একটা পাহাড়। দেওর, ননদ, নন্দাই, যা, বুড়ো শ্বশুর, একরাশ ছেলে মেয়ে, একপাল চাকর চাকরাণী। সকাল থেকে উঠে রাত বারোটা অবধি কেমন করে যে কাটে তা মোটে বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, তা দিবি তো একটা পান মোটা করে সেজে দে। দেখিস ভাই আমি জর্দ্দা খাই, এলাচ মশলা যেন পানে দিয়ে বসিস নে।"

মালতী পান সাজিতে সাজিতে দু'একমিনিট ইতস্তত করে অবশেষে বললে, "কিন্তু ভাই শান্তিদি, ওঁকে বলা হোল না। কাছারী থেকে ফিরে আসবেন—এসে হয়তো ভাববেন। তাই ভাবচি ওদিকে তোমাদের বাড়ী থেকে ফিরতেও বোধ হয় সন্ধ্যে হয়ে যাবে। শীতকালের বেলা···" শান্তিদেবী পান মুখে দিয়ে জর্দ্দার কৌটো খুলতে গিয়ে বললেন, "ওমা, সন্ধ্যেতেই আসবি কেমন করে, বিকেলের দিকেই তো ওরা দেখবে। শীতকালের বিকেল মানেই সন্ধ্যে, তখনই তখনই আসবি কেমন করে, সেই একেবারে রাত্রির খাওয়া সেরে আসবি। তোর ভাবনা নেই রে,

আমি বলে পাঠিয়েছি ওঁকে, বার লাইব্রেরীতে বিজয় ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁকে বলে দেবেন, বৌ আর মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছি আমাদের বাড়ীতে, রাতের আগে ছাড়া পাবেন না। কোর্ট থেকে সোজা তাঁকেও আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিয়েছি, সেইখানেই চা জলখাবার খাবেন।"

"এর মধ্যে তুমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেচ, আচ্ছা আমি তা হলে পাচ মিনিটের মধ্যে কাপড়খানা ছেড়ে আসি।"

কাপড় বদলিয়ে মেয়েকেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মোটরে উঠবার সময় শান্তি বললে, "আরে দেখ ভাই, 'সাঁঝের তারকা আমি'··· সেই গানটা দু'একবার ইলাকে তোর সঙ্গে নিয়ে গাইয়ে দি'স। তোব কাছ থেকেই গানটা শিখেছিল বটে কিন্তু তোর মত গাইতে পারে না। ওরা আবার গানও শুনতে চাইবে, এস্রাজ শুনবে,···আজকালকার ছেলে। সব দিকে দেখে শুনে নেবে। মস্ত বড়লোক—ক'লকাতার একজন নামজাদা বড় ডাক্তার হচ্ছে ঐ বরের বাপ। কাকা মস্ত বড় এটর্ণী, কাকার ছেলেপুলে নেই, ঐ ছেলেটিকেই নিজের ছেলের মত বড় ভালবাসে। পাত্রটিও এটর্ণী পড়চে, ভাবনা তো আর নেই। মনে জানে, পাশ কবে একবার বেরুতে পারলেই কাকা দাঁড় করিয়ে দেবে।"

মালতী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "বেশ তো, পাত্রটি দেখতে কেমন?"

"চমৎকার! এই তো যেয়েই দেখতে পাবি। আর সেইজন্যেই আমার ভাবনা হচ্চে বেশি—অত সুন্দর দেখতে নিজে, ইলাকে পছন্দ হবে তো। দেখা যাক, যা বরাতে আছে তাই হবে।"

গঙ্গার পাশের রাস্তা ধরে মোটর চলছে, ঝির ঝির বাতাস দিচ্ছে, মালতী একটি চওড়া কালো পাড়ের বাসন্তী রঙের শাড়ী পরেছিল, তাড়-তাড়িতে ব্রোচ দিয়ে মাথার কাপড় আটকিয়ে নেওয়া হয় নি, বাতাসে কাপড় খুলে আসচে মাথা থেকে, সুন্দর মুখের উপর অগোছালো চুলের

দু'একটি গুচ্ছ এসে পড়েচে। সেইদিকে তাকিয়ে শান্তি বললে, "তোর দিকে অবাক হয়ে চাই মালতী, কে বলবে যে তোর মেয়ে হয়েচে, তারও বয়স আবার সাত আট বছর। দেখলে মনে হয় যেন কচি মুখখানি, কতই বা আর বয়স। ইলা যদি তোর মত সুন্দর হোত, তাহলে আর আজকের দিনে আমাদের ভাবনার কী ছিল।"

মালতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললে। তার মনে দুটো ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল ; ইলা, তার বিয়ে হয়েচে সেই কলকাতার নামজাদা ডাক্তারের বাড়ীতে। ডাক্তার সাহেবের বড় আদরের পুত্রবধূ, এটর্ণী খুড়-শ্বশুরের ততোধিক আদরের বৌমা! কত রোমান্স, কত আদর, কত ভালোবাসা। আর সে নিজে, ছোটবেলায় সবারই মুখে শুনত বিয়ের আগে যে, তার মত সুন্দরী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তার বাবা তাকে অতি যত্নে লেখাপড়া, গানবাজনা, সেলাই, এমন কি রান্না আর ঘর-সংসারের যত কাজ অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিখিয়েছিলেন। সবাই একবাক্যে বলত, যেমন সুন্দরী—তেমনই গুণবতী মেয়ে, এ যার ঘরে যাবে, তার ঘর আলো হয়ে উঠবে। তার আঙ্গুলের ডগাগুলি ছিল পরম রমণীয়, রক্তাভ এবং চাঁপার কলির মত সুডৌল, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। একদিন সে বাপের বাড়ীতে তরকারী কুটছিল, দূরসম্পর্কের এক দিদিমা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "তোর ঐ আঙ্গুল কি ঘরকন্নার কাজের জন্য ভগবান সৃষ্টি করেছেন ভাই!" সেই তারই জীবনের স্বপ্ন আজ দু'দিন যেতে না যেতেই কেমন করে মিলিযে গেল। বাকী রইল কেবল হাড় পাঁজর বার করা দৈন্যের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা। রোমান্স, সে তো ওই সেদিনই তার জীবনে এসেছিল, যেদিন চাঁপা ফুলের গন্ধে তার স্বামীর তাকেই মনে পড়ে যেত। বিনিদ্র রাত্রির নক্ষত্রালোকের দিকে চেয়ে তিনি তারই স্নিগ্ধ ঘন পক্ষ্মময় চোখের গভীর অতলতার কথা ভাবতেন। ক'টা দিনই বা কাটল, আর তারই মধ্যে সব নিভিয়ে গেল।

তুচ্ছ বাড়ী ভাড়ার জন্যে বাড়ীওয়ালার বুড়ো মা রোজ দুবেলা অপমান করে যান, সেই কথাটা মাত্র স্বামীর কাছে বলতে যেয়ে সে কত বকুনি শুনল, তিনি কত কড়া কথা বললেন।

গঙ্গার দুপাশে সর্ষে আর অড়হরের ক্ষেতে রোদ এসে পড়েছে, ঝুরি নামানো বটগাছটার তলায় গোবৎস নিমীলিত নয়নে পরম আলস্যে আনন্দে মায়ের গাত্র লেহন করচে। ঐ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আনন্দের স্বাদ মালতী কতদিন ভুল গেছে, কতদিন ভুলে গেছে কেবল আনন্দের, কেবল উদ্বেগহীনতার মধ্য দিয়ে একটি দিন কাটিয়ে দেওয়া।

মোটরটা এসে শ্রীশবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়ীর গাড়ী বারান্দায় দাঁড়াল। উৎসবের একটা আয়োজন, একটা ব্যস্ততা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। চাকরেরা তোয়ালে, সাবান, স্পঞ্জ, হরেক রকমের স্নানের উপকরণ নিয়ে ছোটাছুটি করচে। গাড়ী থেকে নেমেই শান্তি দক্ষিণ দিকের ঘরখানার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে দিলে, "ঐ ঘরে কনে রয়েচে, যা ভাই যেয়ে দেখগে, কি কত দূর করতে পারিস। আমি চল্লুম একবার রান্নাঘরের ওদিকে, চপ আর দই মাছটা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না দেখিয়ে দিলে ঠাকুরের হাতে ঠিক মতটি হবে না। ওদিকে আর সময়ও নেই, বাবুরা স্নান করচেন!"

পাশের খাটের উপর একরাশি, কম করে বোধহয় বিশ ত্রিশখানা নানা রঙ্গের কাপড় আর পাঁচ ছয়টা গয়নার ছোট ক্যাশ বাক্স সাজানো রয়েচে।

মালতী ধীরপদে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখলে, খোলা জানালার কাছে ইলা একখানি বই হাতে করে ব'সে আছে, এই মাত্র তার মাথা ঘষিয়ে দেওয়া হয়েছে। একরাশি আর্দ্র এলো চুল থেকে ঘন সুগন্ধ উঠছে। কপোলে সলজ্জ অপরূপ আভা। তাকে দেখে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "এই যে আপনি এসেচেন ভাই। বৌদি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠে-

ছিলেন আপনাব জন্যে। দেখুন না তাঁর কাণ্ড!" আঙ্গুল দিয়ে সে পালঙ্কেব দিকে দেখিযে দিলে।

মালতীও সেইদিকে চেযে হেসে বললে, "তাঁব আব দোষ কি, সব মেযেমানুষকেই জীবনে এমনই এক আধবাব পবীক্ষা দিতে হয। আব সেই পবীক্ষাব সফলতা বিফলতাব উপব তাব সাবা জীবনেব অদৃষ্ট অনেকটা নির্ভব কবে। এমন দিনে কে না ব্যস্ত হয, কাব না বুক টিপ টিপ কবে বলো ভাই।"

ইলা আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল, তাব মুখেব উপব একটা মধুব ছাযা ক্ষণে ক্ষণে পডতে লাগল। হাতেব বইটা নাডাচাডা কবতে কবতে একটুখানি হেসে বললে, "আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলব—মালতীবৌদি, কাউকে বলবেন না তো?"

"না গো না, কাউকে ব'লব না। তোমাব মনেব গোপন কথা আমি কি আব কাউকে বলে দিতে পাবি। হাতে ওটা কি বই? ববিবাবুর 'মানসী'? বাঃ, বাঃ, এখনই আব 'মানসী' কবিতাব বই নিযে বসে না, ইলা। তুমি দেখছি বাডালে।"

ইলা লজ্জা পেযে বইখানা তাডাতাডি টেবিলেব উপব বেখে দিযে বললে, "কী যে বলেন বৌদি, তাব ঠিক নেই। আপনাবা এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন বৌদি, সেইটে আমি বুঝতে পাবচিনে।"—বলে ফেলেই ইলা গভীব লজ্জায তাডাতাডি মুখ নামালে।

মালতীব ভাবি ভাল লাগছিল দেখতে, কিশোবীব মুখে প্রেমেব এই নবারুণ বাগ। ভবিষ্যতেব একটা মধুব স্বপ্নে বিভোব হযে থাকা।

তাব আনত মুখখানি তুলে ধবে বললে, "ব্যস্ত হবাব কিছুই নেই ইলা?"

"না, না, তা আমি বলছিনে, আপনি বোধহয জানেন, এই যেখানে আমাব সম্বন্ধ হচ্ছে সেখানে অনেকদিন আগে থেকেই তা আবম্ভ হয়েচে।

ছোটদা আমায় একটা চিঠি দেখাচ্ছিল সেদিন, আপনি সেটা পড়বেন মালতীবৌদি ? পড়ে কিন্তু আমাকে আবার ফেরত দিতে হবে।”

রবিবাবুর চয়নিকার পাতার মধ্য থেকে ইলা সুদৃশ্য খামের একখানি চিঠি বার করে মালতীর হাতে দিলে। চিঠিখানি ইংরেজীতে লেখা। মালতী বেশ ভাল রকমই ইংরেজী জানত। পড়ে দেখলে, ক'লকাতা থেকে কে একজন অজিত ব্যানার্জ্জি লিখচে ইলার ছোটদাকে যে, ‘তোমরা অত উতলা হচ্ছ কেন বল দেখি। আমি ইলাকে ছাড়া আর অন্য কাউকে বিয়ে ক'রব না। সেই আমার ভাবী বধূ। একটু বঙ ময়লা ?...তাতে কী এসে যায় ? কেন সুকুমার কি জানে না—শ্যামল রঙই ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যের আদর্শ। সমস্ত মহাভারত যে দ্রুপদনন্দিনীর আসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা নিয়ে উচ্ছ্বসিত, সেই দ্রৌপদীই ছিলেন শ্যামলা, কৃষ্ণা। যেদিন ক'লকাতায় ছোট মাসীমাব বাড়ীতে ইলাকে দেখেচি সেইদিনই মনে মনে ঠিক করেচি, বিয়ে যদি কবতেই হয তোমাদের বাড়ীতেই কবব। অপর কোথাও নয। কিন্তু সে দেখাটা গোপনে তোমাব ষড়যন্ত্রে সংগঠিত হযেছিল। আমাদের বাড়ীর লোক এখনও কেউ সে কথা জানে না। তাই বাবা হুকুম দিয়েছেন, একবাব যথাশাস্ত্র কন্যা দেখার পর্ব্ব পালন করতে হবে, পাকাপাকি বিযেব কথাবার্ত্তার আগে। অতএব ডিসেম্বরের পাঁচুই চললাম দলবল সহ তোমাদের বাড়ীতে। দু'একদিনের জন্য অতিথি হতে। আমার কোনই আপত্তি নেই, সানন্দে রাজী হয়েচি, আর একবাব দেখা হযে যাবে। তার পরে আর একদিন খুব সমারোহ করে ঢাক ঢোল শানাই বাজবে, তোমরা যাকে বল—চারি চক্ষুর মিলন—তা'ও ঘটবে। কিন্তু আসল শুভদৃষ্টি বিনা আয়োজনে একদিন নিঃশব্দে তোমারই ষড়যন্ত্রে ঘটেছিল। সে কথা চিরদিনই আমার মনে থাকবে, আর সেজন্য চিরকাল তোমাব কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ভাই।”

মালতী হাসিতে আর কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠিখানা খামে বন্ধ করে ইলার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "ছোটদার চিঠিখানাও বুঝি তাই আর তাকে ফিরিয়ে দিতে মন সরচে না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরচে। যাক, তোর কপাল ভাল ভাই। যাই, আমি এ খবর শান্তিদিকে দিয়ে আসি। সে বেচারা ভাবনায় অস্থির হচ্চে।"

ইলা মালতীর আঁচল চেপে বললে, "কখনো না, এই না আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন কাউকে বলবেন না। বৌদি যদি ভাবেন, ভাবতে দিন না। তাঁর মত গিন্নী মানুষরা একটা ভাবনা ছাড়া থাকতে পারে না।"

"আচ্ছা ব'লব না। তুই খেয়েচিস ইলা?"

"অনেকক্ষণ। বাপ্ রে, আজকের দিনে বৌদির শাসনের অন্ত নেই। ঠিক সময়ে খাওয়া—ঠিক সময়ে বিশ্রাম, চাই-ই। নইলে যে মুখ শুকিয়ে যাবে। তাঁর জ্বালায় আর পারিনে। এদিকে নিজে ভূতের মত খাটচেন।"

"তা হোক, এ তাঁর আনন্দের খাটুনী।"

* * * *

বিকেলেব দিকে যখন গঙ্গার জলের উপর সূর্য্যের সোনালি আলো অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে পড়েচে, সেই গোধূলি বেলাকার স্বর্ণাভায় কনে দেখানো হ'ল।

ইলাকে মালতী আপন মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েচে। ঘন চুলের রাশি খোলা, দুপাশে সোণার ক্লীপ্ দেওয়া। বাঁদিকে একটি প্রীম্ রোজ গোলাপ দু একটি পাতা শুদ্ধ ক্লীপের সঙ্গে আটকান। সোনালি রঙের কাপড় কুঁচিয়ে সুন্দর করে পরান। সে কাপড়ের রঙ যেন পৃথিবীর উপরকার অবসন্ন স্বর্ণাভ আলোর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। গায়ে দু'চারখানি বাছাই করা স্বর্ণালঙ্কার।

মালতীর কল্পনা যেন এই সুসজ্জিতা সুশ্রী মেয়েটির পিছু পিছু সভাস্থলে

গেছে, কোন প্রিয মুগ্ধ হৃদযেব দৃষ্টিপাতে এই কিশোরী আরও লজ্জারুণ হযে উঠ্‌চে, এ যেন সে মনশ্চক্ষে দেখতেই পাচ্ছে।

ফিবে আসতে অনেকখানি রাত হযে গেল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষেব জ্যোৎস্না উঠেচে। শান্তি মালতীদেব গাড়ীতে তুলে দিতে যেযে উচ্ছ্বসিত হযে মালতীর হাত চেপে ধবে বললে, "তোব পয আছে বে, তুই না এলে আমি কি আব অমনই কবে সাজাতে পারতুম—না অত সব আমাব আসত। ওদেব মেযে খুব পছন্দ হযেছে ভাই। তোবই হাতেব গুণ। যাক আমাব একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল।"

মালতীব স্বামীও বিকেলে কোর্ট থেকে ফিবে এসে অবধি এতক্ষণ ওখানেই ছিলেন। বিজযকুমাব বললেন, "আজকেব সন্ধ্যেটা বাস্তবিক চমৎকাব কাটল! শ্রীশবাবুবা কী চমৎকাব লোক!" তাবপবে একটা নিশ্বাস ফেললেন। মোটবটা তখন জনবিবল তরুচ্ছাযাঘন নদীপার্শ্বেব পথ দিযে ছুটছিল।

মালতী প্রশ্ন কবলে, "কী ভাবচ?"

"ভাবচি আমাদেবই পুবাণ দিনেব কথা। ঐ যে ছেলেটি দেখতে এসেছিল, তাব চোখে স্বপ্নেব ছাযা, ঐ ছাযা একদিন আমাব আব তোমাব জীবনেও নেমেছিল। সে বোমান্সেব আভা কতদিন ফুবিযে গেচে।"

মালতী একটুখানি হেসে বললে, "দেখ, আমিও ঠিক ঐ কথাই কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলুম্। প্রথমটায মনটায একটু দুঃখ হযেছিল। কিন্তু তাবপবে হঠাৎ মনে হ'ল, সে স্বপ্ন, সে বোমান্স কি ফুবোবাব? ঐ মেযেটি আব ঐ ছেলেটিব জীবনে যা ফুটে উঠেচে, সে তো সে একই উৎস থেকে বইচে। ওদের ভিতর দিযে নিজেদেব জীবনকে যেন নূতন কবে আবাব আস্বাদ করলুম।"

"অনেকটা তাই।"—বিজয়কুমার স্ত্রীর একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে ব'ললেন, "অনেকটা তাই—সেই জন্যেই আজ সারা সন্ধ্যাটা এমন চমৎকার কাটল। মনে হচ্চে অনেক দিন পরে যেন একটা হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েচি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না মালতী সেই আগেকার দিনের মত, তেমনি সম্পূর্ণ তেমনি নিবিড় করে আমাকে তোমার জীবনে আবার ফিরিয়ে নেবে না? আজকাল কত তুচ্ছ কারণে —কত অকারণে তোমার মনে কষ্ট দিই। সকাল বেলাকার ব্যাপারটা মনে করে অবধি দুঃখে অনুতাপে আমার বুক ফাটচে।"

মালতী কোন উত্তর না দিয়ে স্বামীর হাতের বন্ধনের মধ্যে নিবিড়ভাবে নিজের হাতখানি সমর্পণ করে জ্যোৎস্নামষ রাত্রির দিকে চেয়ে রইল।

সুধীরা গাড়ীর গদীতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ীতে পৌছে মালতী মেয়েকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে যখন বিছানায় শুইয়ে দিচ্চে, তখন পাশের বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে কে রেকর্ডে একখানি গান দিয়েছিল,

"তোমায় নূতন করে পাবো বলে
হারাই অনুক্ষণ...............
ওগো আমার ভালবাসার ধন।"

সুধীরাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে খাটের বাজু ধরে মালতী তৃপ্ত মনে খানিকক্ষণ গানখানি শুনলে। তারপরে গান যখন থেমে গেল তখনও সেই গানের রেশ তার মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

সাধনার ফল

১

নমিতাদের স্কুলে যিনি নূতন হেড্‌মিস্ট্রেস্‌ হইয়া আসিয়াছেন, বয়স তাঁহার বেশি নয়; খুব বেশি হয় তো জোর কুড়ি কিংবা একুশ হইবে। কিন্তু বুদ্ধিতে বিদ্যায় ব্যক্তিত্বে মেয়েদের প্রিয় রেবাদি অতি আপন হইয়া উঠিয়াছেন। সেদিন ম্যাট্রিকের খবর বাহির হইয়াছে। স্কুলে খবর আসিয়াছে আগে। নমিতার রেবাদি মনের আনন্দ চাপিতে না পারিয়া গাড়ী-ভাড়া করিয়া একেবারে নমিতাদের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রকাণ্ড বড় বাড়ী এবং ততোধিক বৃহৎ সংসার। সামনের হাতায় কয়েকটি ছেলে মার্ব্বেল খেলিতেছিল। খেলা থামাইয়া একজন কহিল, ওরে গাড়ীতে ক'রে কোথা থেকে মেয়েছেলেরা বেড়াতে এসেছেন। ভিতরে পিসীমাকে খবর দিয়ে আসি।

আর একজন বলিল, খবর দিয়ে আর কি হবে, একেবারে সঙ্গে ক'রে ভিতরে নিয়ে যা না।

হেডমিস্ট্রেস্‌ মিস রেবা রায় এমনই একটি ছোট ছেলেকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া খিরকির দরজা দিয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিলেন।

তখন সকাল বেলা। আটটা কি সাড়ে আটটা হয় তো বাজিয়াছে। গৃহস্থের অন্তঃপুরে কাজকর্ম্মের একটা সন্ধিক্ষণ। সকলেরই ব্যস্ততার আর সীমাপরিসীমা নাই। ছেলেদের স্কুল-কলেজ আছে, বাবুদের কাছারি-আফিস আছে। কাহারও দশটা, কাহারও সাড়ে দশটায় ভাত চাই। মেয়েরা তরকারির ঝুড়ি, রান্নার জোগাড় লইয়া ব্যস্ত। নমিতা পিসীমার নির্দ্দেশমত কাচাকাপড় পরিয়া শুদ্ধ হইয়া আচারের হাঁড়ি রোদে দিতেছিল,

হঠাৎ রেবাদিকে দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল। দুই হাতে আচারের তেল হলুদ লাগিয়া রহিয়াছে, পরণের কাপড়টায় কালির দাগ। এবাড়ীর গৃহিণী বিধবা পিসীমা ন'হাতি থাট তসরের ধুতি পরিয়া মালা করিতে করিতে কাজ কর্ম্মের তদারক করিয়া ফিরিতেছেন। ন'বৌদির কোলের মেয়ে ক্ষেন্তিটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া বার্লির বাটি হাতে তারস্বরে কান্না জুড়িয়াছে। এই দৃশ্য ও এই পরিবেশের মাঝে রেবাদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া নমিতার মনে হইতে লাগিল, এই মুহূর্ত্তে যদি কোন উপায়ে মিস্ রায়ের চোখের সুমুখ হইতে সে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারিত তাহা হইলে ভগবানের কাছে আর কিছুই চাহিত না। কিন্তু ততক্ষণে মিস্ রেবা রায় তথায় আসিয়া আনন্দ-ঝঙ্কৃত কণ্ঠে কহিলেন, ম্যাট্রিকের রেজাল্ট বার হয়েচে, স্কুলে খবর এসেচে। নমিতা, তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ হয়েচ, আর পঁচিশ টাকা ক'রে স্কলারশীপ পেয়েচ। আই কন্‌গ্র্যাচুলেট্ ইউ। তোমার জন্যে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল হ'ল। খবরটা তোমাকে তাড়াতাড়ি দিতে ছুটে এলুম।

নমিতা অভিভূত হইয়া শুনিতেছিল, পিসীমা ওদিক হইতে ভীষণ ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, তোর রকমটা কি বল দেখি লা নমিতা! কাগে মুখ দিচ্চে না হাঁড়িগুলোতে। দেখতে পাচ্চিস না? লোকে কথায় বলে আচার, বিনা আচারে এসব জিনিষ দুদিনে পচে গোবর হয়ে উঠবে না। আসুক আজ বরেন বাড়ীতে। তোমার রাতদিন পড়া আর পড়া আমি বার করচি। একটি কাজ যদি পারার জো আছে এতবড় ধাড়ি মেয়েকে দিয়ে—বলিয়া তিনি রেবার দিকে অপাঙ্গে একবার ভ্রূকুটিকুটিল চক্ষে চাহিয়া সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে ঘন ঘন হরিনামের মালা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে নমিতার রাঙাবৌদির রুচি মার্জ্জিত এবং এখনও ছেলেপুলে হয় নাই বলিয়া ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

নমিতা তাহার রেবাদিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া সেই ঘরে একটি

চেয়ারে বসাইল এবং ইঙ্গিতে রাঙাবৌদিকে একটুখানি চা-জলখাবারের আয়োজন করিতে বলিল। ঘরের দেওয়ালে ক্যালেণ্ডারের ছবিতে মা কালীর একটি পট টাঙানো ছিল, সেইদিকে চাহিয়া মিস্ রেবা বলিলেন, আশ্চর্য্য নমিতা তুমি, এই বাড়ীতে এই আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও তুমি এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি! এ যেন কল্পনাতে আনতেও বাধে।

নমিতার মুখ লাল হইয়া উঠিল, কহিল, আমার বড়দা আর মেজদার কথা শুনি, তাঁরা নাকি সব বিষয়ে য়ুনিভার্সিটিতে রেকর্ড মার্ক পেয়েছিলেন। রাঙাদা সেই স্কুল থেকে এম-এ পর্য্যন্ত বরাবর ফার্স্ট হয়েচেন। ছোটদা প্রফেসারি করচেন, কর্ত্তৃপক্ষ শীগ্গীর ষ্টাডি লিভ দিয়ে নিজেদের খরচে তাঁকে বিলেত পাঠাচ্চেন। শিক্ষাবিভাগে এর মধ্যে তাঁর সুনাম হয়েচে খুব।

রেবা বাঁ চোখ একটুখানি কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আশ্চর্য্য তো! বাইরে থেকে দেখলে লোকে মনে করবে, একটা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবার। আর তোর ঐ পিসীমা, উনি তো রীতিমত ভীতির ব্যাপার। আমি তো প্রথমটায় ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম, এসেই বিপদ।

এমন সময় পিসীমার কাংস্যকণ্ঠ ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, ও রাঙাবৌ, একবার দেখে এস দিকি মা, নমিতা আবার কোথায় গেল। ওই খ্রীস্টানীকে ছুঁয়ে সেই কাপড়ে আবার সৃষ্টি একাকার করছে নাকি মা। এই ম্লেচ্ছর সংসারে আর আমার থাকা চলবে না দেখচি! আসুক আজ বরেন বাড়ী, আমার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিক। একটা মিনিটও আর আমার এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। রমেন আবার বলে বিলাত যাব।

রাঙাবৌ মিনতির সুরে বলিতেছে, আপনার পায়ে পড়ি পিসীমা, চুপ করুন। অত জোরে চেঁচাবেন না। উনি তো সামনেই আমার ঘরে বসে রয়েচেন, সমস্তই শুনতে পাবেন যে। তা ছাড়া, উনি খ্রীস্টানই বা হতে যাবেন কেন; শুনলে অবাক হবেন, উনি আমাদেরই জাত। এই বয়সে

বি-এ, বি-টি পাশ করেছেন। কত শিক্ষিতা। আজকাল কত ভদ্রঘরের মেয়ে চুপচাপ বাড়ীতে বসে কবে বিয়ে হবে সেই অপেক্ষায় না থেকে নিজেরা কাজ ক'রে উপার্জ্জন করচেন। এ তো আর কিছু মন্দ কাজ নয়। নমিতা যে ওর রেবাদির মহাভক্ত, ওর কাছেই সব শুনেচি কি-না।

পিসীমা উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, নাও আর মেলাই বাজে বোকো না মা। খুব ভালো কাজ। তোমাদের মাথায় রম্‌না এই সব ঢুকিয়েচে। বাবু নিজে বেলাত যাবেন, তাই বসে বসে বাড়ীশুদ্ধ সবাইকে বিবি বানানো হচ্ছে।

রাঙাবৌদির ঘরের খোলা জানালা-পথে সমস্ত কথাবার্ত্তাই শোনা যাইতেছিল। ক্ষোভে দুঃখে নমিতা উত্তরোত্তর ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। রেবা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর তো আমি থাকতে পারিনে নমিতা, স্কুলের বেলা হচ্ছে। তোমার পিসীমাকে বুঝিয়ে বোলো যে, তোমার পাশের খবরে ভারি আনন্দই হয়েছিল তাই খবরটা দিতে এতদূর এসেছিলুম। এছাড়া আমার অন্য অভিসন্ধি ছিলো না। বুঝিয়ে দিলে হয় ত বা তিনি অবিশ্বাস না-ও করতে পারেন।

নমিতা অনুনয় করিয়া কহিল, ওঁর অমনি কথা। আমরা তো অষ্টপ্রহর ঐ শুনচি। আপনি চলে যাবেন না রেবাদি। রাঙাবৌদি আপনার জন্যে একটু চা আর খাবার তৈরী করছেন। না খেয়ে গেলে তাঁর ভারি দুঃখ হবে।

রেবা গম্ভীর হইয়া কহিল, না, সে হয় না নমিতা। তুমি বুদ্ধিমতী, সমস্তই তো বুঝতে পারচ। সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অশান্তি ঘটাতে চাও কেন? তোমাদের বাড়ীর যে সব পাত্রে আমাকে খেতে দেবে, খ্রীস্টান বলে সেগুলো হয় তো ফেলা যাবে, তোমার পিসীমা···

দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের একটি সুশ্রী যুবা ঘরে ঢুকিল। নমস্কার করিয়া রেবার দিকে চাহিয়া বলিল, মাপ করবেন।

আপনারা দরকার হলে তো অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কথা বলেন, তাই আমি দুটো কথা আপনাকে গুছিয়ে বলার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলুম না। পাশের ঘরে বসেছিলুম আপনাদের কথাবার্ত্তা কানে গেল। আচ্ছা, এত অল্পেতেই চটে উঠেচেন কেন বলতে পারেন? কিন্তু কথা শুনিবে কি তাহার দিকে চাহিয়া রেবার চোখ আর কিছুতেহ ফিরিতে চাহিল না। কী দীপ্ত আভা সারা মুখে। প্রশস্ত ললাটে যেন বুদ্ধির আলো জ্বলিতেছে। দৃপ্ত তেজ এবং অত্যন্ত কমনীয়তার সমন্বয়ে সে মুখ অপূর্ব্ব।

রমেন তখন বলিযা চলিয়াছে, ভারতবর্ষের ইতিহাস তো পড়েচেন, দেখেচেন ভারতেব সাধনার ধারাটা কোন্ দিকে। কত বিরুদ্ধ সংঘাত, কত বিভিন্ন জাতিকে সে নিজের কোলে টেনে এনে সমন্বয়ে আনতে চেয়েছে। হিন্দু পরিবার সেই সাধনারই ছোট সংস্করণ। একথাটা যদি বুঝতেন, তা'হলে আমি হলফ ক'রে বলতে পারি,আজ কখনই রাগ করতে পারতেন না। আমাদের এই বাড়ীতেই দেখুন না—পিসীমা আছেন, নমিতা আছে, রাঙাবৌদি আছেন, আবাব আমিও আছি। প্রত্যেকেব স্বতন্ত্র মত, স্বতন্ত্র আদর্শ, তবু কাউকে বাদ দেবার উপায নেহ। পিসীমা আছেন তাঁর বড়ি, আচার, জপেরমালা, হাঁড়ি ইত্যাদি নিয়ে, নমিতা যাবে বেথুনে আই-এ পড়তে। তার মনটা ভাঁড়ারেব হাঁড়ি-কুঁড়ির বাইরে উধাও হয়েচে। আমিও শীগ্‌গীর স্টাডি লিভ নিয়ে বিলেত যাচ্ছি। প্রত্যেকেই কত আলাদা বলুন তো! তবু প্রত্যেকেরই এবাড়ীতে অক্ষুণ্ণ অধিকার আছে। একটা সমন্বয়ের সাধনা বুঝলেন না?

পিছন হইতে কে মিষ্টকণ্ঠে কহিল, খুব বুঝেচেন। কিন্তু ঠাকুরপো, এখন তোমার বক্তৃতা একটু থামাও ভাই, উনি চা খাবেন।

নমিতার রাঙাবৌদি চায়ের ট্রে ও জলখাবার লইয়া দুয়ায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন।

বাঙাবৌদি মিষ্ট হাসিযা কহিলেন, এটি আমাব ছোট দেওব, শ্রীযুক্ত বমেনবাবু। কিন্তু প্রফেসাবি কবতে কবতে এঁব ভাবি একটি কু-অভ্যাস হযেচে যখন তখন বক্তৃতা দেওযা। সাধাবণ ভাষায কথা বলতে যেন ভুলেই গেছেন। ও কি ছোটঠাকুবপো, রাগ কবলে নাকি? বমেন ঘব হইতে চলিযা যাইবাব উপক্রম কবিতেছিল, কহিল, না। কিন্তু আমাব ঘবেও শীগ্‌গীব এক পেযালা চা পাঠিযে দিও। দেখো যেন ঠাণ্ডা হযে যায না।

তাহাব কথায উপস্থিত সকলেই হাসিযা ফেলিল। নমিতা আশ্বস্ত হইবা দেখিল—তাহাব বেবাদিব আব বাগ নাই।

প্রস্থানোদ্যত বমেনেব দিকে চাহিযা বেবা কহিল, দেখুন, আপনাদের বাড়ীব এই সব বাসনে চা খেলে ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব সমন্বযেব সাধনা সেগুলো বাঁচাতে পাববে কি? আমাব ভয,আপনাব পিসীমাব ক্রোধানলে পুড়ে সেগুলো নষ্ট না হযে যায।

বমেন সগর্ব্বে কহিল, ভাবতবর্ষেব সাধনা কত অসাধ্য সাধন করেচে জানেন? এ আব তাব কাছে কি। নমিতাব কাছে শুনেচি, আব আজ নিজেও দেখলাম, আপনি তো আমাদেবই মত, আমাদেব চেযে কোথাও আলাদা নয। কিসেব সঙ্কোচ আপনাব।

বমেন চলিযা গেলেও তাহাব শেষেব কথাগুলি বেবাব দুই কান ভরিযা বাজিতে লাগিল এবং ফিবিবাব পথে অপমানেব সমস্ত জ্বালা নিভাইযা দিযা তাহাব সমস্ত মন এক অনির্ব্বচনীয মাধুর্য্যবসে কেন যে ডুবিযা বহিল তাহা কিছুতেই সে ঠাহব কবিতে পাবিল না। আসিবাব সময ঠাট্টা করিযা নমিতাব বাঙাবৌদি বলিযাছেন, আপনাব মত কাবো সঙ্গে যদি ঠাকুরপোর বিযে হয তবেই আশা আছে, নয তো আমাদেব মত মূর্খের কাছে অবি-শ্রান্ত বক্তৃতা দিযে দিযে সে যেমন বক্তৃতা দিতে শিখেচে চিবদিনই তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

একলা গাড়ীর গদিতে ঠেস দিয়া সেই কথাটা মনে হইতেই সে লজ্জায় অকস্মাৎ রাঙা হইয়া উঠিল।

২

সেদিন সকালের ডাকে রেবার নামে একখানা চিঠি আসিয়াছিল, খুলিয়া দেখিল কাকা লিখিয়াছেন।

"মা, একটা সুখবর আছে, আমিও সামনের মাস হইতে —পুরে বদলি হইয়াছি। তুমি বোর্ডিং ছাড়িয়া আমার বাড়ীতে এস, তবেই জানিব তুমি যে শহরে চাকরি করিতেছ তথায় বদলি হওয়া আমার পক্ষে সৌভাগ্যজনক হইয়াছে। আর একটা কথা মা বলি বলি করিয়াও তোমাকে বলা হয় নাই। অনেকেই মনে করে এবং কেহ কেহ প্রকাশ্যেও বলিতেছে, তোমার বাবা নাই বলিয়া আমি তোমার বিবাহের অযথা দেরী করিতেছি। কিন্তু লোকের কথায় কিছু আসে যায় না ; এ বিষয়ে তোমার মত যথার্থ-রূপে জানিবার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়া অবধি অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"

রেবার মনের মধ্যে কিছুদিন হইতেই একটা পরিবর্ত্তন কাজ করিতে-ছিল, চিঠিখানা পড়া শেষ হইয়া গেলে মুড়িয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া জানালার বাহিরে চাহিল। বিবাহের কথায় এতদিন সে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে, নেহাৎ যদি কল্পনায় কখনও সে কথা উঠিয়াছে তাহা হইলে নিরালা নিভৃত স্থানে কোন সিভিলিয়ান বা বড় চাকুরের বাড়ীর অজস্র আরাম এবং স্বাধীনতার ছবিটাই মনে জাগিয়াছে। কিন্তু এখন সর্ব্বদাই মনে যে দৃশ্য ভাসিয়া ওঠে তাহার স্বরূপ টের পাইয়া সে শিহরিয়া উঠিল। নমিতাদের বাড়ীর সেই অদ্ভুত গোঁড়ামি, সেই অসহ্য রুচি ও অসম্ভব কোলাহল, আর সে সমস্ত ছাপাইয়া একটি দৃপ্ত উজ্জ্বল আশ্চর্য্য সুন্দর মুখ।

কয়েক দিন আগে গঙ্গার ধারের চরটায় বেড়াইতে গিয়া দূরে রমেনকে পায়চারি করিতে দেখিয়াছে কিন্তু একটা ভদ্রতার নমস্কার মাত্র সারিয়া রেবা একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। নিজের মনকে যাচাই না করিয়া আর মুখোমুখি গল্প করিবার ভরসা তাহার হয় না।



সন্ধ্যার বিশ্রব্ধ অবকাশে বোর্ডিংয়ের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় সভা বসিয়াছিল। মিস্ বেলা গুহ একটা হাই তুলিয়া বলিলেন, নাঃ, আর ভালো লাগে না। রোজ রোজ সেই খাড়া বড়ি থোড়, আর থোড় বড়ি খাড়। তার উপর ফিফ্‌থ ক্লাস আর নাইন্‌থ্ ক্লাসের মেয়েরা এমন নির্জীব, এমন ডাল্ (dull), রোজ রোজ ওদের অঙ্ক কষাতে পারিনে, সে এক শাস্তি।

শিপ্রা মল্লিক বলিলেন, শাস্তিটা আর কার কম, চল না একদিন সবাই মিলে ওপারে পিক্‌নিক ক'রে আসা যাক। খানিকটা সময় ভালো কাটবে এই একটানা রুটিনের মধ্যে।

অরুণা রায় কহিল, মন্দ প্ল্যান নয়, গেলেও হয়। তোমরা সব বন্দোবস্ত কর না। কিন্তু রেবাদি, সেদিন আপনি যে ব্লাউজটা পরেছিলেন, কাইণ্ডলি সেটা আমাকে একবার লেণ্ড্ করতে হবে। ভারি চমৎকার প্যাটার্ন, তুলে নেব ভাবচি।

সুনীতি উচ্ছ্বাসভরে কহিল, নাও নাও, এখন তোমার প্যাটার্ন রাখ, কি চমৎকার সিনারি হয়েছে দেখ। গাছের আড়াল দিয়ে চাঁদ উঠচে, গ্লোরিয়াস !

বেলা অস্ফুট গদগদ কণ্ঠে কহিল, মাই গড্, হাউ লাভ্‌লি !

রেবাও বসিয়াছিল, এতদিন সে ইহাদেরই সঙ্গে গল্প করিয়া অবসর এবং চিত্ত-বিনোদন করিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার মনে হইতেছিল, জীবনের

সমস্ত গুরুদায়িত্ব ও বাস্তবতাবর্জ্জিত হইয়া পাঁচ বছরের ছেলে যেমন খেলনা হাতে উচ্ছ্বাসভরে চেঁচায়, অনর্থক বকে, অকারণে হাসে, ইহারাও যেন তেমনই করিতেছে। সত্যকার জীবনের সহিত ইহার কোথাও কোন যোগ নাই।

সুনীতি কহিল, শুনলুম রেবাদি, আপনি নাকি সেদিন সকালে নমিতাদের বাড়ী গেছলেন! কেমন লাগলো? ঐ জিনিষটি কিন্তু বাপু আমার আদৌ বরদাস্ত হয় না। ম্যাট্রিক ক্লাসের উষাঙ্গিনী অনেক জেদা-জেদি করায় একদিন তাদের বাড়ী গিয়েছিলুম। বাবা, সে কি গোলমাল, একপাল ছেলের চ্যাঁ ভ্যাঁ, বিরক্তিকর একেবারে। সেই থেকে আব কখনো কারো বাড়ী যাইনে বেড়াতে। ইচ্ছে হ'লে গঙ্গার ধারে বা খোলা মাঠে বেড়ালেই হ'ল। তাতে শরীর ও মনের উন্নতি হয়।

রেবা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, কেন, ছেলেপুলের একটু কান্নার উপর এত বিরাগ কেন? এরপর নিজের যখন হবে তখন গঙ্গার ধাবে গিয়ে কেমন ক'রে বসে থাকবে শুনি?

জবাব শুনিয়া সুনীতি, বেলা, অরুণা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল তাহারা, এই সেই রেবাদি! যাহার নিখুঁত আভিজাত্য এবং ওজন-করা কথা এতদিন তাহাদেব সপ্রশংস শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছে। তাহাদের এতদিনকার উপাস্য দেবতার সম্বন্ধে তাহাদের মত পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজন আসন্ন হইয়া উঠিল।

৪

প্রায় মাসখানেক হইল রেবার কাকা আসিয়াছেন এবং তাঁহাব কাছেই রেবা উঠিয়া আসিয়াছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তাহার কাকাকে চা দিতে বাহিরের ঘরের দিকে আসিতে আসিতে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বব

শুনিযা সে থমকিয়া দাঁড়াইল। খোলা জানালা স্পষ্ট চোখে পডিল, বমেন বসিযা তাহাব কাকাব সহিত গল্প কবিতেছে।

ভিতরে ঢুকিযা শান্তভাবে সে নমস্কাব কবিল।

বমেন হাসিযা কহিল, আমাদেব বাডীতে একদিন গিযে যা অভ্যর্থনা পেযেছিলেন আব যেতে সাহস হয না বোধ হয, না ?

বেবা গম্ভীব হইবাব চেষ্টা কবিযাও হাসিযা ফেলিযা কহিল, ঠিকই অনুমান কবেচেন। কিন্তু আপনাব সাহসেব তো কিছু অভাব দেখচিনে। ধরুন, আজ যদি সেই অভ্যর্থনাব শোধ নিই।

বমেন কহিল, তা হ'লে হয তো আপনাব মনেব ক্ষোভ খানিকটা কমে। কিন্তু উজ্জ্বল বাতিব আলোয বেবা স্পষ্ট দেখিল, বমেনেব হাসি মুখখানি একেবাবে ম্লান হইযা গেছে। কি একটা অত্যন্ত আশা কবিযা সে যেন হতাশ হইযাছে।

বেবা অনুতপ্তকণ্ঠে কহিল, ও কথাটা আমি তামাসা ক'বে বললুম মাত্র।

বমেন মৃদুস্ববে বলিল, আপনি কি মনে কবেন তামাসা আমি বুঝতে পাবিনে, বুঝিযে দেবাব প্রযোজন হয !

বেবা কহিল, তা খানিকটা মনে কবি বই-কি। আমাব মতে আপনি দুনিযাব মধ্যে এক ভাবতবর্ষেব ইতিহাসই সম্যকরূপে বোঝেন। আব কিছু বড একটা বোঝেন না।

বমেন অন্য দিকে চাহিযা কহিল, আপনি যে খুব বেশি বোঝেন তাও আমি মনে কবিনে। যে মানুষ অল্পেতেই বেগে যায সে ধীবভাবে বুঝবে কি ?

বেবা কহিল, বেশ, ঝগডা এখন থাক। যাই, আমি আপনাব চা নিযে আসি।

বেবাব কাকাবাবু ডাকিযা কহিলেন, অমনি চাযেব সঙ্গে কিছু খাবাব

নিয়ে এস রেবা। রমেনের সঙ্গে ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে রোজই যে আমার দেখা হয়। বড় ভালো, বড় জ্ঞানী ছেলেটি।

রমেন একটু হাসিয়া রেবার দিকে চাহিয়া কহিল, যান, এবার অতিথি সৎকারের আয়োজন করুনগে। কি আর কববেন বলুন—গুরুজনের আদেশ।

মাসখানেক পরে একদিন রেবার কাকা তাহাকে ডাকাইয়া ভূমিকা না করিয়াই কহিলেন, তোমার একটা মত না নিয়ে তো আমি হাঁ না কিছুই বলতে পাবিনে না মা। রমেনের বড়দাদা তোমাব সঙ্গে রমেনের বিবাহের প্রেস্তাব ক'বে পাঠিয়েছেন। বেশি দেরী করবার সময় নেই। রমেন সামনেব মাসে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে।

বহু চেষ্টা করিয়াও না শব্দটা বেবা কিছুতেই মুখে আনিতে পারিল না।

বিবাহেব পর রমেন বলিল, আমি তো চলে যাব, কিন্তু সে সময়টা তুমি থাকবে কোথায়? কাকার বাড়ীতে? সেই ব্যবস্থাই ভালো। রেবার চোখেমুখে কৌতুকহাস্য উচ্ছল হইয়া উঠিল, কহিল, কেন সে ব্যবস্থা ভালো কেন? আমার নিজের বাড়ী কি নেই যে কাকাব বাড়ীতে থাকবাব ব্যবস্থা হবে।

রমেন তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিযা কহিল, সত্যি তাই কি মনে কর? এইটুকু যদি সম্বল পাই তা হ'লে একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যায়। কিন্তু পিসীমা···

বেবা বাধা দিয়া কহিল, সে আমি জানি। পিসীমা একটু আচার বিচার মেনে চলেন বলেই যে নিজের বাড়ী ছেড়ে আমায় থাকতে হবে তার কোন মানে আছে কি?—তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, তা ছাড়া, এই ঘরটি ছেড়ে এখন বোধ হয় আর একটা রাত্রিও আমি অন্যত্র থাকতে

পারিনে। আমি যখন তোমার জীবনে ছিলাম না, তখনও এই ঘরে তোমার কত চিন্তা কত আশা ও আদর্শ নিয়ে দিন কাটিয়েছ। এর চারিদিকেই তো তুমি।

রমেন কি বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে থামাইয়া দিয়া রেবা হাসিয়া কহিল, দোহাই তোমার, আর এক দফা যেন ভারতবর্ষের ইতিহাস আর তার সাধনার পালা শোনাতে বোসো না। ঐ স্কুল মাস্টারি আমার ধাতে সইবে না। মাস্টারি জিনিষটার উপরই বিতৃষ্ণা ঘটেচে। অনেক করেচি কি-না, সেই জন্যেই বোধ হয়।

রমেন কহিল, না, ভারতবর্ষের সাধনার কথা আর বলার প্রয়োজন হবে না। কারণ সেই সাধনার ফল তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্চি সামনেই।

মৃত্যুর আলো

শিক্ষিত পবিবাব। শ্বশুর সবজজ পর্য্যন্ত হইযাছিলেন, সম্প্রতি পেন্‌সন্‌ লইয়াছেন। বড় ছেলে ডাক্তার, কলিকাতাতেই প্রাক্‌টিস করেন। মেজ ছেলেটি কিন্তু তেমন সুবিধা কবিতে পারে নাই, বি-এ পরীক্ষায কয়েকবার ফেল্‌ কবিযা এখন বাড়ীতেই আছে। ইন্‌সিওবেন্সেব দালালীর চেষ্টায আছে। ছোট ছেলেটি বি-সি-এস্‌ পবীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বড় এবং মেজ দুই ছেলের বিবাহ হইয়াছে। বড়বৌ আই-এ পাশ। মেজবৌ আই-এ পাশ করিয়া বি-এ অবধি পড়িয়াছেন। কলিকাতার বাড়ীতে একত্রে সকলে থাকেন। বাড়ীতে আধুনিক চালচলন। বাড়ীব মেযেরা বেণী দুলাইযা স্কুলেব বাসে চডিয়া ডায়োসেশন্‌ এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালে পড়িতে যায়। শাশুড়ি আছেন, সকালবেলায একবার তসরের কাপড় পরিয়া কোনক্রমে পূজা-আহ্নিক সারিয়া লওয়া ছাড়া আব কোন ব্যবহারে তাঁহার লেশমাত্র সেকেলে ভাব প্রকাশ পায় না। তিনি ফাবপোব রুটিও খাইতে আপত্তি কবেন না, বৌদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সিনেমাতেও যান এবং ক্লাবেব লাইব্রেবী হইতে বাংলা উপন্যাস আনাইয়া পাঠ করেন।

সকলেই মনে কবিতে পারেন এরূপ শিক্ষিত পবিবাবে নিশ্চয়ই সকলেই মার্জ্জিত, সুরুচিসম্পন্ন এবং বৌয়ে শাশুড়িতে ঝগড়া কিংবা জায়ে জায়ে ঝগড়া কখনো হয় না। অথচ এ মনে হওয়া যে কত বড ভুল মনে হওয়া, সে পরিবারে কিছুদিন বাস করিলেই তাহা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। বাইরে হইতে অবশ্য বুঝিবার যো নাই। সভ্যজগতেব সমস্ত কিছুই যেমন একটা কৃত্রিম মসৃণ আবরণে আবৃত হইয়া আপন আদিম আলজ্জতাকে ঢাকিতে চেষ্টা করে তেমনই এ পরিবারের ঝগড়াও সভ্য ঝগড়া।

কথা কাটাকাটি হয়, হিংসার সতীব্র ঝলক ঝলসিয়া উঠে, তীব্র চাপা ক্রূর হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া যায়। কিন্তু জোরে জোরে ঝগড়া গালি শাপ শাপান্ত এ সকল নাই। লোকে মনে করে বড় কালচার্ড, খুবই উদার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে নীচতার গ্লানি ঈর্ষার বহ্নি কিছুমাত্র কম নয়। সে বরঞ্চ আরও বেশি।

সেদিন ব্যাপারটা হইয়াছিল এইরূপ। বড়বৌ ইন্দু তাহার ছেলে মেয়ের জন্য গরম কোট তৈয়ারী করাইবে বলিয়া জামার কাপড় কিনিতে বাজার যাইবার প্রয়োজনে সোফারকে ডাকিয়া গাড়ী বার করিতে বলিল। বড়মেয়ে মীরাও মায়ের সঙ্গে যাইবে। কাপড়চোপড় পরিয়া একেবারে তৈরী হইয়া মা ও মেয়ে নীচের তলায় নামিতে যাইতেছে এমন সময় শাশুড়ি তারাসুন্দরী ডাকিলেন, অ বড়বৌমা একবার শুনে যাও।

আবার হয়তো নূতন কিছু ফরমাস হইবে মনে করিয়া অপ্রসন্নচিত্তে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ইন্দু শাশুড়ির ঘরে গেল।

শাশুড়ি বলিলেন, বৌমা, আমার অতুল আর লিলির জন্যেও একটা করে কোট করাতে হবে। (অতুল ও লিলি মেজবাবুর ছেলেমেয়ের নাম।) তা তুমি যখন নিজে বাজার যাচ্ছ তখন ওদের জন্যেও পছন্দ করে আনবে। হ্যাঁ, আর তা দেখ, হয়তো তোমার হাতে বেশি কিছু না'ও থাকতে পারে। এই দশ টাকার নোট দু'টো নাও। যদি না কুলোয় আরও কিছু লাগে পরে দিয়ে দেব। কিন্তু ওদের জন্যেও যেন এ'নো বাছা। ভুলে ব'সে থেকো না। কিংবা দেরী হ'য়ে গেলো ব'লে না আনা কোরো না।

বিরক্তিতে রাগে ইন্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু মুখে কিছু বলিতে পারিল না। শাশুড়ির হাত হইতে নোট দুইখানা লইয়া নিঃশব্দে তথা হইতে চলিয়া আসিল।

মীরা সিঁড়ির মুখে অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। মাকে দেখিয়া

বলিল, মা, যাবে না ? বারে, আর কত দেরী করবে ? এরপর আমার আবার স্কুল আছে। মা, আমার ফারকোট্‌টা কিন্তু আমাদের প্রাইজের আগেই করিয়ে দিতে হবে। সে বেশ হবে। আমি ফণীবাবুকে বলেচি, আজই বিকেলে দর্জ্জিকে খবর দিয়ে আসবেন।

ইন্দু গম্ভীরমুখে বলিলেন, আমার ভারি মাথা ধরেচে। আজ আর আমি বাজার যেতে পারব না। মীরা, তুমি সোফারকে বলে এসো গাড়ী গ্যারেজে নিয়ে যাবে। আর আমার দরকার নেই।

মীরা নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল এবং ড্রাইভারকে গাড়ী তুলিতে বলিয়া দশ টাকার নোট দুইখানা লইয়া ঠাকুমার ঘরে গিয়া তাঁহাকে ফেরত দিয়া মায়ের মাথা ধরার কথা জানাইল এবং সেই কারণে তিনি যে যাইতে পারিলেন না সে কথাও বিজ্ঞাপিত করিল। শুনিয়া নাত্‌নী শুনিতে না পায় এইরূপ মৃদু অস্ফুটস্বরে ঠাকুমা তাহার মন্তব্য করিলেন, "যত ঢং !"

ঘণ্টা দুই পরে গোটাকতক জরুরী 'কল' সারিয়া আসিয়া বড়বাবু শৈলেন যখন শয়নকক্ষে ঢুকিলেন তখন স্ত্রী নিতান্ত বিরসচিত্তে একটা সোফায় হেলান দিয়া শুইয়াছিলেন। সকালবেলায় এমন অসময়ে স্ত্রীকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া শৈলেনবাবু প্রশ্ন করিলেন, শুয়ে যে বড় ! তোমার শরীরটা কি আজ ভালো নেই নাকি ?

স্বামীর প্রশ্নের সোজা উত্তর না দিয়া কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া বড়-বৌ দার্শনিকের সুরে বলিল, আচ্ছা বলতে পাবো তোমাদের বাড়ীতে দু'রকম ব্যবহার কেন ?

ভূমিকাটা কিসের ঠিক আন্দাজ না করিতে পারিয়া শৈলেন আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া টাইটা খুলিতে লাগিল। একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বড়বৌ সকালবেলাকার ঘটনাটায় ডালপালা দিয়া বর্ণনা করিয়া বলিল, আচ্ছা, ওদেরও ঠাকুমা আর মীরা নীলুরও ঠাকুমা। কিন্তু আমার

ছেলেমেয়েদের আজ অবধি কখনও একটা জিনিস কিনে দিতে দেখলুম না, তাদের কথা কখনো ভাবতে দেখলুম না। কেন ওরা কি কেউ নয় না কি? সত্যি এক এক সময় আমি সহ্য করতে পারি নে। এত একচোখোমি, এত দুই দুই ভাব কেন?

শৈলেন স্যুট ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া কহিল, তুমি ঠিক বুঝতে পারো নি। অক্ষম ছেলের উপর মায়ের টান বরাবরই একটু বেশি হয়। ললিত নিজে বিশেষ কিছু করতে পারে নি। এতদিনে একটা ইনসিওরেন্সের এজেণ্ট হয়ে সামান্য কিছু পাচ্ছে। স্বভাবতঃই তাই মায়ের ভাবনাটা ওদের জন্যেই সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকে। এতে ভালোবাসার তফাতটা কোথায় দেখলে? ছি, এত ছোট কথায় চঞ্চল হতে নেই।

বড়বৌ কিন্তু স্বামীর কথায় আরও রাগিয়া উঠিয়া কহিল, কী যে বলো তার মাথা মুণ্ডু নেই। মেজঠাকুরপো কিছু করতে পারলেন না, তার জন্যে তো আর আমরা দায়ী নই। ঠাকুর ওঁর পিছনেও কিছু কম টাকা ঢালেন নি। ক্ষমতা না থাকলে আর কি হবে। একচোখোমি করবার জন্যে ওটা কিছু স্বপক্ষে যুক্তি হ'লো না। আসলে মেজবৌ আরও শিক্ষিতা আরও সুন্দরীও নিশ্চয়। সবাই তাকে ভালোবাসে। আমাকে আর আমার ছেলেমেয়েকে কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারে না!

মেজবৌ কিরণময়ী নিখুঁত সুন্দরা। যখন বেথুনে থার্ডইয়ারে পড়িত তখন তাহার বিবাহ হয়। অনেকখানি আশা লইয়া এবাড়ীতে আসিয়াছিল, কিন্তু একটা আশাও সফল হয় নাই। স্বামী সুন্দরী স্ত্রী পাইয়া এমনই মাতিয়া উঠিলেন যে উপর্যুপরি দুইবার ফেল করিয়া তৃতীয়বারে বিদ্রোহ করিয়া বলিলেন—আবার পড়িতে বলিলে বাড়ী ছাড়িয়া যেখানে খুসী চলিয়া যাইব। তখন কিরণের ছেলে ও মেয়ে হইয়াছে। শ্বশুরবাড়ী অবস্থাপন্ন। তবুও চোখের সামনে বড় ভাসুর অজস্র রোজগার করি-

তেছেন, দিন দিন তাঁহাব পসার বাড়িতেছে এবং বড জা অবচ্ছল খবচ কবিতেছেন ও সে খবচেব একটা পয়সাও শ্বশুর বা শাশুড়িব অনুগ্রহলব্ধ নয সমস্তই স্বামীব উপার্জ্জন। সে ক্ষেত্রে নিজেব নিরূপায অবস্থা স্মবণ কবিযা সমস্ত মনটা টন টন কবিযা উঠিত। নিজের জা ননদ শাশুড়ি এবং সমবযস্ক সঙ্গিনীদেব কাছে কিবণ প্রাযই বলিত,মেযেমানুষেব রূপই বল আব গুণই বলো—কিছুই কোন কাজে আসে না যদি না তাব ববাত ভালো হয। আমি এইটে এতবাব দেখেচি যে রূপগুণেব উপব আব আমাব শ্রদ্ধা নেই। বলিতে বলিতে এমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিযা অসমাপ্ত কথাব মাঝখানেই চুপ কবিত যে ইহাব অর্থ বুঝিতে আব কাহাবও বড বাকি থাকিত না। বুঝিতে পাবিযা শাশুড়ি ব্যথিত হইযা উঠিতেন। সঙ্গিনীবা সমবেদনা বোধ কবিত এবং বড জা ইন্দু তাহাব প্রতি কটাক্ষপাতে মুখ কালো করিযা সেখান হইতে উঠিযা যাইত।

কিবণ অন্য সবদিকে ভালো হইলেও বড জা'যেব সহিত ব্যবহাবে এই কাবণে অত্যধিক মাত্রায আত্মমর্য্যাদাগর্ব্বশালিনী ছিল। বড জা'যেব মেযেব জন্মদিনে খুব দামী কোন উপহাব কিনিযা দিযাও সেটা হাতে কবিযা দিবাব সময বিনাইযা বিনাইযা বলিত, বডদিব কি ভাই এ জিনিস পছন্দ হবে? তবু গবীব কাকীমা দিযেচে এই মনে কবেও যদি ওঁব মেযেবা নে'য। সেই আমাব ভাগ্য।

কিন্তু সেদিনেব সেই কোট কেনাব ব্যাপাবটা সেখানেই সমাপ্ত হইল না। কিবণ সমস্ত ঘটনা শুনিযা আপন হৃদযে ঝড বহাইযা নিঃশব্দে উঠিযা নিজেব ঘরে চলিযা গেল।

শাশুড়ি বলিলেন, আমাকে চা তৈবা কবে দিতে দিতে মেজবৌমা অমন কবে উঠে চলে গেল কেন?

মেজমেযে তবলা বলিল—কেন উঠে যাবে না? ওব মনে কষ্ট হয় না? যাই বলো বড়বৌদিব এবকম ব্যবহার কিন্তু ভাবি অন্যায।

কিরণ স্বামীকে আদেশ করিল—তুমি এখনই লিলি আর অতুলের জন্যে দু'টো গরম কোট্ কিনে নিয়ে এ'স। আমি যতই গরীব হই, নিজের ছেলেমেয়েকে দু'টো জামা নিজে কিনে দেবার মত সামর্থ্য আমার নিশ্চয়ই আছে। আর কিছু না থাক—

বলিতে বলিতে তাহার চোখে অশ্রু ছলছল করিয়া উঠিল এবং স্ত্রীর সেই অশ্রুপ্লাবিত ঘনপক্ষ্মময় চক্ষুর দিকে চাহিয়া ললিত যখন কি করিবে খুঁজিয়া পাইতেছে না ঠিক সেই সময়ে দ্বারের বাহিরে জুতার আওয়াজ হইল। শৈলেন একটু কাসিয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে বাদামী রঙের কাগজে মোড়া একটা মস্ত পার্শ্বেল। ভাসুরকে দেখিয়া কিরণ মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া একপাশে দাঁড়াইল।

খাটের উপর পার্শ্বেলটা ছুঁড়িয়া দিয়া শৈলেন বলিল, ললিতের জন্যে একটা স্যুট্ আর লিলির জন্যে একটা ফারের অলেষ্টার নিয়ে এ'লাম। মেজবৌমা, খুলে দেখুন পছন্দ হয়েচে কিনা— তাহার পর শৈলেন দু'এক মিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া আরও কি একটা বলিতে গেল, বোধহয় স্ত্রীর ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিছু বলিবার ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু সঙ্কোচে বলিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া ব্যস্ততার ভান করিয়া কহিল, যাই, আবার ভবানীপুরে দু'টো বালীগঞ্জে তিনটে আর পার্ক সার্কাসে চারটে কল আছে। দাড়িয়ে যে দু'দণ্ড গল্প করবো তার যো কি? নাঃ আর পারা যায় না। খেটে খেটে—

মিনিট পনের পরে তবলা ঘরে ঢুকিল—মেজবৌদি অ মেজবৌদি! এই দেখ মা লিলি আর অতুলের জন্যে দু'টো জামা অনাথদাকে আনতে দিয়েছিলেন। বেঙ্গলষ্টোর্স থেকে নিয়ে এ'লো। লিলির জামার রংটা কী ফাইন। দেখ, তোমার পছন্দ হয়েচে তো?

সেদিন বড়বৌ ইন্দু সারাদিন মাথা ধরায় শয়ন গৃহ ছাড়িয়া উঠিলেন না এবং তাঁহার স্বামী সারাদিন বালীগঞ্জ ভবানীপুর পার্কসার্কাস এবং

টালীগঞ্জের 'কল' সারিয়া শ্রান্তদেহে বৈঠকখানা ঘরে রাত্রি যাপন করিলেন। সারাদিন খাটুনীর পর স্ত্রীর মুখোমুখি হইবার সামর্থ্য বা সাহস কোনটাই নিশ্চয় তাঁহার ছিল না।

যে বস্তু লইয়া এত গোলমাল এতখানি মনান্তর সেই কোটটা পরিয়াই লিলি খেলা করিতে করিতে সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ আসিয়া মাকে কহিল—মা, আমার গলায় বড় বেদনা করচে কতক্ষণ থেকে। কিরণ মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা আগুনের মত গরম। শৈলেন রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ব্যস্তভাবে মোটর লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—কি কতকগুলা ঔষধ নিজে কিনিয়া আনিবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া আগে আপন শয়ন কক্ষে ঢুকিয়া কহিলেন স্ত্রীকে, ওগো, লিলি বোধহয় বাঁচবে না। তার খুব খারাপ টাইপের ডিপ্‌থিরিয়া হয়েছে। তুমি যাও, মেজবৌমার ঘরে যেয়ে তার কাছে একটু ব'সোগে। আমি এখনই যাচ্ছি। ডাক্তার মুখার্জ্জিকে পরামর্শ করবার জন্যে ডেকেছি। তিনি এ'লেন বলে। ইন্দু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। লিলি বাঁচিবে না। না-বাঁচা জিনিসটা যে কিরূপ তাহার এতখানি বয়স অবধি সৌভাগ্যবশত ভগবান তাহাকে জানিতে দেন নাই। তাহার নিজের ছেলেমেয়েরা সুস্থ শরীরে সবাই বাঁচিয়া আছে। মা বাবা ভাই বোন খুব নিকট সম্পর্কের স্নেহাস্পদ আত্মীয়স্বজনেরা সবাই বাঁচিয়া আছেন। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝিতে না পারিয়া সে কেমন বিহ্বলের মত মেজবৌয়ের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। সেখানে তখন ডাক্তার মুখার্জ্জি আসিয়াছেন, তিনি রোগীকে ইঞ্জেক্‌সন দিতেছেন। লিলির মুখ ইহারই মধ্যে কেমন বিবর্ণ হইয়া গেছে। থামিয়া থামিয়া নিঃশ্বাস লইতেছে। মোমবাতির ক্ষীণ হলদে আলোয় সে-ঘরের সমস্ত জিনিস কেমন অদ্ভুত অপ্রাকৃত দেখাইতেছে। কিরণ মেয়ের শিয়রের কাছে বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। তাহার স্তব্ধ মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া তাহাকে মর্ম্মরগঠিতা প্রতিমার মত বোধ হইতেছে। কিরণের দিকে

চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ একটা অনির্দ্দেয় ভয়ে ইন্দুর সারা শরীরটা দুলিয়া উঠিল। এখনই ঐ মেয়েটির মেয়ে মারা যাইবে! এ কেমন হয় যদি তাহার নীলু কিংবা মীরা অমনই তাহার চোখের সুমুখে একদিন—ইন্দু আর ভাবিতে পারিল না। দ্রুতপদে আসিয়া লিলির মাথার কাছে বসিয়া বলিল—ভয় কি মেজবৌ, আমি নিশ্চয় করে বলচি লিলি শীগ্‌গীর ভালো হয়ে উঠ্‌বে। তোমার কোন ভাবনা নেই।

কিন্তু কিরণ কোন জবাব দিল না। সে একদৃষ্টে যেমন তাহার মেয়ের দিকে চাহিয়াছিল তেমনই চাহিয়া বসিয়া রহিল। বোধ হয় কোন কথা তাহার কানে গেল না। শৈলেন এবং ডাক্তার মুখার্জ্জি পাশের ঘরে নিম্নস্বরে কি পরামর্শ করিতেছিলেন। রোগীর ঘর নিঃশব্দ। দেয়ালে ক্ষীণ আলোয় বড় বড় ছায়াগুলো কেমন করিয়া নড়িয়া বেড়াইতেছে। ইন্দুর মনে একটা দুর্জ্জয় বিপ্লবের ঝড় বহিতেছিল। যে জীবন এতদিন তাহার তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটী কলহ বিবাদ ঈর্ষা দ্বেষ ভালোবাসা সমস্ত লইয়া একটা অখণ্ড জীবন্তবস্তু ছিল, সে চারিদিকের ঐ বড় বড় ছায়াগুলোর মত কখন্ পায়ের তলা হইতে সরিয়া গিয়া একটা মিথ্যা মরীচিকায় দাঁড়াইয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়াই সে হঠাৎ যেন দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মাঝে দাঁড়াইয়াছে। সেখানে উদাস চাঁদের আলোয় সমস্ত ধুধু করিতেছে। যেদিকে তাকানো যায় একটা অত্যন্ত কঠিন শূন্য নীরবতা ছাড়া আর কোথাও কিছু নাই। এই আবিষ্কারের দুঃসহতায় অনেকক্ষণ অবধি ভালো করিয়া সে কিছুই ঠাহর করিতে পারিল না।

লিলি যে কোটটা পরিয়া আছে তাহার কলারের দামী ফারগুলা বাতিব আলোয় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সেইদিকে চোখ পড়ায় তাহার দৃষ্টি আর্ত্ত হইয়া উঠিল। ঐ কোটটা কেন্দ্র কবিয়া কত মান অভিমান কত ঈর্ষার অভিনয় হইয়া গেছে। অথচ হয়তো আর কয়েক ঘণ্টা পরে…

আর কয়েক ঘণ্টা পরে কি? তাহার ভাবিতেও সাহস হয় না। লিলির সঙ্গে সঙ্গে ঐ কোটটাও পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। না না, এমন হয় না, হইতে পারে না। ডাক্তারদের ভুল তো এমন কতই হয়। ডাক্তারের কথাই কি সব সময় বেদবাক্য নাকি? টেবিলের উপর সাজানো ঐ মেজার গ্লাস, ওষুধের শিশি। আলনায় টাঙ্গানো ঐ শাড়ি জামা কাপড়, আলমারীর ঐ পুতুল, টিসেট্, চিনামাটির ফুলদানি সমস্ত মিলিয়া জীবনের যে উষ্ণ কোমল পটভূমিকা রচনা করিয়াছে—আরামে সজ্জায়, স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ—সেখানকার ভিত্তিভূমি কি এতই ক্ষণভঙ্গুর যে—ডাক্তার মুখার্জ্জি একটা ইঞ্জেক্সনের সিরিঞ্জ হাতে ঘরে ঢুকিলেন। লিলির জামার হাতাটা তুলিয়া ইঞ্জেকসন্ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরণ আহত হইয়া ডাক্তারকে বলিল—আপনি অমন করে টানবেন না, ওর লাগবে। একটু সবুর করুন আমি আস্তে আস্তে তুলে দিচ্ছি। মেয়েকে সে বিছানা হইতে সন্তর্পণে কোলে তুলিয়া লইল কিন্তু মুখার্জ্জিকে আর ইঞ্জেক্সন্ দিতে হইল না। লিলির যেটুকু নিঃশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত এবং অত্যন্ত অনিয়মিত ভাবে বহিতেছিল তাহা সহসা থামিয়া গেল। ডাক্তার বাহির হইয়া গেলেন। কিরণ মেয়েকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—দিদি, এতক্ষণ ছটফট করে লিলি এই একটুখানি শান্ত হ'য়ে এই মাত্র ঘুমুলো। বট্ঠাকুরকে বলুন এখন আর ওসব ইঞ্জেক্সন্ দেয়া-দেখি থাক। অন্ততঃ যতক্ষণ না ওর ঘুম ভাঙে।

শৈলেন কিছুকাল পর স্ত্রীকে বারান্দায় ডাকিয়া আনিয়া বলিল—হয়ে গেছে। কিন্তু মেজবৌমার কোল থেকে ওকে কেমন করে নামানো যায়। তুমি—বলিতে বলিতে সে অস্থিরচিত্তে মৃতের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পিছনে পিছনে ইন্দুও আসিল।

বাতির আলো তখন কলারের ফারের উপর পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সেইদিকে চাহিয়া সর্পদংষ্ট্রের মত বিবর্ণ মুখে ইন্দু স্বামীর

দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়া কহিল—তুমি কী বলচ! শুধু সম্মুখের ঐ বাতির আলোই কোটটার উপর আসিয়া পড়ে নাই, মৃত্যুর আলো আসিয়া পড়িয়া সমস্ত জীবনটাকে কি যেন একটা রঙে রাঙাইয়া দিয়া গেছে। যে আলোর সামনে দাঁড়াইয়া ছোটখাটো ঝগড়া বিবাদ ঈর্ষা মনান্তর সমেত প্রাত্যহিক জীবনযাপন এত অকিঞ্চিৎকর এমনই হাস্যকর মনে হইতেছে যে কেমন করিয়া সেটা সম্ভব হইয়াছিল বুঝিতে পারিতেছে না।

স্বরূপ

১

স্বামী এ-দিক্ ও-দিক্ চাহিয়া অপ্রতিভ-স্বরে একটু যেন লজ্জিতের মত স্ত্রীকে কহিলেন, আচ্ছা,এই মুর্গীর ডিমগুলো হেঁসেলে রাঁধানো, বা টেবিল-চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা এগুলো দিনকতক যদি বন্ধই রাখ, ক্ষতি কি তাতে? মা এসেছেন, ওঁরা সেকেলে মানুষ। এ সব দেখে বড় দুঃখ পান। অর্দ্ধেক দিন হয়তো খাওয়াই হয় না।

স্ত্রী বিস্মিত এবং উত্তপ্ত স্বরে বলিলেন, বল কি! তোমার মা যদি এখন ছ'মাস এখানে থাকেন, ছ'মাস আমি আমার ছেলেমেয়েদের পিঁড়ি পেতে কলাপাতায় হবিষ্যান্ন খাওয়াব না কি? অত আব্দার আমার সয না। তাছাড়া কিসের জন্যে শুনি? নিজের বিবেক বলে, মনুষ্যত্ব বলেও কিছু আছে তো? যা আমি নিজে মানি না, যে সব কুসংস্কার অত্যন্ত ঘৃণা করি, কারও খাতিরে বা কাউকে খুসী করবার লোভে তা মেনে চল্‌বাব ভাণ আমার দ্বারা হবে না। ছেলেমেয়েদেব সামনে 'হিপক্রেসি'র এ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি ধরতে পারব না।

স্বামী আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া সবিয়া পড়িলেন। স্ত্রী খানসামাকে ডাকিয়া হুকুম করিলেন, মোটরটা বার কবতে বল। আমি মিসেস মিত্তিরের ওখানে একবার যাব।

শীতের হাওযা পড়িয়াছে; কার্ত্তিকের শেষ। সকাল-বেলায় গৃহস্বামীব নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। নীচের 'কন্‌সাল্‌টিং রুমে' রোগীর ভীড় জমিতে সুরু করিয়াছে। ডাক্তার কে, কে, বসুব পসাব অসম্ভব। তাঁহাব নাম জানে না এ অঞ্চলে এমন কেহই নেই। মডার্ণ-গৃহস্থালীর আধুনিক গৃহস্বামী। কর্ত্তব্যে বা চাল-চলনে তাঁহার স্ত্রীও এতদিন তাঁহাকে কখনও

এতটুকু দোষ দিতে পাবেন নাই। হঠাৎ আজই কেন জানি না, এমন ভযানক অন্যায অনুবোধ তিনি তাঁহার স্ত্রীকে কবিযা বসিলেন! এ অন্যাযেব মূলে 'সেন্টিমেণ্ট্' বলিযা একটা পদার্থ বড় অধিক মাত্রায আছে। তাঁহাব স্ত্রী তবলা মোটবে মিসেস্ মিত্রেব গৃহে 'বিটার্ণ-ভিজিট্' দিতে বাহিব হইযা পথে সেই সেন্টিমেণ্টেব বিশ্লেষণ কবিতে কবিতে চলিলেন। মা আসিযাছেন, বড সুখেব কথা। বেশ তো, এক সপ্তাহ থাকুন, দু'পাঁচখান ধর্ম্মমূলক নাটক দেখুন, গঙ্গাস্নান করুন,—না হয তাহাকে মোটবে কবিযা বালীব ব্রীজ্ কি দক্ষিণেশ্ববেব মন্দিব দেখাইযা আনা হউক্। প্রায গোটা একদিন মোটবটা আব অন্য কোন কাযে পাওযা যাইবে না, তা না যাক, তবলাব তাহাতেও আপত্তি নাই। কিন্তু এ কি! প্রায মাস দেডেক হইতে চলিল, তাঁহাব কলিকাতা ছাডিযা যাইবাব নামটি নাই! সেদিন তাঁহাব খাস-ঝি খেঁদিব কাছে তরলা শুনিতেছিল, মা নাকি এবাব ববাবব এখানেই থাকিবেন। এতদিন তরলাব শ্বশুব বাঁচিযাছিলেন,শেষ বযস পর্য্যন্ত সবকাবী কাযে মোটা পেন্সন পাইযাছেন, তা ছাডা নেটিভ ষ্টেটে দেওযানেব কায কবিতেন—কুমিল্লাব ওদিকে। শাশুডী সেখানেই থাকিতেন। মাস ছযেক হইল, তাঁহাব মৃত্যু হইযাছে। সেই প্রকাণ্ড বাডীতে বাজোচিত সমাবোহে তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকিতেন। এখন দীপ নিবিযাছে, নাট্যশালাব দীপ্তি চিব-নির্ব্বাপিত। শূন্য-গৃহে একা তিনি টিকিতে পারেন নাই, তাই একমাত্র ছেলেব কাছে কলিকাতায চলিযা আসিযাছেন। আব একটি মেযে আছে, তাহাবও এই কলিকাতাতেই বিবাহ হইযাছে। ভয তবলাব তাই এইখানেই। শেষ অবধি বুড়ী যদি কলিকাতাতেই থাকা মনস্থ করে, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! ঘবকন্নাব মাঝখানে এই একটা বিবোধী বিসদৃশ বস্তু লইযা তবলা দিন কাটাইবে কেমন কবিযা! প্রতিদিন—প্রতিবাত্রি তাহার দুর্ব্বিসহ হইযা উঠিবে না?

মিসেস্ মিত্রের গৃহদ্বারে গাড়ী দাঁড়াইল। মিসেস্ তটিনী মিত্র তখন কোথাও যাইবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হইয়া বাহিরের কক্ষে বসিয়া ছিলেন। তরলাকে দেখিয়া ঈষৎ অনুযোগের সুরে কহিলেন, তরলা, আজ যে আমাদের মিটিংয়ে যাবার কথা, এত দেরী কেন? সমস্তই ভুলে বসেছিলে বুঝি? তোমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আমি শেষে একাই যাচ্ছিলুম। দায়িত্বজ্ঞান তোমাদের বড় কম।

তরলা নির্জীবের মত একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, মনে সবই ছিল তটিনীদি কিন্তু বাড়ীতে এখন যা অশান্তি চলছে, তাতে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে রাখাই দায়। 'মোষ্ট্ ডিস্‌গাস্‌টিং এ্যাফেয়ার!' তোমাকে আর বলব কি, অশান্তিতে জীবন জর্জ্জরিত!

সকাল বেলাকার ঘটনাটা ডাল-পালা লাগাইয়া তরলা বলিতে সুরু করিল। তটিনী উৎসাহদীপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, মঙ্গুর বন্ধুকে তুমি ঠিক জবাবই দিয়েছ। আর যাই কর, ভিতরে একরকম বাইরে একরকম ব্যবহার ক'রে ছেলেদের সামনে হিপক্রেসির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুমি ধরতে পারবে না। 'অন্ নো একাউণ্ট!'

চাকর আসিয়া খবর দিল, মা, গাড়ী নিয়ে বাবু বেরিয়েছেন, তবে এখনই আসবেন। বেশি দেরী হবে না—মিনিট দশ।

তরলা কহিল, তটিনীদি, তাহ'লে আমাদের গাড়ীটা ফেরত দি। ছেলেদের আবার স্কুল আছে। ওঁর গাড়ীটা উনি তো সর্ব্বদাই নিয়ে রোগীর বাড়ী ঘুরচেন, অন্য কাযে বড় একটা পাওয়া যায় না। নির্ম্মলের আবার দশটার মধ্যে কলেজও আছে

তটিনী বলিলেন, ফেরত দাও। আমিই তোমাকে পৌছে দিয়ে আসব'খন। কিন্তু ঐ যা বললে ভাই, পারিবারিক অশান্তি থেকে কারও রেহাই নেই। আমিও এদিকে আবার এক অশান্তিতে পড়েছি। চল, রাস্তায় যেতে যেতে তোমাকে না হয় বলব ব্যাপারটা। কিন্তু মিসেস্

হাল্‌দারের কথাগুলো গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়, শুনেছ তিনি কি লিখেছেন? তিনি লিখেছেন, ওসব অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের মিটিংয়ে তিনি সায় দিতে পারেন না। জগতে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য আছে—দিন রাত আছে, ততদিন ধনি-দরিদ্রের তফাৎও থাক্‌বে, এ্যারিষ্টক্রেসীও থাক্‌বে। ও নিয়ে মিটিং করা বা গণ-আন্দোলন করা একেবারে ব্যর্থ। দেখ দিকি কথাগুলোর ছিবি-ছাঁদ। 'জাষ্ট্ লাইক্ হার।' পড়ে অবধি রাগে আমাব গা জ্বলছে।

তরলা কিন্তু গণ-আন্দোলনের কথা শুনিবার জন্য আদৌ অধীর হয় নাই। তটিনীদি পারিবারিক অশান্তি সম্বন্ধে কি একটা কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেলেন। সেটা শেষ অবধি না শুনিতে পাইলে তো তাহার রাত্রিতে ঘুম হইবে না। আরও একটু সরিয়া আসিয়া সে কহিল, তোমার তো সুখের ভাই তটিনীদি। দুই ছেলের এক জন ব্যারিষ্টার, এক জন এগ্রিকাল্‌চার-স্পেশালিষ্ট্। স্বামী তো হাতের মুঠোয় ধরা। তোমার কথায় ওঠেন বসেন। তোমার আবার পারিবারিক অশান্তি কোন্‌খানে?

সহানুভূতির এই অজস্র প্লাবনে তটিনী ভাসিয়া যাইবার যো হইলেন। করুণ সুরে কহিলেন, তোমরা যতটা মনে কর, অতটা নয়। বাইরে থেকে লোকে বড় বাড়িয়ে দেখে। এই তো আজ সকালেই মিষ্টার মিত্রের সঙ্গে আমার একচোট্ হয়ে গেল। তিনি কোথা থেকে একটা হাড়হাবাতে ছোড়াকে আবিষ্কার ক'রে এনেছেন। আবার বলেন কি না, সে আমাদের এখান থেকে কলেজে পড়বে। ছেলেটা অতি গরীব, তিনকুলে কেউ নেই। আমি বললুম, আমাদের বনেদী ঘরে ও সব চালচুলোহীন পথের লোককে আমি জায়গা দিতে পারব না। তার চেয়ে সাহায্য যদি চায়, কিছু টাকা ধরে দাও, ব্যস্, ফুরিয়ে গেল।

তরলা কহিল, ঠিকই বলেছ। দেখ্‌ছি তোমার আমার একই জ্বালা। পুরুষগুলো অতিরিক্ত 'আইডিয়ালিষ্ট'। আইডিয়ার পিছনে ঘুরে বেড়াতে

বেড়াতে তারা সংসারের বাস্তব দিক্‌টা ভুলে যায়। তখন ভুগ্‌তে যা হয়, তা শুধু আমাদেরই ভাগে পড়ে। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টা অষ্টপ্রহর ওরা তো কিছু আর সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে থাকে না।

মিষ্টার মিত্র এতক্ষণ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া একটা চৌকির উপর হাত রাখিয়া যে দাঁড়াইয়াছিলেন, দু'জনের মধ্যে তাহা আদৌ কেহ লক্ষ্য করে নাই। তিনি বলিলেন, গাড়ী তৈরী। কিন্তু যদি আমাকে ক্ষমা কর তটিনী, তা হ'লে একটা কথা বলি। পুরুষদের ঘাড়ে স্বচ্ছন্দে দোষ চাপালে, কিন্তু তোমাদেরও কাযে ও কথায় মিল কোথায়? চলেছ অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের মিটিংয়ে। সোসালিষ্টিক মতবাদ নিয়ে লোকের সঙ্গে তর্ক কর। ধনি-দরিদ্রের সমান অধিকার এই কথা জোর-গলায় বলে আজ সভানেত্রীর অভিভাষণ পাঠ করবে। আর পারো না দিতে জায়গা তোমার বাড়ীতে এক অসহায় দরিদ্র ছাত্রকে?

বন্ধুর সাম্‌নে স্বামীর এই স্পর্দ্ধিত এবং স্পষ্ট উক্তিতে তটিনী এত রাগিয়া গেলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন নিঃশব্দে।

২

মিষ্টার কে, কে, বসুর বাড়ীতে যে অশান্তির সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা মিটিয়াছে, কিন্তু অভিনব উপায়ে। তরলা সেদিন একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার দোসাদ্ চাকরটা তরলার শাশুড়ীর খাবার জলের কলসী হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া লইয়া বাবুকে দিতে গেল। অন্য কোন দিন সে এরূপ আচরণ করে নাই। আজ কেন করিল, তাহাও জানা যায় নাই। হয়তো তরলা তাহাকে এইরূপ আদেশই ইচ্ছা করিয়া দিয়াছিল। গৃহিণী অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। তরলাকে ডাকাইয়া কহিলেন, বৌমা, এমন হ'লে তো বাছা, আমি টিক্‌তে পারি না। তোমার চাকর-

রাকরদের এ কেমন ব্যবহার। ও গেঁদি, যা এখন আবার নূতন কলসী কিনে দু'মাইল হেঁটে গঙ্গাজল নিয়ে আয়।

গৃহিণীর খাস-ঝি গেঁদি, মুখ ভীমরুলের চাকের মত করিয়া কহিল, রোজ রোজ এত আমি পারিনে বাপু। তার চেয়ে চল আমরা দিদিমণির বাড়ী গিয়ে থাকি গে। তিনি তো থাক্‌বার জন্যে দু'বেলা খোসামুদি করছেন, মোটর পাঠাচ্ছেন। তোমারই গা হয় না।

তরলার শাশুড়ী বামাসুন্দরী গম্ভীর মুখে কহিলেন, তাই থাক্‌তে হবে দেখ্‌ছি শেষ পর্য্যন্ত।

তরলা তাচ্ছিল্যের সহিত উত্তর করিল, তা যেখানে খুসি গিয়ে থাকতে পারেন। তাই ব'লে ওঁর জন্যে আমি দিবা-রাত্র ছুঁই-ছুঁই ক'রে থাক্‌তে পারব না।

বামাসুন্দরী নিতান্ত অপমানিত বোধে গেঁদিকে মোটঘাট বাঁধিতে আদেশ দিয়া, লেক রোডে মেয়েকে পত্র লিখিতে বসিলেন। এতদিন তিনি যে মেয়ের কথায় কর্ণপাত করেন নাই, ভগবান্ বিধিমত তাহার সাজা দিতেছেন। এখন অবিলম্বে সে যেন মোটর লইয়া আসে। এই কথাটাই বিনাইয়া বিনাইয়া লিখিলেন। চিঠি লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় জরুরী একটা কেস দেখিয়া ডাক্তার কে, কে, বসু বাড়ী ফিরিলেন এবং স্ত্রীর মুখে ব্যাপার শুনিয়া অর্দ্ধভুক্ত কেক এবং পাঁউরুটি ফেলিয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে মায়ের ঘরের দিকে ছুটিবার উপক্রম করিলেন। হাত ধুইবার ত্বরা সহিল না।

তরলা দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ক্রোধ-রক্তিম মুখ ফিরাইয়া কহিল, কিছুতেই যেতে পাবে না। যেতে চাচ্ছেন, যান। দেখ্‌ব মেয়ে-জামাই কত দিন ওঁকে সমাদর ক'রে রাখে। ঠাকুরঝিকে আমি চিনি। বাবুর্চ্চির রান্না ছাড়া একটি দিন ঠাকুর-জামাইয়ের মুখে রোচে না। বাড়ীতেও স্লিপার পায়ে সর্ব্বদা না থাক্‌লে ঠাকুরঝির পা ফেটে যায়। এ হেন আচারবাগীশ

মা নিয়ে ওঁরা কত দিন টিক্‌তে পারেন, তা-ই আমি দেখি। চিঠিতে কাঁদুনী গেয়ে সোহাগ জানানো আলাদা, আর বারোমাস ঝক্কি সয়ে ঘর-কন্না করা আলাদা ; দু'টোতে দস্তুরমত তফাৎ আছে।

করুণাকান্তিবাবু বাধা পাইয়া হতাশ হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তফাৎ যে আছে, তা আমিও জানি। কিন্তু তোমার ঠাকুরঝি কমলা বুদ্ধিমতী। সে জানে, একটু রয়ে-সয়ে নিলে যদি লাখ-দেড়েক টাকা এখনই অনায়াসে পাওয়া যায়, তা হ'লে সেটা ছেড়ে দিতে নেই।

তরলা অবাক্ হইয়া কহিল, দেড় লাখ টাকা হঠাৎ কোথা থেকে পাবে ? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে না কি ?

করুণাবাবু কহিলেন, মাথা খারাপ কেন হবে ? কেন, তুমি কি বাবার উইলের কথা শোননি ? তিনি উইলে লিখেছেন, আমার স্ত্রী স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠাবতী, শুচিপরায়ণা, নিরীহ প্রকৃতির। তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং কন্যা সেরূপ নয়, তাহাদেব গৃহস্থালীতে তাঁহার শান্তিতে বসবাস করিবার সম্ভাবনা নাই, সেজন্য আমি আমার ছেলেকে পঞ্চাশ হাজাব ও মেয়েকে দশ হাজার মাত্র দিয়া, আমার অবশিষ্ট সঞ্চিত দেড় লক্ষ টাকা আমার স্ত্রীকে দিয়া গেলাম। ঐ টাকায় তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার। তিনি ইচ্ছামত দান, হস্তান্তর বা মৃত্যুর পর যাহাকে খুসী দিয়া যাইতে পারেন।

তরলা চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, বল কি ! একথা তো আমি জানতুম না। তুমি প্রথম দিনে—যেদিন খুব সেন্টিমেণ্ট দেখিয়ে বকাবকি করলে, সেদিন যদি ঘুণাক্ষরেও এ কথা বলতে ! কিন্তু তোমার বাবা তো দেখ্‌ছি অনেক টাকা জমিয়ে গেছেন।

মিঃ বসু কহিলেন, হ্যাঁ, অনেক টাকা। আমিও প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেছলুম। তোমবা সেকেলে আচার-ব্যবহাবের যতই নিন্দে কর, ঐ চালে চলে বাবা অত টাকা তো জমিয়ে গেলেন। আর আমিও কম রোজগার করিনে, কিন্তু কোথা দিয়ে যে কি উড়ে যায় ! আজ অবধি তো একটা

পয়সা জমাতে পারিনি। দর্জ্জির দেনা, বাবুর্চ্চি আর ধোবার বিল শুধ্‌তে শুধ্‌তে কর্পূরের মত সমস্ত উবে যায়। তবে বাবা একটা ভুল করেছেন, মেয়েমানুষে অবলম্বন ছাড়া থাক্‌তে পারে না। মা বিধর্ম্মী ছেলে বা ম্লেচ্ছ আচার ব্যবহারে অভ্যস্ত মেয়ের বাড়ীতে বরঞ্চ পরাধীন হয়ে বাস করবেন, তবু আলাদা থাকতে পারবেন না,—যত টাকাই তাঁর হাতে থাকুক।

তরলা মাথায় একটু ঘোমটার মত দিয়া চুলটা একটু ঠিক করিয়া লইয়া কহিল, যাই, মাকে আট্‌কাইগে। সত্যিই তো, উপযুক্ত ছেলে থাক্‌তে মেয়ে-জামাইয়ের বাড়ী বাস করতে যাবেন কোন্ দুঃখে। এসব কিছুই হ'তে পারত না, তুমি যদি আগাগোড়া সব কথা প্রথম থেকেই আমায় খুলে বল্‌তে। ভগবান্ তোমাকে কবে যে বুদ্ধি দেবেন, জানি না। আমি ব'লে তাই কোন রকম ক'রে চালিয়ে নিচ্ছি। নইলে—কি যে হোত, ভাব্‌তেও আমার ভয় করে।

নূতন-প্রথা

১

মুক্তি তরুণী, সুন্দরী এবং আধুনিকা। তাহার মনের আকাশে কত রকমের ভাব, কত রকমের কল্পনা সর্ব্বদাই আনাগোণা করিতে থাকে। যে বয়সে অকারণ পুলকে হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠে, মুক্তির এখন সেই বয়স। স্নানের ঘরে ঢুকিয়া অকারণে খানিকটা জল ছিটাইয়া সে খুসী হইয়া উঠে। মাথার চুল এ'লো করিয়া দিয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়। সেই সুরভিত কেশপাশ যখন বিস্রস্ত হইযা বাহুতে, কপোলে, স্কন্ধে লুটাইয়া পড়ে, তখন নিজের মনের কোন অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীতে উন্মনা হইয়া সহসা সে স্তব্ধ হইয়া কি ভাবে।

মুক্তির বিবাহের কথাবার্ত্তা হইতেছে। কিন্তু আজ কাল মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড় সহজ নহে। মেয়ে যদি সুন্দরী হয় এবং পিতার যদি অর্থের প্রাচুর্য্য থাকে, তবুও বাধা বহু। কারণ, যেখানে পিতা মাতা দেখিয়া শুনিয়া পছন্দ করিবেন, ঠিক সেইখানেই যে বয়ঃপ্রাপ্তা এবং শিক্ষিতা কন্যারও মন মিলিবে, এমন কোন লেখাপড়া নাই। অথচ মেয়ে যখন যথেষ্ট বড় হইয়াছে, বিচারবুদ্ধি এবং বিবেচনা হইয়াছে, তখন তাহার মতকে অগ্রাহ্য করিবাব কোনই উপায় নাই। বরঞ্চ তাহাই সঙ্গত। তবুও কালের হাওয়া যতই পরিবর্ত্তিত হউক, বাঙ্গালী-ঘরের বাপ-মা মেয়েকে নির্ব্বিচারভাবে অবাধ মেলামেশাও করিতে দিতে পারেন না। সমস্যা তাই জটিলতর হইয়া উঠিতেছে প্রতিদিন। কোন কূল-কিনারাই আর চোখে পড়িতেছে না। সর্ব্ববিধ আরাম এবং উপকরণবাহুল্যের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির মা ভাবনায় শীর্ণ-বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছেন এবং

বাবা তাঁহার হাইকোর্টের অজস্র মোকর্দ্দমা সারিয়া আসিয়া বাড়ীতে একদণ্ডের জন্যও স্বস্তি পাইতেছেন না। এমনই করিয়া সুন্দরী তন্বী তরুণী মুক্তি আঠারো ছাড়াইয়া উনিশে পা দিল এবং আই, এ, পরীক্ষা পাশ করিয়া বি, এ, ক্লাসে ভর্ত্তি হইল।

২

অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি, শীতটা পড়ি পড়ি করিতেছে। সন্ধ্যাবেলায় শয়নকক্ষে মুক্তির মা উর্ম্মিলা দেবী একটা পাতলা আলোয়ানে পা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া রেডিও শুনিতেছেন। একতলার সদরের ঘরে স্বামী মক্কেল এবং কাগজপত্র হইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত। মুক্তিও তাহার নিম্নতলের পড়িবার ঘরে বসিয়া ক্লাসের পড়া করিতেছে। দোতলায় আর কেহই নাই। এমন সময় সদর দরজায় গেটের কাছে একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ হইল। কোন মক্কেলের গাড়ী মনে করিয়া উর্ম্মিলা প্রথমটা তাহাতে মনঃসংযোগ করিলেন না; কিন্তু দু'এক মিনিট পরেই দোতলার সিঁড়িতে অনেকের মিলিত কলহাস্য এবং পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। পরমুহূর্ত্তে ননীদি, তাঁহার ননদ বিভা ও ননীদির বড় মেয়ে উমা ঘরে ঢুকিল। ননীদি মজলিসি আমুদে মিশুকপ্রকৃতির মেয়ে। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া উর্ম্মিলার দিকে চাহিয়া কৈফিয়তের সুরে বলিলেন, "আর ভাই, উর্ম্মি, রোজ মনে করি, তোর এখানে একবার আসবো, তা আর হ'য়ে ওঠে না।"

প্রত্যুত্তরে উর্ম্মিলাও সময়োচিত শিষ্টতাসূচক কি একটা বলিলেন। কিন্তু দু'জনের মুখপানে চাহিয়া টের পাইলেন, এ সমস্ত খবর দেওয়া নেওয়া শিষ্টাচার এবং বেড়াইতে আসা ছলমাত্র! ভিতরে কি একটা গভীর প্রয়োজন রহিয়াছে। ইহাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল ননীদির ক্ষণকাল পরের কথায়। তিনি তাঁহার বড় মেয়ে উমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"তোমার সঙ্গীটি কোথা। আমরা এসেছি, মুক্তি বুঝি খবর পায় নি? যাও, তার সঙ্গে দেখা ক'রে এসোগে।" উমা ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিল, উঠিয়া মুক্তির খোঁজে নিম্নতলে চলিয়া গেল। বাকী রহিলেন ননীদির ননদ বিভা। তা তাঁহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কাযেই এ সব আলোচনা অবাধে তাঁহার সম্মুখে করা চলে।

ননীদি কৌচটার উপর কায়দা করিয়া বসিয়া বলিলেন, "দাও তো ভাই রেডিওটা বন্ধ ক'রে। নিজের বাড়ীতেও চব্বিশ ঘণ্টাই শুনছি, ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছে। ও আপদ থেকে আজ-কাল কোন বাড়ীই রেহাই পায় নাই দেখছি।"

উর্ম্মিলা উঠিয়া রেডিওটা বন্ধ করিয়া আসিলেন। ননীদি গলা খাটো করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে উর্ম্মি, কাল যে মিসেস্ হাতীয়ারের পার্টিতে বড় ঘটা ক'রে সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে, যাবি নাকি? মেয়েকেও নিয়ে যাবি তো?"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "দেখি। মেয়ে আজকাল বড় একটা কোথাও যেতে-টেতে চায় না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত।"

ননীদি আক্ষেপসূচক একটা শব্দ করিয়া বলিলেন, "ওমা, সে আবার কেমন ব্যবস্থা, উর্ম্মি? কেন, তুই কি খবর পাসনি হাতীয়ারের পার্টিতে এমন অনেক ছেলে আসবে, যাদের সঙ্গে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই লাভজনক। এমন একটা সুযোগ সর্ব্বদা পাওয়া যায় না।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "কে কে আসবে?"

ননীদি বলিলেন, "বোসেদের সেই চাটার্ড একাউণ্টেণ্ট্ ছেলেটি। মিঃ নন্দী—যিনি বিলেত ফেরত ডাক্তার। আর সুষমার ভাই দেবকী রায়ও আসবে শুনেছি। তবে ঐ দেবকী রায়ের কথাটা শুনে অবধি আমি একটু ইতস্ততঃ করছি।"

উর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবকী রায় কে?"

ননীদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "তাও তুই জানিসনে নাকি? নাঃ, এত কুণো স্বভাবের হ'লে কি আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়! দেবকী রায় মস্ত বড়লোকের ছেলে, গত সাত আট বছর বিলেতে ছিল, সবে দেশে ফিরেছে। কি যে সে পড়তে গেছলো বা কি পাশ ক'রে ফিরেছে, তা কেউ জানে না। এইটুকু কেবল চোখে দেখতে পায়, সে না জানে এমন বিষয় নেই, না জানে এমন ভাষা নেই। চেহারা সুন্দর, বুদ্ধি ক্ষুরধার, আর কথাবার্ত্তা যেন ঝর্ণার জলের মত। অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। না, একটু ভুল হয়েছে কিন্তু, দেবকী নয়, দেবব্রত রায় ছেলেটির নাম।"

উর্ম্মিলা বলিলেন, "তা যেন হ'লো, কিন্তু ভয়টা কিসের?"

ননীদি বলিলেন, "ভয়ের কারণটা অবশ্য ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে নেই, কিন্তু ছেলেটি যেন কেমন কেমন। প্রতি দিনকার বিধিবদ্ধ জীবনের মধ্যে ঠিক খাপ খায় না। মতামতগুলোও বড্ড বেশী স্বাধীন। আর মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারটাকে আর যাই বলা যাক্, সলজ্জ এবং বিনীত বলা যায় না। মোটের উপর এইটুকু শুধু ধারণা হয় তাকে দেখে যে, সমাজ সভ্য স্ত্রী-পুরুষের কাছে যে সুনির্দ্দিষ্ট বিধিবদ্ধ কায়দা মাফিক ব্যবহার আশা করে, সে রকম ব্যবহার তার নয়।"

উর্ম্মিলা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, মুক্তিকে বলে দেখি, সে যেতে রাজী হয় যদি। তোমার জন্যে চা আনতে ব'লবো, ননীদি?"

ননীদি বলিলেন, "না, চা আর এখন খাবো না। সন্ধ্যের দিকে চা খেলে আমার আবার রাত্রিতে ঘুম হয় না। হ্যাঁ, মুক্তিকেও নিয়ে যাস। মেয়েদের যখন বড় ক'রে রেখেছি, তখন মনের ভয় মনে চেপে রেখে তাদের যতদূর সম্ভব মেলামেশা করতে দিতে হবে বইকি। নইলে তো আর উপায় দেখিনে।"

অতঃপর কেমন বেশভূষায় মেয়েদের ভালো মানায়, সে সম্বন্ধে কিছু

মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়া ননীদি গাত্রোত্থান করিবার উদ্যোগ করিলেন।

উমাকে ও মুক্তিকে নীচে হইতে ডাকিয়া পাঠানো হইল। তাহারা আসিয়া চলতি ফ্যাশানের হাল্কা এবং মিষ্ট সুরের গান গাহিল ননীদির ননদ বিভার অনুরোধে। গান শেষ হইবার পর ননীদি সত্য সত্যই যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যাইবার পূর্ব্বে উর্ম্মিলাকে আর একবার অনুরোধ করিয়া গেলেন, সে যেন তাহার মেয়েকে কালো কিংবা গাঢ় নীল রংয়ের মান্দ্রাজী শাড়ী পরাইয়া লইয়া যায়। অন্য রং তেমন মানাইবে না। সেই সঙ্গে খুব হাল্কা মানানসই দু'চারখানা গহনা।



ননীদির অনুমান মিথ্যা নহে। মিসেস হাতীয়ারের পার্টিতে অনেক মেয়ের মা এবং মেয়েরা স্বয়ং নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, শুধু পার্টির খাতিরে নয়, অপর কোন গভীরতর উদ্দেশ্যে। গান, গল্প, হাসি —এ সমস্তর অন্তরাল দিয়া মেয়েদের মায়েরা উৎকণ্ঠিত অথচ শঙ্কাকুল সাধ্বসচিত্তে কন্যাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। মেয়েকে স্বাধীনতা না দিয়াও উপায় নাই, অথচ দিতেও মন চায় না, কেমন যেন ভয়-ভয় করে,—এমনই অবস্থাটা।

মুক্তি একটা সোফায় চুপ করিয়া বসিয়া সবই দেখিতেছিল। প্রথমে আসিলেন, মিঃ সোমনাথ নন্দী, এফ, আর, সি, এস ; এম, আর, সি, পি, (লণ্ডন) ; এল, এম, (গ্ল্যাসগো) বিলেত ফেরত ডাক্তার। পশার কেমন তাহা জানা নাই, তবে পয়সা আছে। অবিবাহিত যুবক, বছর ত্রিশেক বয়স। চোখে মোটা টরটয়েজসেলের চসমা, বিলেতী সুট পরণে। যথাবিধি আলাপ-পরিচয়াদির পর মিঃ নন্দী মিস্ বিজলীকে বলিলেন, "আপনার সুধাময় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য হবে কি ?"

প্রত্যুত্তরে বিজলী দেবী সুমধুর বিনীত হাস্য করিলেন।

নন্দিতা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করিলেন। সুজাতা মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন। বিজলীর মায়ের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নন্দিতা এবং সুজাতার মায়ের মুখ কালো হইয়া উঠিল।

বিজলীর মা একটু কাসিয়া বলিলেন, "আজ বিজুর শরীরটা তেমন ভালো নেই, হয়তো আশানুরূপ গাইতে পারবে না। কিন্তু উনি যখন অনুরোধ করছেন, তখন যা পার একটা গাও, বিজু।"

বিজলী একটু হাসিয়া, দুই একবার ক্ষীণ আপত্তি করিয়া, একটু থামিয়া মাথার ক্লীপটা হাত দিয়া আর একবার সোজা করিয়া লইয়া মিউজিক্‌টুলে আসিয়া বসিল।

তাহার পর আসিলেন কমলেশ বসু। চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট্, চাকরী করেন। ইনিও বিলেত ফেরত এবং বয়সও ঊনত্রিশ ত্রিশের মধ্যে। বড় উপাধি আছে।

কমলেশ পরিচয়াদির পালা এবং নমস্কার বিনিময়ের অন্তে মিস শেফালীকে কহিলেন, "আপনি আমার কাছে যে বইটা চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন, তার নামটা দেখে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। আমার এতদিন ধারণা ছিল, মেয়েরা হাল্কা গল্প উপন্যাস কবিতার বই এই সবই ভালোবাসে। অর্থনীতির এমনতর জটিল বইও যে তারা পড়ে, এ আমি আপনার বই চাওয়া দেখে প্রথম ধারণা করলুম।"

শেফালী বলিল, "উপন্যাস আমি পড়ি না এবং কবিতা আমার কাছে অসার ভাবালুতাপূর্ণ ন্যাকামী ব'লে বোধ হয়। জগতে পড়বার মত কিছু যদি থাকে তবে সে 'ইকনমিক্স'।"

কমলেশ মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমারও ঠিক তাই মনে হয়। এ সম্বন্ধে আমি যা কিছু জানি, তাই দিয়ে যদি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, তা হ'লে বড় সুখী হব। যে বইটা আমার কাছে চেয়ে

পাঠিয়েছিলেন, সেটা দুর্ভাগ্য বশতঃ আমার কাছে নেই, কিন্তু বইয়ের দোকানে অর্ডার দিয়েছি। কাল পশু´র মধ্যেই এসে পড়বে।”

মুক্তির হাসি পাইতেছিল। ঐ শেফালীকে ছোটবেলা হইতে সে জানে। সে প্রায়ই দেখিয়াছে, শেফালীর হাতে একটা ডিটেক্‌টিভ গল্পের বই কিংবা রোমাঞ্চকর উপন্যাস। সে কি না আজ অসঙ্কোচে বলিয়া বসিল, ‘উপন্যাস আমি পড়ি না এবং কবিতা অসার ভাবালুতা মাত্র।’ ইকনমিক্সের প্রতি প্রবল অনুরাগ যে শেফালীর রহিয়াছে, তাহার লেশতম চিহ্ন তাহার বন্ধুজনে কখনও পায় নাই। এই প্রথম পাইল। ইকনমিক্সের প্রতি অনুরাগ শেফালীর অক্ষয় হইয়া থাকুক, মুক্তি তাহাকে ঈর্ষা করে না, কিন্তু ব্যথায় তাহার সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল। কি প্রয়োজন ছিল ইহার। মেয়েমানুষকে কোন একজন পুরুষকে আকৃষ্ট করিতে হইলে সত্যই কি দরকাব হয এত মিথ্যার—এত হীনাচারের! আর সেই আকৃষ্ট করিতে পারার ক্ষমতার উপরেই নির্ভর করিতেছে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ-শান্তি, তাহার মূল্য তাহার বিফলতা তাহার সার্থকতা :—এক কথায় বলিতে গেলে তাহার জীবনের যাহা কিছু সবই।

ঘর হইতে বাহির হইয়া মুক্তি সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইল। বারান্দাব স্থানে-স্থানে টবে নানাবকম ফুল এবং পাতাবাহাব ও লতাব গাছ একত্র করিয়া কৃত্রিম কুঞ্জবচনার চেষ্টা কবা হইয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিযাছে; বাতাসে পুষ্পবিহ্বল উৎসব-রজনীর মাদকতা।

একটি কৃত্রিম পুষ্পবিতানের অন্তরালে চাপা নারীকণ্ঠের তর্জ্জন শোনা যাইতেছে। গলার স্বরে মুক্তি বুঝিতে পারিল, সুজাতা এবং তাহার মা কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। খুব সম্ভব সুজাতারা জানেন না যে, মুক্তি তাঁহাদের নির্জ্জন বিস্রম্ভালাপ শুনিতে পাইতেছে। এ অবস্থায় সেখানে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথোপকথন শোনা অন্যায়। আবার তাড়াতাড়ি

তাঁহাদের পাশ দিয়া চলিয়া আসিলেও তাঁহারা টের পাইয়া সন্ত্রস্ত হইবেন। এ অবস্থায় কি যে করা উচিত, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুক্তি আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুজাতার মা তখন অনতিস্ফুট তর্জ্জনে বলিয়া চলিয়াছেন, "আহা, ন্যাকা মেয়ের ভাব দেখে বাঁচিনে! যেন বোবা, মুখ যেন কেউ ছিপি দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে! দেখ্‌তো তোদের ঐ শেফালীকে, দেখে শিখতে পারিসনে? কত কি বলছে, হাসছে, গল্প করছে। সমাজে মেলামেশা করবার যোগ্যতা হয়নি তোমার? শুধু একরাশ বই পড়তে শিখলেই হয় না, মিলতে মিশতে জানা চাই!"

মা হইয়া মেয়েকে ইহার বেশী আর তিনি মুখ খুলিয়া বলিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার বক্তব্য যে কি, সে বিষয়ে মুক্তির আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সুজাতার মা যেন আর্ত্তস্বরে অনুনয় করিয়া কন্যাকে বুঝাইতে চাহিতেছেন, বিবাহেচ্ছু তরুণ কোন যুবককে আকৃষ্ট কর্, তোর দিকে তার মন ফেরা। তাহাকে আকর্ষণ করিতে তোর যা কিছু কল-কৌশল জানা আছে, প্রয়োগ কর্। নইলে তোর দশাটা কি হইবে শুনি? ওরে নির্ব্বোধ, ওরে মূঢ় মেয়ে, এটুকুও কি তোর জানা নাই! ঐ তো দু'দিন পর শেফালী হয়তো মিসেস্ মিত্র হইবে, বিজলী হইবে মিসেস্ নন্দী। এ জীবনে সুখ, সম্পদ্, গৌরব, নির্ভরযোগ্য আশ্রয়—যা কিছু সবই তারা পাইবে, কিন্তু তোর গতি হইবে কি?

নির্জ্জন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তরুকুঞ্জের অন্তরাল হইতে এই নিদারুণ মর্ম্মভেদী অব্যক্ত আকুতি দুই কাণ ভরিয়া মুক্তি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় ঘরের ভিতর একটা সোরগোল উঠিল, "দেবব্রত রায় এসেছেন, আসুন আসুন। ওরে, একটা চেয়ার এগিয়ে দে, চা আনতে বল। ওঁকে একটা ফুলের মালা দেওয়া হয় নাই।"

সুজাতার মা কন্যা সমভিব্যাহারে দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেলেন। মুক্তি আরও কিছুক্ষণ বারান্দার রেলিং ধরিয়া শীতের হিমবর্ষী শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রির দিকে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে ঢুকিল। ঢুকিয়া অনুমানে দেবব্রত রায় যে কে, তাহা বুঝিতে পারিল। তাঁহার চারিদিকে বেশ ভীড় জমিয়া গিয়াছে। সুজাতা আছে, তাহার মা আছেন, তাহা ছাড়া কেতকী, পুষ্পিলা এবং রেখাও আছে। দেবব্রত তাঁহার ব্যবহারে নারীজাতির প্রতি নির্ব্বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়া মধুর ব্যবহার প্রায় প্রত্যেকেরই সহিত করিতেছেন এবং এখনও অবধি কাহারও প্রতি বিশেষ পক্ষপাত দেখান নাই, এজন্য অনেক কন্যা এবং অনেক কন্যার মাতাদের হৃদয় আশায় আনন্দে দুরু দুরু করিতেছে।

হঠাৎ দেবব্রতর সহিত দ্বারবর্ত্তিনী মুক্তির চোখোচোখি হইয়া গেল। দেবব্রত এক নিমিষের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর আবার চাহিলেন। তাঁহার চোখে তখন যেন আরতির আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

গৃহকর্ত্রী অগ্রসর হইয়া আসিয়া দুই জনের পরিচয় ঘটাইয়া দিলেন। দেবব্রত কহিলেন, "আপনার চোখের মাঝে আমি এমন আলো দেখতে পেয়েছি, যা আর কোথাও খুঁজে পেলুম না।"

মুক্তি কোন প্রত্যুত্তর করিল না।

দূরের একটা কোণ হইতে মুক্তির মাতা শঙ্কিত দৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিলেন।

দেবব্রত পুনবায় কহিলেন, "ঘরে এত লোকের ভীড়ে এই শীতের মধ্যেও গরম বোধ হচ্ছে, একটু বাইরে যাবেন?"

মুক্তির মা তখন কক্ষের অপর প্রান্ত হইতে ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি আসিয়া দেবব্রতকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "আজ আমরা আসি দেবব্রতবাবু। অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনি

বরঞ্চ একদিন যাবেন আমাদের বাড়াতে, বড় খুসী হবো তা হ'লে। এই কার্ড নিন্।"

মেয়েকে সঙ্গে লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

* * *

পরের দিনই দেবব্রত আসিয়া নীচের পড়িবার ঘরে ঢুকিলেন। মুক্তি সে ঘরে ছিল। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দেবব্রত কহিলেন, "কাল কি দেখে এলেন বলুন তো ?"

মুক্তি কহিল, "দেখে এলুম চারিদিকে ভিক্ষার নীরব এবং সরব ব্যাকুলতা।"

দেবব্রত কৌতুকভরা দৃষ্টিতে মুক্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই না কি ?"

দৃঢ়স্বরে মুক্তি বলিল, "এই কি আমাদের দেশের আমাদের সমাজের ছবি ? আধুনিকতার বড়াই—শিক্ষার গর্ব্ব সমস্তই কোন্ অতলতলে তলিযে গেলো ! মেয়েরা লেখা-পড়া শিখছে, গানবাজনা শিখছে, সাজসজ্জা করছে কেবল কি এই জন্যে ? তাদের সমস্ত অস্তিত্ব ব্যাকুল স্বরে ভিক্ষা করছে—'ওগো আমায় নাও, আমায় নাও। দেখ আমার কত আছে। পরখ ক'রে নাও, যাচাই ক'রে নাও।' এই যাচ্ঞায় কত লজ্জা, এ তো আমি আগে জানতুম না ! কাল রাত্রিবেলায় হঠাৎ যেন আমার চোখ খুলে গেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, জীবনে কখনো বিযে করব না। অন্ততঃ এ নূতন প্রথায় নয়। দেবব্রতবাবু, আপনি মাযের সঙ্গে দেখা করবেন না ? তাঁকে কি এইখানেই ডেকে দেব ?"

দেবব্রত কহিলেন, "তাহার সঙ্গে দেখা নিশ্চয়ই করবো, কিন্তু তার আগে একটি কথা জানিয়ে যাই, সংসারে দৈবাৎ এমন এক একজন মেয়ে চোখে পড়ে, যাঁর ভিক্ষা করবার কোন দায় নেই।"

মুক্তি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভাবে বোধ হচ্ছে দৈবাৎ সেই মেয়ে

যেন আপনার চোখে পড়ে গেছে। কিন্তু থাক, ও-সব কথা আর তুলবেন না। এর চেয়ে আমাদের সমাজের পুরোণো কথা ছিল ঢের ভালো। আপনি বরঞ্চ সেই প্রথা মত আমার মা-বাবার কাছে ঘটক পাঠাবেন, হয়ত তাঁরা রাজী হ'লেও হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু দোহাই আপনার, দেবব্রত-বাবু, আমার চোখের মধ্যে কি আলোর সন্ধান পেয়েছেন, তার অপরূপ তত্ত্ব শোনাবেন না। কাল একটি সন্ধ্যায় আমার জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধি অনেক বেড়ে গেছে। আমাদের আধুনিক সমাজের আধুনিকতম পূর্ব্বরাগের পালা আমার সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। দয়া করে আর ও প্রসঙ্গ তুলবেন না।"

দেবব্রত বিস্মিত: হইয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। যখন তিনি আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইয়া মুখ তুলিলেন, তখন মুক্তি আর সে ঘরে নাই, তাহার পরিবর্ত্তে মুক্তির মা একটা পশমের গলাবন্ধ বুনিতে বুনিতে কক্ষে প্রবেশ করিয়া চেয়ারে বসিবার উপক্রম করিতেছেন।

বান্ধবী

১

মালতীর মা মুখ গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—আমি তো তখনই বলেছিলুম, মেয়েকে স্কুল-কলেজে পড়িও না। তখন আমার কথা কানে তুললে না, এখন মজা বুঝ্‌বে।

প্রত্যুত্তরে মালতীব বাবা ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—হুঁ, এতটা যে গড়াবে তা তো আগে ভাবিনি! এখন দেখ্‌চি, তোমার কথা শুনাই ভালো ছিল। কিন্তু···

মালতীর মা নিস্তারিণী দেবী স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতা এবং অবাধ্যতাব জন্য আর একবার তাঁহার উপর ঝাল ঝাড়িবার লোভে বলিতেছিলেন,—আমি ওসব কথার মধ্যে নেই, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌চি। আদার ব্যাপারী যে, জাহাজের খবরে তার দরকার কি? ছেঁসেলে দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলি, সংসার সামলাই,—এতেই আমার ম'রবার ফুবসৎ নেই; দরকাব কি বাপু, আমার বড় বড় কথাব মধ্যে থাকবার! তুমি শোন, তুমিই বোঝ।

অল্পক্ষণ থামিযা, বোধ হয় ইঞ্জিনে ষ্টীম করিবার জন্য দম লইয়া—আবার তিনি কি উদ্‌গিরণ কবিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় সদর দরজাব মোটর বাস আসিযা থামিবার সাড়া পাওয়া গেল; তিনি জানালা দিযা দেখিলেন, কলেজের বাস আসিয়া থামিয়াছে, এবং তাঁহার মেয়ে তাহা হইতে নামিয়া আসিতেছে। তিনি আর বাক্যব্যয না করিয়া পাশের দবজা দিয়া নিঃশব্দে অন্তর্দ্ধান করিলেন। বাসও চলিয়া গেল।

পরক্ষণেই চুড়ির রিনিঝিনি ও হিল-উঁচু জুতাব খুট্ খুট্ শব্দেব সহিত মৃদু কণ্ঠে, "মম চিত্তে, নিতি নৃত্যে কে যে নাচে তাতা-থৈথৈ তাতা-থৈথৈ"

...গান করিতে করিতে কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী মালতী তাহার "ষ্টাডি"তে প্রবেশ করিল। কিন্তু পাশের ঘরে গড়গড়ার নলে ওষ্ঠসংলগ্ন করিয়া মালতীর পিতা নিবারণবাবু গভীর সমস্যায় আচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার এই চিন্তার কারণ উপেক্ষার যোগ্য বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। আজ সকালে পাড়ার লাইব্রেরী হইতে আনীত "প্রিয় সহচরী" নামক উপন্যাসখানি একবার তিনি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বহুকালের এটি অভ্যাস। আজ-কালকার এই অর্ব্বাচীন তরুণগুলার লেখা ভালোও লাগে না, আর মাঝে মাঝে রাগে চোখ-মুখ ঝাঁ ঝাঁ-ও করে বটে, কিন্তু তথাপি নতুন উপন্যাসে নবীনের দল কি সব লিখিতেছে, সেগুলা এক-নজর না দেখিলেও মন খুঁৎ খুঁৎ করে। তাই বইখানি পড়িতে পড়িতে যখন তিনি রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন, সেই সময় তাহার ভিতর হইতে ঠুক করিয়া একখানি চিঠির মত কি পড়িল! পুরু নীলাভ খাম, খামখানি হইতে মৃদু সুগন্ধ উত্থিত হইতেছে। খোলা খাম, এবং তাহার উপরে তাঁহারই মেয়ে শ্রীমতী মালতীর নামটি দেখিয়া তিনি আব কৌতূহল সংবরণ করিতে পারিলেন না। ভিতর হইতে চিঠিটা বাহির করিযা পড়িলেন,—

প্রিয় মালতী দেবী,

আমাদের আজিকার সভা আপনার বহু-বাঞ্ছিত উপস্থিতিতে ধন্য হইবে কি? ভ্রমর যেমন করিয়া মুদ্রিত পদ্মের কাছে অবিশ্রান্ত গুন্ গুন্ শব্দে গুঞ্জন করে, তেমনই আপনার অপরিসীম গুণের কথা আপনার কানের কাছে সর্ব্বদাই গুঞ্জন করিয়া বলিতে আমার উৎকট কামনা উদগ্র। চাঁদ কি আপন সৌন্দর্য্যের কথা নিজে জানে? না জানে না, মনে হয়, সে যেন আত্মবিস্মৃত। আপনিও বোধ করি তাই। যাক্ এ সব কথা। আপনার দর্শনে ধন্য হইবার আশা কি আমাদের মীটিং রাখে? দয়া করিয়া খবর দেবেন একটু। ইতি—আপনার ভক্ত

কোরককুমার দাস

চিঠি পড়িয়া নিবারণ বাবুর পেয়ালার চা পেয়ালাতেই ঠাণ্ডা হইতে

লাগিল। তিনি বিহ্বলের মত বসিয়া রহিলেন। কোরককুমার কে, তাহা তিনি জানেন না। পদবী দেখিয়া মনে হয়, সে কায়স্থ; কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ। নিবারণবাবুর মুখে চা তিক্ত লাগিল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিলেন,—ওগো, একবার শুনে যাও।

গৃহান্তরে তাঁহার স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী তখন গৃহকার্য্যে রত ছিলেন; স্বামীর আহ্বানে দ্বারের কাছে আসিয়া সাড়া দিয়া বলিলেন,—তোমাকে আর এক পেয়ালা চা দেব কি?

নিবারণের তখন কথা বলিবার শক্তিও যেন লোপ পাইয়াছে; হাত নাড়িয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে চিঠিখানা তুলিয়া দিয়া কহিলেন,—প'ড়ে দেখ।

নিস্তারিণী চিঠিখানা পড়িয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন,—সেইকালেই বলেছিলুম, মেয়েকে ইস্কুল-কলেজে অত পড়িয়ে কাজ কি বাপু? কেন, আমরা ক'টা পাশ দিয়েছি? ঘর-সংসার কি ক'রছিনে? তা ছাড়া মাসে এই যে, এক কাঁড়ি ক'রে টাকা গুণ্‌তে হ'চ্চে,—এ কেন, তা শুনি? মেয়ে কি রোজগার ক'রে খাওয়াবে? না, তার বিয়ের সময় আব এক কাঁড়ি টাকা লাগবে না? শুধু শুধু টাকাগুলোর না'হক শ্রাদ্ধ।

নিবারণবাবু কহিলেন,—আমি যে সখ ক'রে মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছি, এমন কথা ব'লতে পারো না। মনে নেই, আগে তোমার মতেই মত দিয়েছি? বারো তেরো বছব থেকেই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধের জন্যে ছুটোছুটি ক'রেচি! ভবানীপুর থেকে চক্রবর্ত্তীরা দেখ্‌তে এ'লো। এসে তো হেসেই খুন!—'বলেন কি, আমার ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ক'রছেন —অথচ আপনার মেয়ে ম্যাট্রিকুলেটেডও নয়! এ তো কচি শিশু বল্লেই হয় মশায়! গাল টিপলে দুধ বার হবে। আরও দিনকতক শিক্ষা দিন।' যত জায়গায় সম্বন্ধ করি, সবারই মুখে ঐ একই ধরণের কথা।—মেয়ে পিয়ানো জানে কি? মণিপুরী নাচ শিখেছে? ম্যাট্রিক পাশ, না

আই-এ পাস, না সিনিয়র কেম্‌ব্রিজ ?' ব্যাপার দেখে আমার চোখ ফুটলো। বুঝতে পারলাম, স্রোত গেছে বদলে। কালের হাওয়ার গতিরোধ করতে বা ফিরিয়ে দিতে পারব না। বরঞ্চ সেই হাওয়ার অনুকূলে না চলতে শিখলে জীবন-যাত্রা অচল হবে। তাই মেয়েকে দিলাম স্কুলে ভর্তি ক'রে। যথাসময়ে ম্যাট্রিকুলেটেড্ হ'লো, নাচ এবং গান শিখ্‌লে, তথাপি জুৎসহ পাত্র জুটলো না। শুধু শুধু বাড়ীতে বসে থাকবে, কাজেই ভর্তি হ'লো কলেজে। এখনো তেমন পাত্র পাওয়া যায়নি, কাজেই কলেজ চ'লছে।

নিস্তারিণী বিরক্তির সুরে বলিলেন,—অত-শত আমি জানিনে, অত চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণও আমাকে দিয়ে হবে না। আর এসব অনাসৃষ্টিও আমি সইতে পারব না, তা ব'লে দিচ্ছি। যেমন পাও, খুঁজে-পেতে শীগ্‌গীর মেয়েব বিয়ে চুকিয়ে ফেল। আর তা যদি না কববে, নিজে যা ভালো বোঝ কর। আমি কিছু জানিনে।

নিবারণ মাথা নাড়িয়া কহিলেন,—আজকাল তা আর হয় না। দু'পক্ষেই পছন্দ করবে, বিচাব করবে। যাই হোক, মালতীকে আমি সব কথা জিজ্ঞেস করব। কোন একটা উপায স্থির করছি। আগে তো এতটা জানতেম না।

নিস্তারিণী সেকালেব মেয়ে। স্বামী কলিকাতার কোন বেসরকারি কলেজের প্রফেসর হইলেও নিস্তারিণী কলিকাতাব আধুনিক সমাজেব বাইরের মানুষ ছিলেন। যে পাড়াগায়ে তাঁহাব বাপেব বাড়ী সেখানকাব ধরণ-ধারণ এত দিন কলিকাতায় বাস করিয়াও তিনি ছাড়িতে পারেন নাই। আজও তাই দিনেব অধিকাংশ সময়ই কাটে তাঁহার রান্নাঘরে। মাইনে-করা পাচকের হাতে খাইতে বা স্বামী পরিজনকে খাইতে দিতে তিনি মনের ভিতর অতৃপ্তি অনুভব করেন। জীবনটা মোটামুটি সচল এবং গুটিকতক ধরা-বাঁধা নিয়মের উপর তাহার ভিত্তি, এইটুকু জ্ঞান তাঁহার

মজ্জাগত ছিল। আর ইহাই আশ্রয় করিয়া দিনগুলিও নির্ব্বিবাদেই কাটিতেছিল। এই ব্যাপারটায় মেয়েটার অপরিসীম বেহায়াপনা ছাড়া আর কিছুই তিনি দেখিতে পাইলেন না। মেয়ের উপর রাগে তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি জ্বলিতে লাগিল।

নিবারণবাবু স্থির করিয়াছিলেন, ধীরে-সুস্থে মালতীকে ডাকিবেন, ততোধিক শান্ত ভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে, মেয়েমানুষের পক্ষে সংযম বস্তুটার কতখানি প্রয়োজন। বাহিরের হুজুগে এমন বিপজ্জনক ভাবে মাতামাতি করাটা অশোভন। কিন্তু তাঁহার 'প্ল্যান্' পর্য্যুদস্ত করিয়া কক্ষান্তরে নিস্তারিণীর তীব্র কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল,—হ্যাঁ লা, তোর কাণ্ড-কারখানা দেখে দিন দিন যে পেটের ভিতর হাত-পা ঢুকে যাচ্ছে! বাপ আরও আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটি একেবারে খেয়েছে, নহিলে মেয়েমানুষের এত সাহস, এত বাড়। ওরে আমার বাপ-সোহাগী মেয়ে!

মালতী মায়ের তিরস্কারে বিব্রত হইয়া বলিতেছে,—মা, দোহাই তোমার, একটু চুপ কর। এখনই পাঁচটা চুয়াল্লিশে কোরকবাবুর আসবার কথা আছে, পাঁচটা চল্লিশ হ'য়েছে; যে কোন মুহূর্ত্তে তিনি এসে প'ড়তে পারেন। তখন কি যে ভাববেন তিনি, বলো দিকি!

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িলে যেমন দুর্ব্বার হইয়া উঠে, তেমনি প্রজ্বলিত কণ্ঠে নিস্তারিণী কহিলেন,—রেখে দে ওসব বক্তিমে! কোরকবাবুই বা কে, আর কুসুম বাবুই বা কে? হিঁন্দু-ঘরের মেয়ে হ'য়ে জন্মেচিস, চাল-চলন শিখলিনে? শুধু দু'পাতা পড়তে-শিখলেই সব শেখা হয় না। এটুকু মনে রাখিস্।

মালতী অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল,—দোহাই তোমার, অমন করে চেঁচিও না, মা! কোরকবাবু বাড়ী ঢুকে যদি শুনতে পান, ব্যথা পাবেন।

কিন্তু নিস্তারিণীর থামিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। নিবারণ-বাবু যে ঘরে বসিয়া ছিলেন, মালতী সেই ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে গিয়া

কহিল,—বাবা, মাধ্যমিক-শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে সভা হবে। আমার বন্ধু কোরক দাস অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান। আমাকে যাবার জন্যে এবং কিছু বলবার জন্যে তিনি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ক'রেছেন। সভাটা আমরা ক'জনে মিলেই এক রকম অরগ্যানাইজ করেছি। কিন্তু মায়ের এ কি রকম হীন সন্দেহ বলুন তো!

নিবারণবাবু কহিলেন,—কই এ বিষয়ে আমাদের আগে কিছু বলোনি তো? যাবে বলে আমাদের অনুমতিও নাও নি। তোমার মায়ের অবশ্য মেজাজটা তেমন ঠাণ্ডা নয়, এবং বক্তব্য বিষয়টাও বেশ সভ্য ক'বে সাজিয়ে-গুছিয়ে ব'লতে পারেন না। কিন্তু তিনি যা ব'লতে চাইছেন, মোটের উপর তা ঠিক। তা'ছাড়া, তোমরা এখন ছাত্র-ছাত্রী, একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানের তপস্যায় নিযুক্ত থাকবে। তোমাদের এ সব পলিটিক্যাল এজিটেশনে যাবার দরকার? সভা-সমিতি এবং এ-ধবণেব অনর্থক হুজুক ছেড়ে দাও।

—বাঃ, আপনি যে কথা বলেন বাবা, তার মানে খুঁজে পাইনে! লেখা-পড়া মানে কি শুধু ডিগ্রী নেওয়া? লাইফটা একটু দেখ্‌বো না? সমাজে, রাষ্ট্রে, জীবনে, যেখানে যা কিছু অবিচাব এবং অন্যায় হচ্ছে—আমরা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে তার প্রতীকার চেষ্টা করবো না?

নিবারণবাবু মেযের উত্তেজিত উক্তি শুনিয়া কি উত্তব দিবেন ভাবিতে-ছিলেন, এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, বাহিরেব বারান্দায় দুই জন বাবু আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা দিদিমণির দর্শনপ্রার্থী।

এলো খোঁপাটায় হাত দিয়া একটু ঠিক করিয়া লইয়া মালতী অনুযোগের সুরে কহিল,—নিশ্চয় কোরকবাবুরাই এসে প'ড়েছেন। মা যে কি রকম গোলমাল সুরু ক'রলেন, না হলো আমার চুল বাঁধা, না হলো তৈয়েরী হ'য়ে নেওয়া। ওঁদের সঙ্গেই আমার মিটিংয়ে যাবার কথা। কে জানে ওঁরা কি ভাববেন!

নিবারণবাবু গড়গড়ায় দুই একটা টান দিয়া কহিলেন,—আচ্ছা যাও, তুমি তৈয়েরী হ'যে নাও গে। আমি ততক্ষণ ওঁদের সঙ্গে আলাপ করছি।—অতঃপর তিনি চাকরটাকে আদেশ দিলেন,—যা, বাবু দু'টিকে এই ঘরে নিয়ে আয়।

তেমন ইচ্ছা না থাকিলেও তাহার বন্ধুদের অভ্যর্থনার ভার পিতার উপর সমর্পণ করিয়াই মালতী সভাস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়া গেল। পর মুহূর্ত্তে দুই জন আগন্তুক সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এক জনের শ্যামবর্ণ রঙ, চোখে চশমা, রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। অপর ব্যক্তি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, বেশ মোটা-সোটা। উভয়েরই বেশভূষা—পায়ের শ্লিপারটি হইতে আরম্ভ করিয়া গায়ের চাদর জড়াইবার ভঙ্গিটুকু অবধি নিখুঁত,—অত্যন্ত আধুনিক।

—নমস্কার! মালতী দেবীর পিতার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য-লাভে আমরা ধন্য হলেম। এ ভাগ্য তো আগে হয়নি।—শ্যামবর্ণের ভদ্রলোকটী মিহি ও মিষ্ট সুরে এ-কথা কহিলেন। একটু কাশিয়া পুনরায় বলিলেন,—আমাদের সভার কথা বোধ হয়, মালতী দেবীব কাছে শুনে থাকবেন। আমারই নাম কোরক দাস। অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান হবার গুরু দায়িত্ব-ভার আমারই অযোগ্য স্কন্ধে প'ড়েছে। এ ভার নিতে আমি সাহসী হতেম না—যদি না আমার এই পরম বন্ধু শ্রীযুত সুজিত চক্রবর্ত্তী এফ, আর, সি, এস, (লণ্ডন), এল, এম, এফ, (এডিনবারা) আর মালতী দেবী—এঁরা দু'জনে আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেন। শুধু সাহায্য নয়, সর্ব্বরকমে সহযোগিতা করতেও।

সুজিত চক্রবর্ত্তী পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া ঈষৎ বিনয় সহকারে হাসিয়া বলিলেন,—না না, কি সব যে বাড়িয়ে বলো তার ঠিক নেই। এই নিন না আমার কার্ড।—তিনি সোনালী হরফে ছাপা একখানা দামী পুরু কার্ড বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন।

নিবারণবাবু কার্ডখানা তুলিয়া দেখিলেন, নামের পশ্চাতে বিস্তর উপাধির হরফ গাঁথা আছে। কোনটা লণ্ডন, কোনটা গ্লাস্‌গো, কোনটা এডিনবারা, কোনটা ক্যাণ্টাব।—দেখিয়া বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিল।

কোরক দাস বলিলেন,—ওঁর এত ডিগ্রী যে, সব ক'টা আমার মনেও থাকে না ছাই! যে কয়েকটা মনে থাকে, তাও আমার উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়, ব'লবার সময়।

চক্রবর্ত্তী পদবী ঠিক তাঁহাদেরই পাল্‌টা ঘর। তাহার উপর ছেলেটির রূপ, গুণ এবং বিদ্যার বহর দেখিয়া নিবারণবাবু মনে মনে একটা অসম্ভব আশা করিয়া অবহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সবিনয়ে নিবারণবাবু কহিলেন,—আপনাব কি করা হয়। নিবাস বোধ করি, এই ক'লকাতা সহরেই?

প্রত্যুত্তরে মুরুব্বিয়ানার হাসি হাসিয়া সুজিতবাবু কহিলেন,—কি করি, সেটা এক কথাতেই অবশ্য বলা যায় না। অনেক কিছু করছি; একটা বিরাট ব্যবসায়ের পরিকল্পনা চ'লছে। মেয়েদের জন্য একটা মেটারনিটিহোম খুলব ভাবছি। পোলট্রির একটা সায়েনটিফিক্ গঠনও মগজের মধ্যে আনাগোনা করছে।—হ্যাঁ, কলকাতাতেই থাকি।

কোরক কহিল,—বুঝছেন না কাণ্ডটা? বাপ রেখে গেছেন অগাধ টাকা। ক'রবার কোন প্রয়োজন তো কিছুই নেই। তবে আমাদের এই পরাধীন দেশ; যাদের শিক্ষা এবং মন আছে, তারা তো কিছু না কিছু না ক'রে থাকতে পারবে না।

কথাবার্ত্তার এই অংশে মালতী ঘবে ঢুকিল। তাহার এলো খোঁপাটা গর্ব্বোদ্ধত বিদ্রোহী নিশানের মত উঁচু হইয়া রহিয়াছে; লাল রেশমেব জামা-কাপড়ের নীচে পরাধীনতার বহ্নিআভা গুমরাইয়া মরিতেছে।

—চলুন, চলুন, কোরকবাবু, আর সময় নেই। আমার জন্যে

এতখানি সময় নষ্ট হ'লো আপনাদেব, এতে আমার লজ্জার অবধি নেই স্নজিতবাবু! আসি তাহ'লে বাবা! ফিরতে এই আটটা সাড়ে আটটা হবে আর কি!

মোটবের ষ্টার্টের আওয়াজ পাওযা গেল, এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে ঝড়ের বেগে যেমন কম্নিযা খডকুটা উডিযা যায, তেমনই কবিযা তিন জনে উধাও হইযা গেল।

নিবাবণবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিযা খানিকটা বিমূঢেব মত বসিযা বহিলেন।

২

এখন আব বেশী তর্কবিতর্কেব প্রযোজন হয না, নিস্তাবিণী কোন কথা বলিতে গেলেই মালতী সদর্পে বলে,—কেন, দেশেব কাজে নেমেছি, কিছু অন্যায কবেছি না কি? বাবা মত দিযেছেন, তিনি আনন্দেব সঙ্গে আমাদেব সমর্থন কবেন, জানো?

সেদিন প্রকাণ্ড এক অভিনন্দন-পত্রে স্নজিত ও মালতীব নাম একত্রে প্রকাশিত হইযা ছাপা হইল এবং বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতবিত হইল। নিবাঁরণবাবুও এক কাপি পাইলেন। মাতৃমঙ্গল সমিতিব প্রতিষ্ঠাতা স্নজিত চক্রবর্ত্তীব অর্থ, হৃদয এবং উদাবতাব সাহত মালতী দেবীব কর্ম্মপ্রেবণা যুক্ত না হইলে এত বড একটা বিবাট কল্পনা বাস্তবে রূপ পাইত কি না সন্দেহ। নাবীব প্রেবণা যে যুগে যুগে পুরুষকে শক্তি দিযাছে এবং পথ দেখাইযাছে, তাহাবই কথা সকলকে স্মবণ কবাইযা দিযা মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠানেব উদ্বোধন-দিবসে তাঁহাদেব উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয এই কথাটি ঘোষিত কবিযা অভিনন্দন থামিযাছে। কিন্তু নিবারণ-বাবুব চিত্ততলে যে লোভ এবং দুশ্চিন্তাব মন্থন একই সঙ্গে চলিযাছিল, তাহা থামিল না, বরঞ্চ আবও বাডিযা গেল। স্নজিতেব সঙ্গে মেলামেশা করা

তিনি খুব জোরের সঙ্গে বারণও করিতে পারেন না। যদি সুজিতের পছন্দ হইয়া যায়, তবে মেয়ের জন্য এত বড় সুপাত্র পণ দিয়া কিনিবার দুরাশা তাঁহার বিনা আয়াসেই পূর্ণ হইয়া যায়। কারণ, সুজিত অবিবাহিত এবং ঠিক তাঁহাদেরই করণীয় ঘর। অথচ এই অবারিত মেলামেশার নিদারুণ ভীতিও তাঁহার মনে সময় সময় খুব প্রবল হইয়া দাঁড়ায়।

'মাতৃমঙ্গল সমিতি'র উদ্বোধন সারিয়া সেদিন রাত্রি প্রায় ন'টার সময় মালতী গৃহে ফিরিল, সুজিত সঙ্গে আসিয়াছিলেন পৌঁছাইয়া দিতে। নিবারণবাবু অন্ধকার বারান্দায় উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করিতেছিলেন। মোটর আসিয়া থামিল, সুজিতসহ মালতী নামিয়া গেট ও কম্পাউণ্ড পার হইয়া বারান্দায় উঠিল। নমস্কার ও বিদায় সম্ভাষণাদি সারিয়া মালতী গৃহে প্রবেশ করিল। সুজিত ফিরিয়া যাইতেছিলেন; নিবারণবাবু ডাকিলেন,—সুজিতবাবু, যদি বিশেষ তাড়া না থাকে, তবে কয়েকটা কথা ব'লতে চাই।

সুজিত ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া নিবারণবাবু সুস্পষ্ট স্বরে কহিলেন,—মালতী আপনার সঙ্গে যে পরিমাণে মেশামেশি ক'রছে, এতে আমাদের সমাজে কথা উঠেছে; জানেন তো আমাদের হিন্দু সমাজ। আপনার কি এটা অনুচিত বোধ হয় না?

সুজিত গাঢ়স্বরে কহিলেন,—আমি জানতেম না, মালতী দেবী আমার জন্যে ক্লেশ সহ্য করছেন, এ কল্পনাও অসহ্য! কিন্তু তবু এইটুকু বিশ্বাস আমার উপর রাখবেন, আমার দ্বারা তাঁর প্রতি কখনো অন্যায় হবে না। আমাকে আপনি বলবেন না, লজ্জা লাগে ভারী। আমি তো আপনার ছেলের মতো।

সুজিত বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেও নিবারণবাবু আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া সেই অন্ধকার বারান্দায় অনেকক্ষণ পায়চারি করিতে লাগিলেন। আজই সকাল বেলায় মালতীর জন্য একটা সম্বন্ধ লইয়া তাঁহার

এক আত্মীয় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। ছেলেটি কাঞ্চনপুরের ওদিক্‌-কার ছোটখাট জমীদার। অন্য সব দিকেই ভালো, তবে পাড়াগাঁয়ে বাড়ী। নিবারণবাবু শুনিয়া তখনই তখনই হাঁ, না কিছুই বলেন নাই। এখন স্থির করিলেন, কাল সকালেই স্পষ্টাক্ষরে না বলিয়া দিবেন। সুজিত আজ তো ভাবে-ভঙ্গীতে এক রকম বলিয়াই ফেলিল। যখন অন্তঃপুরে ঢুকিয়া মালতীকে সঙ্গে লইয়া একত্রে খাইতে বসিলেন, দীপের আলোয় কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অনেক দিন পর স্নেহে তাঁহার মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। এক সময়ে বলিয়াও ফেলিলেন,—সুজিত তোকে কিছু ব'লেছে না কি মা?

মালতী অকস্মাৎ লজ্জায় রাঙ্গিয়া উঠিল। তাঁহার দৃপ্ত তেজস্বিনী সভানেত্রী মেয়ের মুখের এই সলজ্জ আভাটুকু নিবারণবাবুর যৎপরোনাস্তি ভালো লাগিল। মালতী অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে কোন মতে কহিল,—তিনি বলেন, এত দিন পড়লাম, পরীক্ষার আর তো বেশী দেরী নেই···বাকীটা আর সে বলিতে পারিল না; কিন্তু বলিবার দরকারও হইল না। নিবারণবাবু ইঙ্গিতেই বুঝিলেন, বুঝিয়া মনে মনে উদার হাস্য করিয়া বলিলেন,—তাই বটে! তাই সে আজ নিন্দার কথা শুনে অমন ক'রে ভেঙ্গে পড়বার মতো হ'লো। সেই জন্যেই সভাসমিতির নাম ক'রে এত মেলামেশা করে। আজকাল মন জানা-জানি, দু'পক্ষের পছন্দ—এগুলো হ'বার একটা উপলক্ষ তো চাই-ই। তাতে দোষ ধ'রলে চলবে কেন? কোরক দাসের সঙ্গে এতটা মেশামেশি করিলে অবশ্যই তিনি মুস্কিলেন পড়িতেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা নয়।

সেদিন রাত্রিতে নিস্তারিণী যখন রান্নাঘরের যাবতীয় কাজ সারিয়া অধিক রাত্রিতে শয়ন-কক্ষে আসিলেন, তখন নিবারণবাবু সগর্ব্বে স্ত্রীকে কহিলেন,—এই দেখ, আমার কাজের এত যে সমালোচনা করতে, আজ তার ফল দেখ। নিজেদের অবস্থার মধ্যে সুজিতের মত ছেলেকে জামাই

করবার দুরাশা কখনো পূর্ণ হতো কি ? এখন সেই সুজিত নিজেই প্রস্তাব ক'রেছে—সামনের মাসে বি, এ পরীক্ষাটা চুকে গেলেই'···বিলেত থেকে ক'টা পাশ করে এসেছে জানো ? তা ছাড়া চৌরঙ্গীতে দু'খানা, বালীগঞ্জে পাঁচখানা, এস্‌প্লেনেডেও তিনখানা বাড়ী। টাকার কথা না বল্লেও বুঝতে পারবে। মাথার উপর বাপ অভিভাবক নেই যে, রক্ত চক্ষু ক'রে বলবে, দশ হাজাব চাই, বিশ হাজার চাই। নিজে দেখে মেয়ে পছন্দ ক'রচে কি না !

নিস্তারিণীকে স্তম্ভিত এবং বিস্ময়ে হতবাক্ করিয়া দিয়া নিবারণবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। পাশের ঘরে মালতীব 'ষ্টাডি'তে তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বি, এ পরীক্ষার পড়া, তা'ছাড়াও কত কল্পনা, কত মধুর স্বপ্ন, রোমান্স·· ঘুম যেন চোখে আসিতেই চায় না।



প্রায় দিন পনেরো হইল মালতীর পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে। আজকাল সে অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকে, সভাসমিতির হুজুগে মাতিবার ততটা যেন আর আগ্রহ নাই। সুজিতের দামী মোটরখানাও যখন তখন আর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়ায় না। নিবারণবাবু তাহাব সহিত দেখা করিয়া কথাটা পাকাপাকি করিবার জন্য ভিতবে ভিতরে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক দিন হঠাৎ তাঁহাব মনে হইল,—তাই তো, তাঁহাকেই তো কথাটা পাড়িতে হইবে। সুজিত কি নিজে নির্লজ্জের মত আগে প্রস্তাব তুলিতে পারে ? আর হাজার আধুনিক হোক, এই লজ্জাতেই বোধ করি, এখানে আজকাল বড় আসা-যাওয়া করে না।

সুজিতের বাড়ীর নম্বরটা তাঁহার মনেই ছিল। কিছুক্ষণ পরে প্রাসাদতুল্য এক বাড়ীব সুমুখে দাঁড়াইয়া সম্ভ্রমে আনন্দে যখন তাঁহার মনটা ভরিয়া উঠিয়াছে, সেই সময় একখানা মোটর সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুজিত নামিলেন ; গাড়ীর ভিতর আরও জন-দুই সুবেশা তরুণী মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের সুমিষ্ট হাস্যে বিদায়-সম্ভাষণ করিয়া গাড়ীর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতেই, মোটর চলিয়া গেল। তখন এই দিকে ফিরিয়া নিবারণবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতে সুজিত যেন একটু বিব্রত, একটু অপ্রতিভ হইয়া উঠিলেন। নমস্কার করিয়া খাপছাড়া ভাবে কহিলেন,—ওঁরা আমার বান্ধবী।—আপনি এদিকে বিশেষ কোন কাজে এসেছিলেন বুঝি ?

—না বাবা, তোমার কাছেই এসেছিলুম। একটা কথা ছিল।

আচ্ছা তাহ'লে ভিতরে আসুন—সুজিত নীরস স্বরে কহিলেন।

বৈঠকখানা-ঘরের পাশে ছোট একটা ঘরে নিবারণবাবুকে বসাইয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—"আঃ, যা গরম প'ড়েচে! সারা দিন-রাত্রি মাথার উপর পাখা ঘুরচে তবু টি'কতে পারচিনে। মনে করচি, কাল পরশুর মধ্যেই দার্জ্জিলিং চ'লে যাব। আর দেরী নয়।

নিবারণবাবু কহিলেন,—মালতী মায়ের তো পরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেল। তবে কি দার্জ্জিলিং থেকে ফিরে এসেই শুভ কাজটা হবে বাবা ?

সুজিত কহিলেন,—আপনি দেখ্‌চি বরাবরই ভুল বুঝ্‌চেন। মালতী দেবী আমার বান্ধবী। বান্ধবীর পবিত্র সম্বন্ধকে আপনি বিকৃত ক'রে দেখ্‌চেন। অবশ্য সাময়িক মানসিক আবেগে আমি মাঝখানে অন্য রকম একটু ভেবেছিলুম ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' বইটি সম্প্রতি আর একবার যত্ন ক'রে পড়ে ও-ভুল আমার ভেঙ্গেচে। মালতী দেবী চিরদিনই আমার বান্ধবী থাকুন। তিনি যেন ঐ উদার অসীম আকাশ! গণ্ডীর মধ্যে টেনে এনে তাঁর আমি অপমান করতে চাইনে। সত্যি, আইডিয়াটি কত চমৎকার! মার্ভেলাস !!—হাতের কব্‌জি-ঘড়ির দিকে চাহিয়া সুজিত একটুখানি থামিয়া পুনশ্চ কহিলেন,—প্রায় সাড়ে

সাতটা বাজে। আমাকে আবার একবার মার্কেটে বেরুতে হবে—কয়েকটা অতি দরকারী জিনিষপত্র কিনতে। মনে করচি, কালই দার্জ্জিলিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ি। কলকাতায় এই গরমে আর একটা দিনও বাস করতে হ'লে মরে যাব। মালতী দেবী কিছুতেই ভুল বুঝবেন না। বন্ধুর দরদ, বন্ধুর প্রীতির পরে তাঁর করুণ দৃষ্টি আছে। এই যে আমাদের কোরকেরও তিনি বান্ধবী। তাঁরই প্রেরণাতে কত মহৎ কাজ কত মহত্তর আইডিয়া বাস্তবে পেয়েছে রূপ। বান্ধবীকে আমার প্রাণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাবেন। হয় তো দেখা হবে না আর বহু দিন। দার্জ্জিলিং থেকে এসে আর একবার য়ুরোপ অঞ্চলে পাড়ি জমাব ভাবচি। আচ্ছা, উঠি তাহ'লে নমস্কার !

সুজিত ড্রাইভারকে গাড়ী বাহির করিতে আদেশ দিবেন বলিয়া কলিং বেল টিপিলেন। নিবারণবাবু ছাতিটি বগলে চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মা

প্রথম নব-জীবনের সূত্রপাত হইল সরম-রাগরক্ত এক গোধূলিবেলায়। ফাল্গুনের স্নিগ্ধ উদ্ভাসিত অপরাহ্ণ। গোধূলি-লগ্নে বিবাহ। বেলা পড়িয়া আসিতে না আসিতেই কনের মা আসিয়া তরুণী মহলে তাড়া দিলেন, "ওরে তোরা বাজে গল্প রেখে এইবার কনে সাজাতে ব'স না মা। গোধূলিলগ্নে বিয়ে, দেবি আর কত। সময় হয়ে এ'ল ব'লে। চপলাদি ভাই, তুমি সেই নটরাজ শাড়িখানা বার কর। কি বলছ? বেনারসী না পরলে বিয়ে হবে কেমন করে? না না, আজকাল আর ওসব চলন নেই। কালে কালে দিন সময় কতই না বদলে যায়। এই দেখ না আমাদের সময় বিয়ের চেলি ব'লে যে কাপড় দেওয়া হ'ত, সে কেবল হাতে কাটা সুতোর একখানা কাপড় মাত্র। হলুদ দিয়ে সধবারা তার পাড় রাঙিয়ে দিত। আর দেখ্, সোনার সঙ্গে মিলিয়ে বেশ ক'রে ফুলের গয়না পরিয়ে দিস্। চুল এখন বিনুনি ক'রে বাঁধতে নেই, এলো খোঁপায় রেশমী ফিতে জড়িয়ে দিস।"

ফুলচন্দন এবং রত্নালঙ্কারে সুন্দরী অরুণাকে যখন মেয়েরা অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়া তুলিল, তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। রাঙা আভায় চারিদিক ছাইয়া গেছে। অদূরে বিপুল বাদ্যোদ্যমের সহিত বর আসিবার বাজনা শোনা যাইতেছে। বেলা অরুণার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিল, "আজ বাসরে শেলীর অনুবাদ সেই গানখানা গাস ভাই, নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে, তটিনী মিশিছে সাগর সনে।" কনের মাসী আসিয়া কহিলেন, "এখন গল্প করিস নে অরু। গৌরীপূজোয় ব'স্। নটরাজ শাড়ি পরেছিস। নৃত্যতাণ্ডব শিব কাপড়ের রেখায়

রেখায় শাড়ির পাড়ের ভাঁজে ভাঁজে পায়ের তলায় লুটাচ্ছেন। যদি জীবনে এমনই পেতে চাস, শীগ্‌গীর গৌরীপূজোর আসনে গিয়ে বোস। বি-এ পাস কনেরও গৌরীপূজো না করলে পরিত্রাণ নেই।"

কনে অরুণা লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমি কি করব না বলেছি।"

অরুণার বয়স বেশী নয়। আঠার ছাড়াইয়া সবেমাত্র উনিশে পড়িয়াছে। শিশুকাল হইতে তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অপরিসীম মেধাবী চিত্ত। তাহাদের পরিবার উন্নত ও উদার। পিতা কখনও কন্যা এবং পুত্রকে প্রভেদ করেন নাই। মাতা তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত সযত্নে গৃহের কাজ, পরিজনের সেবাযত্ন শিখাইয়াছেন। সেই তাঁহাদের বড় আদরের, বড় গর্ব্বের অরুণার আজ বিবাহ। যে ছেলেটির সহিত স্থির করিয়াছেন সে প্রতিযোগী পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে। নাম সন্তোষ। দেখিতে অতিশয় সুশ্রী।

বাসর-রাত্রিতে অরুণার মুখে ইংরেজী এবং বাংলা দুই রকম গানই সন্তোষকুমার শুনিতে পাইল। এস্রাজের মীড় টানার তারিফ করিল, সেতারের গৎ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া শুনিল এবং উনবিংশবর্ষীয়া তন্বী সুন্দরীব হাত হইতে ফুলের বরণমালা পাইয়া নিজেব জীবনকে ধন্য মানিল। নিজের ভবিষ্যতকে সুখস্বপ্নের সহিত উপমিত কবিল।

অরুণাব মুখেও লজ্জিত অপরূপ আভাব সহিত সুখের একটা ব্রীড়া-চঞ্চল আন্দোলন দেখা গেল।

তার পরে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া শ্বশুরবাড়িতে আসিয়া অরুণা দেখিতে পাইল ছোট্ট সংসার। তাহার স্বামীর মা ছাড়া আর কেহ নাই। আর তা াব বিধবা শাশুড়ীরও এই একমাত্র ছেলে ছাড়া অন্য কোন সুখ, অন্য কোন অবলম্বন, অন্য কোন ছেলেমেয়ে নাই। তাহার স্বামী জীবনের এই পঁচিশটা বছর মা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না।

মা আসিয়া চোখের জল, বোধ করি আনন্দাশ্রু, মুছিতে মুছিতে বৌ

বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। ফুলশয্যার রাত্রিতে অজস্র ফুলে সমাচ্ছন্ন কক্ষে নিভৃতে বসিয়া সন্তোষকুমার মিনতি করিয়া কহিল, "আচ্ছা অরুণা, আস্তে আস্তে একটা গান করবে? কি যে মিষ্টি লেগেছে তোমার গান, বলতে পারি নে।"

অরুণা সঙ্কোচে এবং সুখে কিছু কাল নিঃশব্দে রহিল। তাহার পর মৃদু কণ্ঠে কহিল, "কিন্তু আমি তো শুধু-গলায় গান করতে পারি নে। তোমাদের এখানে এস্রাজ কিংবা হার্ম্মোনিয়াম নেই?"

সন্তোষ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তবে থাক্। না, ওসব যন্ত্রের মধ্যে কোনটাই এখানে নেই। তা ছাড়া মা জানতে পারলে অসন্তুষ্ট হবেন।"

"কি বলছো বুঝতে পারছি নে। গান বুঝি উনি পছন্দ করেন না?"

সন্তোষ অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া কহিল, "কি জানো, সেকেলে মানুষ, ওঁদের সংস্কারে আঘাত দেওয়া···তাই তো আমি বলছিলুম বাজনা না হ'লে যদি না চলে থাক্। যদি এমন হ'তে পারত, তুমি গুন-গুন ক'রে গাইতে, কেবল তুমি আমি ছাড়া কেউ শুনতে পেত না।"

অরুণা চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তাহার পরিপূর্ণ সুখের মাঝে একখানি ছায়াপাত হইল। সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তখনই বুঝিয়া লইল, এখন হইতে অনেক বিধি-নিষেধের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হইবে। গান শুনিতে এমন ভালবাসা সত্ত্বেও স্বামী যখন এতই সহজে আপনাকে দমন করিয়া লইলেন, মায়ের সংস্কারে পাছে এতটুকু আঘাত লাগে বলিয়া ও পথ দিয়াও গেলেন না, তখন তাঁহারই স্ত্রী হইয়া অতঃপর তাহাকেও অনেক কিছু হইতে নিবৃত্তি শিখিতে হইবে।

ক্ষণকাল পরে আস্তে আস্তে কহিল, "আচ্ছা আমার সৌভাগ্য ক্রমে বা দুভাগ্য ক্রমেই হোক আমি যে বি-এ পাস করেছি, এ খবরটা কি মা জানেন না?"

"জানেন বইকি। আমি কিছুতেই বিয়ে করতে সম্মত হচ্ছিলুম না,

অথচ প্রায় দু-তিন বছর আগে থেকেই মা ক্রমাগত তাড়া দিচ্ছিলেন। শেষে তোমার অজিতদা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আনলেন, তাঁর কাছে সব কথা শুনে আমার এমন ভীষণ লোভ হ'ল, তার ওপর তোমার ফটোখানা দেখেই মা'র কাছে প্রায় নিমরাজী-গোছের হয়েছি এমনই ভাব প্রকাশ পেল। মা হাতে স্বর্গ পেলেন। তুমি যদি এম-এ, পি-আর-এস হ'তে তাহ'লেও তিনি বোধ করি লেশমাত্র আপত্তি করতেন না।"

"মা তোমাকে খুব ভালবাসেন, নয়? আর তুমি?"

"আমি? এতদিন আমার জগতে একটি মাত্র সূর্য্য ছিল। তাঁকে ছাড়া বিশ্বজগতে আর কিছুই জানতুম না। আজও তাই জানি। কেবল তার সঙ্গে তোমাকেও জেনেছি। আমার জীবনের আকাশে চাঁদ উঠল।"

তরুণী নববধূ খুব সুখী হইতে পারিল না। আজ মিলন-মহোৎসবের রাত্রিতে যে কেবল একটি মাত্র মুখকে কেন্দ্র করিয়াই আরতি হইবার কথা। সেখানে চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ বর্ষণের কাছে সূর্য্যের আলো তো স্থান পাইবার কথা নহে। সে যে একেবারে অনাবশ্যক।

২

দুই বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

অরুণার স্বামী রংপুরে বদলী হইয়া আসিয়াছেন। এই স্থানটার জল-বায়ু তেমন ভাল নহে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আছে। সময়টা পৌষ মাস। শীতের কনকনে হাওয়া দিতেছে। বসিবার ঘরে আরাম-কেদারায় পায়ের উপর শাল চাপা দিয়া সন্তোষ বসিয়া আছে, এবং অদূরে ষ্টোভ ধরাইয়া অরুণা ওটপরিজ তৈয়ারী করিতেছে। ডাক্তারের কাছে শুনিয়াছিল এই বস্তুটা নাকি অত্যন্ত উপকারী ও বলকারক, তাই সন্তোষের জন্য করিতেছিল। তাহার স্বামীর আশ্বিন মাসে ম্যালেরিয়া হইয়াছিল, তাহার পর অরুণা যথাসাধ্য চিকিৎসা করাইয়াছে। কুড়ি দিনের ছুটি

লইয়া তাঁহাকে হাওয়া বদলাইতে পুরী পাঠাইয়াছে, তথাপি তাহার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি এখনও সারিয়া উঠিতে পারেন নাই। সন্তোষ চেয়ারে চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল এবং মাঝে মাঝে আড়চোখে ষ্টোভটার পানে চাহিতে-ছিল। তাহার সমস্ত মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল এক পেয়ালা সোনার রঙের সুন্দর গরম চায়ের জন্য। কতদিনের অভ্যাস। কিন্তু জানে অরুণার কড়া শাসনে তাহা হইবার জো নাই। তাহার বদলে খাইতে হইবে দুধ এবং চিনি দিয়া তৈয়ারী করা বিশ্রী বিস্বাদ ওটপরিজ। এক সময়ে আর থাকিতে না পারিয়া কহিল, "আচ্ছা বিকেলে না-হয় খাব না, কিন্তু কেবল সকালবেলায় যদি খুব পাতলা এক পেয়ালা চা খাই, তাতে কি কিছু আসে যায়? ম্যালেরিয়ায় চা উপকারী।"

অরুণা হাতের কাজ রাখিয়া স্বামীর মুখপানে চাহিয়া কহিল, "কে তোমাকে বলেছে? তা ছাড়া তোমার তো ম্যালেরিয়া সেরে গেছে। যা আছে, সে কেবল দুর্ব্বলতা, চায়ে কি পুষ্টিকর জিনিষ আছে আমাকে বোঝাও দেখি।"

সন্তোষ কি বুঝাইবে কিছুই যখন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, এমন সময় চাকরটা দ্বারপ্রান্ত হইতে কহিল, "মা, একবার ডাকছেন বাবু।"

"যাই, শুনে আসিগে।" সন্তোষ উঠিল।

"কিন্তু বেশী দেরি ক'রো না যেন। সমস্ত জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে।"

মায়ের মহল বাড়ির দক্ষিণ দিকে। একখানি তাঁর শয়ন-ঘর। আর একখানি ছোট ঘরে পূজা-আহ্নিকের সাজসরঞ্জাম আছে। আর তাহারই এক পাশের একখানা ঘরে সংসারের স্পর্শ বাঁচাইয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া তাঁর রাঁধিবার আয়োজন। ক্ষুদ্র ভাঁড়ার। আরও টুকি-টাকি কত জিনিষ। সন্তোষ সামনের ঘরখানায় ঢুকিবামাত্র দেখিতে পাইল শ্বেতপাথরের থালাতে ফুলকো লুচি, কপিভাজা, বাঁধাকপির তরকারি, পায়েস রাখিয়া মা পাখা-হাতে বাতাস করিতেছেন। চাকর আনন্দক্র

হাতে ধূমোত্থিত চায়ের পেয়ালা। সন্তোষ আর কথাটিমাত্র না কহিয়া পেয়ালার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়া আসনে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আজ কি ব্যাপার মা?"

"ব্যাপার কিছুই নয় বাছা। কাল বিকেলে তোর ঘরের দিকে গেছলুম, দেখি বৌমা খোলা-সুদ্ধ ডিম, শাক পাতা কতকগুলো কি সেদ্ধ ক'রে তোকে দিচ্ছেন। আর লাল মোটা রুটি। জিজ্ঞেস করতে বললেন, এই সবেতেই গায়ে বল হয়। আজকালকার ডাক্তারেরা নাকি বার করেছেন কোন জিনিষের খোসা ফেলতে নেই। ময়দা চেলে পরিষ্কার করতে নেই। ডিম ভাল ক'রে সেদ্ধ করতে নেই। মাগো, ঐ সব অখাদ্য-কুখাদ্যগুলো খেতে তোর কষ্ট হয় না সন্তোষ? সেই যে এতটুকু বেলা থেকে দেখেছি দু'বেলা ঠিক সময়ে চা'টি না পেলে রাগারাগি করতিস্। কিন্তু বৌমা বললেন, 'আমি নিয়ম ক'রে দিয়েছি, চায়ের বদলে ওট্ আর এক বেলা ওভ্যালটিন।' অত সবেব নামও জানি নে।"

সন্তোষ অনেক দিন পরে মায়ের হাতেব রান্না পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে কহিল, "আমিও জানি নে মা। এদিকে যে প্রাণ যায়। সারাদিন ঐ নিয়ে আছে। কবে কোন্ কালে আমার একটুখানি জ্বর হয়েছিল সেই জন্য আজও আমাকে এবেলা এক বকম ওবেলা এক বকম ওষুধ খেতে হচ্ছে। তা ছাড়া—"

"না বাছা তা ব'লো না। বৌমা আমার গুণবতী। কেমন ক'বে স্বামী-সেবা করে তা তো চোখের উপব স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তবে আমরা সেকেলে মানুষ, আমাদের মনে হয, যা খেয়ে তৃপ্তি পায় তাই ক'রে দিই। তৃপ্তিতেই অনেকখানি কাজ হয়। রাতদিন ডাক্তাবী কেতাব ঘেঁটে কি হবে।"

আনন্দর কাছে অরুণা সকালবেলাকার সমস্ত ব্যাপারটা সালঙ্কাবে শুনিল। তাহার পর একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "আনন্দ ওঘর থেকে

আমাকে সেলায়ের কলটা এনে দাও, আর পুরনো শার্ট আর মোজা-গুলো।" সন্তোষ যখন কাছারি হইতে আসিল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, তথাপি সেই প্রায়ান্ধকার আলোকেও স্ত্রীকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া সেলাই করিতে দেখিয়া কহিল, "ওগো, মুখ তোল। কি এত জরুরি সেলাই যে চোখদুটিকে এমন ক'রে পীড়ন করছ।" অরুণা মুখও তুলিল না, কথাও বলিল না। সন্তোষ সেলাইয়ের কলের কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "আমাকে কেন এত উতলা কর তুমি? বল, কথার উত্তর দাও।"

স্বামীর গভীর প্রেমার্ত্ত দৃষ্টির দিকে তাহার অভিমান-করুণ চোখ তুলিয়া সে কহিল, "কি হয়েছে?"

"কেন আমাকে তুমি এমন ক'রে নিলে অরুণা? সারাদিন ভাবছ, আমার শরীর কিসে ভাল থাকবে। সমস্ত সময়টা লাগিয়েছ আমার সেবা করতে, আমার পথ্য তৈরি করতে, আমার আরামের শত সহস্র তুচ্ছাতি-তুচ্ছ খুঁটিনাটিতে। আবার বিকেলে যে-সময়টা তোমার খোলা হাওয়াতে বেড়ান উচিত, তখন অন্ধকার ঘরের কোণে বসলে আমারই কতকগুলো জামাকাপড় মেরামত করতে। বল তোমাকে কি শাস্তি দেওয়া যায়?"

সকালের ব্যাপারটা মনে পড়িতেই অরুণার অভিমান শতধা হইয়া উঠিল। কহিল, "আমার সেবাকে তুমি তো অত্যাচারই মনে কর তাই—"

"না গো, তা মনে করি নে। আমাদের বাগানে রোজ সকালবেলায় সেই যে একটুখানি গোলাপী রঙের স্থলপদ্ম ফোটে দেখেছ তো? তোমার সেবাকে আমি ঠিক তাই ভাবি, কেবল কুণ্ঠিত হই নিজের অযোগ্যতা ভেবে।"

"তুমি কেবল কাব্য ক'রে কথা বলতেই শিখেছ, তা-ই যদি না হবে তাহলে সকালবেলায় আমাকে না-জানিয়ে মায়ের মহলে যেয়ে চা খেয়ে

এলে, আর যা তোমার পক্ষে খুব অপকারী সেই সব খেলে। একবারও ভাবলে না আমি এই নিয়ে কত ভেবেছি, কত পড়েছি। জানো শরীর ভাল রাখতে হ'লে আমাদের কোন্ কোন্ শ্রেণীর ভিটামিন কতখানি ক'রে খাওয়া দরকার। ধব আধ-সেদ্ধ ডিমের মধ্যে শাকসব্জী সেদ্ধ, অপরিষ্কার মোটা আটার রুটির মধ্যে—"

সন্তোষ একটুখানি হাসিয়া কহিল, "মা তোমার মত বিদুষী ন'ন, অত হাইজিনও জানেন না, অত পড়াশোনাও নেই, তবুও তিনি যে মা একথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমি তাঁর যত্ন-করে-রাঁধা খাবার না খেলে তাঁর মনে কতখানি লাগত তা কি বুঝতে পার না?"

অরুণা অস্ফুট স্বরে বলিয়া ফেলিল, "আর জেনেই বা কি করব, অজ্ঞ সেকেলে মেয়েমানুষদের মনেব ধারা বদলানো যায় না, কিন্তু তুমি···"

সন্তোষের চোখের কোমলতা শুকাইয়া উঠিল, অরুণার ধৃত হাতখানা সে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "আব আমি কি, আমিও সেই অজ্ঞ সেকেলে মেয়েমানুষের ছেলে। অরুণা, নিজের মনের মাঝে একটু বিনয় রেখে যদি বুঝতে শিখতে মানুষকে তাহলে বুঝতে···"

অরুণা কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "মায়ের বিষয়ে কোন কথা হ'লেই তুমি যেন খেপে ওঠ। তোমাব সমস্ত যুক্তি বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু আমি তাঁর উপর কখনও কোন দুর্ব্ব্যবহার করি নি। আমি কেবল বলতে চাইছিলুম, যতই স্নেহ থাক তার সঙ্গে জ্ঞান আব শিক্ষাব দরকার। এই যে সেবারে তোমার টাইফয়েডের সময় দু'জন নার্স আর আমি দিবা-রাত্রি তোমার কাছে থাকতুম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধ, ফলেব রস, টেম্পারেচারের চার্ট সমস্তই আমি নিয়মিত ক'রে যেতুম অত মনের উদ্বেগ সত্ত্বেও। কিন্তু তোমার মা দিন আর রাত চব্বিশ ঘণ্টা অনাহারে উপবাসী হ'য়ে ঠাকুর-ঘবে আর তুলসীতলায় পড়ে থাকতেন। কোনই কাজে আসতেন না।"

সন্তোষ কাছারির পোষাক বদলাইতে বদলাইতে কহিল, "তুমি বুঝতে পারবে না অরুণা।"

"কি বুঝতে পারব না ?"

"এই যা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্ক ক'রছ। তুমি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তি পেয়ে মেয়েদের মধ্যে ফার্ষ্ট হয়ে বি-এ পাস ক'রেছ। তার পরে যদি এম-এ পড়তে, তার পরে যদি পি-আর-এস হ'তে তবুও পারতে না। কিন্তু একদিন হয় তো বুঝবে···"

"তাই না কি ? কবে বুঝব ?"

সহসা অকৃত্রিম হাস্যে অরুণার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "যাও যাও, আর ঝগড়া করতে হবে না। কোন্ দিকে যে আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছ এইবারে অনেকটা বুঝতে পারছি।"

"বুঝতে পারছ ? আচ্ছা দাঁড়াও, আরও ভাল ক'রে বলছি।" তাহার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মিষ্টস্বরে কহিল, "কবে বুঝতে পারবে জান, যেদিন মা হবে।"

অরুণা এবারে সত্যসত্যই অভিমান ভুলিয়া গিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "আচ্ছা, থাম। কিন্তু চা খাবার অতই যদি লোভ, একটিবার মুখ ফুটে আমাকে বললেই পারতে। এবেলা তুমি আসবার আগেই আমি লিপ্টন থেকে সবচেয়ে ভাল চা আনিয়ে রেখেছি, যখন ও-জিনিষ না খেয়ে থাকতেই পারবে না, তখন যতদূর সম্ভব ভাল ক'রে তৈরি ক'রে দিই। তুমি হাত মুখ ধুয়ে পাখার তলায় একটুখানি ব'সো, আমি পাঁচ মিনিটে হাজির ক'রে দিচ্ছি।"

৩

মিনিট-পনর পরে স্বামীর সম্মুখে চা ও খাবারের থালাটা অগ্রসর করিয়া দিয়া অরুণা কহিল, "তখন আমার কথায় অত রেগে

গেলে, কিন্তু সত্যি ক'রে বলো তো আমাকে কতখানি ছাড়তে হয়েছে।"

"কিসের ?"

"বাবা সখ ক'রে কত গান শেখালেন। বিয়ের আগে বাপের বাড়িতে আমার অবসর ছিল না, আজ এদের বাড়িতে গান শোনাবার সনির্ব্বন্ধ নিমন্ত্রণ, কাল ওরা আসবে গান শুনতে, পরশু যেতে হবে অমুক পার্টিতে, কিন্তু অত যে, সে সমস্তই বিয়ের সঙ্গে জলাঞ্জলি হয়ে গেল। তাও অনেকের শুনেছি, স্বামী গান ভালবাসেন না, ওসকল বিষয়ে রুচি নেই, কিন্তু আমার তা তো নয়, তুমি এত ভালবাস তবু—"

"তবু মায়ের জন্যে। কিন্তু অরুণা, সেই যে গভীর রাত্রিতে কোন কোন দিন চাঁদ অস্ত গেলে, ছাদের ম্লান অন্ধকারে তোমাকে দিয়ে এস্রাজ বাজিয়ে তোমার মৃদু কণ্ঠের একটুখানি গান শুনি, আমার পক্ষে সে-ই অমৃত। তার বেশী আমি চাই নে। অরুণা, তুমি কিছু মনে ক'রো না, আমি জানি প্রকাশ্যে অনেকের সামনে গান-বাজনা করলে মা মুখে কিছু বলবেন না, কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পাবেন। এই একটুখানি দুর্ব্বলতা তাঁর তুমি মেনে চল। ভেবে দেখ তিনি তোমাকে কত স্নেহ করেন, পারতপক্ষে কখনও কোন বিষয়ে তোমাকে ক্লেশ দেন না। গান-বাজনা কি আর খারাপ জিনিষ···তবে কি জান সেকেলে মানুষ, ওঁরা আবাল্য যে শিক্ষা এবং সংস্কারেব মধ্যে মানুষ হয়ে এসেছেন আজ সেটা এক নিমেষে কাটিয়ে উঠবেন কি ক'রে। আর করবেই তো ভবিষ্যতে। আমার যদি মেয়ে হয়, তাকে আমি খুব গান শেখাব। কেবল যে-কটা দিন মা আছেন, একটু মানিয়ে চলা, এই মাত্র।

অরুণা কিছুক্ষণ নির্নিমেষে তাহার স্বামীর পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা,তোমার মায়ের প্রত্যেক বিষয়ে তোমার এত সতর্ক সজাগতা এমন শ্যেনের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এক-এক সময় বুঝতে পারি নে সত্যি।"

"বুঝতে নিশ্চয়ই পারবে কোন সময়। ছোটবেলাকার কত কথাই কত সময়ে মনে পড়ে যায়। আমার স্কুল থেকে ফিরতে চারটে বেজে যেত, তিনটের সময় থেকে ষ্টোভে কম-আঁচে চায়ের জল চড়িয়ে রেখে মা পথের দিকের জানালাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শীতের দিনে আমি ঘুমিয়ে পড়লে, ভোরে পাছে ঠাণ্ডা লাগে সেই ভয়ে রাত্রি থেকে মাথার কাছে ওয়েষ্টকোট, অলেষ্টার, জুতো মোজা গুছিয়ে রাখতেন।"

অরুণা হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া খাবারের আলমারিটা গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "তোমার খাওয়া হ'ল? চলো একটু বাগানে বেড়িয়ে আসিগে। আমার হাতের কাজকর্ম্ম সারা হয়ে গেছে। আমার জীরা-নিয়ামের গাছটায় একটা নতুন কুঁড়ি হয়েছে জান? আর রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ যা চমৎকার ফুটেছে! সন্ধ্যেবেলায় তুলে এনে ফুলদানিতে ক'রে তোমার লেখার টেবিল দেব।"

৪

আরও দু-বছর পরের কথা।

বৎসর-খানেক হইল অরুণার শাশুড়ীর কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে। সে বৎসর গ্রহণের স্নান উপলক্ষ্যে পুত্র এবং পুত্রবধূর সঙ্গে তিনি কাশীর গঙ্গাতীরে স্নান করিতে যান। তীর্থের মোহ তাঁহাকে এমনই পাইয়া বসিল যে গ্রহণ ফুরাইল, সন্তোষের ছুটি ফুরাইল, সে আসিয়া মাকে কহিল, "মা এবারে ফিরে না গেলে মুস্কিল। পরশু আমাকে কাছারীতে যোগ দিতে হবে।"

সন্তোষের মা কহিলেন, "তোরা যা বাছা। আমি আরও দু'মাস থাকি। রাঙাদি আছে, কায়েত-পিসী আছে। আহা কি চমৎকার, বাবার আরতি দর্শন, দশাশ্বমেধ ঘাটে কথকতা, গঙ্গাস্নান—"

সন্তোষ দু'একবার ইতস্তত করিয়া কহিল, "আচ্ছা, তাহলে তোমার

বৌ তোমার কাছে থাক। তোমাকে দেখাশোনা করবে। একা এ বয়সে কি তোমার থাকা হয়? কিন্তু সন্তোষের মা কথাটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, "পাগল হয়েছিস সন্তোষ! বৌমাকে এখানে রেখে একা তুই থাকতে পারবি ঐ শূন্য ঘরে। যে নাকি আবার একবার আমার বৌমার হাতের সেবাযত্নের স্বাদ পেয়েছে, সে পারবে থাকতে ঠাকুর চাকর নিয়ে একা বাড়িতে!"

সন্তোষ ও অরুণা ফিরিয়া আসিল। তাহার দিন-পনর পরে হঠাৎ তাবে খবর পাইল মা আরতি দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া বুকে বেদনা বলিয়া হঠাৎ শুইয়া পড়েন, তাহার ঘণ্টা দুই পরেই হার্ট-ফেল হইয়া সব শেষ হইয়া যায়।

যাক্ এ সকল অতীতের কথা। এখন বর্ত্তমানে ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। সময়টা শীতকাল। অরুণার শয়নকক্ষের একাংশে দোলনায় পশমের মোজা এবং টুপিতে আপাদমস্তক আবৃত হইয়া একটি নবজাত শিশু শুইযা আছে। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া আলোর নিকটে পশম এবং কাঁটা লইয়া অরুণা কি একটা বুনিতেছে। সন্তোষ বোধ করি বাহিরে গিয়াছিল, এইমাত্র বেড়াইযা ফিরিয়া আসিল। আলনায় ছড়ি ও ওভারকোটটা রাখিযা দিয়া কহিল, "কি করছ? খোকা ঘুমিয়েছে। তাহলে এই অবসরে একটা গান শোনাও না অরুণা। মনটা তেমন ভাল নেই। তোমার গান শুনতে ইচ্ছে করছে।"

"না না, খোকার এই মাফ্‌লারটা আমাকে আজকালের মধ্যেই শেষ করতে হবে। এক জোড়া মোজাও বোনা চাই শীগ্‌গীর। যা ঠাণ্ডা পড়েছে।"

সন্তোষ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "খোকার পোষাকে একটা আলমারী বোঝাই হয়ে গেছে। ওর ক'জোড়া মোজা আছে বল ত? গুণে শেষ ক'রে উঠতে পার? এইটুকু ক্ষুদে মানুষটি কতই প'রে শেষ ক'রে উঠতে পারবে!"

অরুণা নিবিষ্ট মনে সেলাই করিতে করিতে কহিল, "না না, তুমি বুঝছ না, আছে অনেকই। কিন্তু সব দিক দিয়ে সুবিধে হয়, ঠিক এমনটি বেশী নেই। কোন জামাটার হয়ত রঙটা এত বেমানান, কোনটা যদিবা পছন্দসই হয়, গায়ে টিলে হয়। পরাতে গেলেই ঢলঢল করে, সে ভারি বিশ্রী দেখায়।"

সন্তোষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল। বাহিরের শীতার্ত্ত অন্ধকার রাত্রির দিকে চাহিয়া কহিল, "অরুণা একটা কানাড়া সুর গাও না। সেই যে—নীরব করে দাও হে তোমার—"

"ঐ যাঃ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে আমার ঘর পড়ে গেল! বড্ড বকাও তুমি। না না, গান এখন নয় গো। লক্ষ্মীটি, অন্য সময় শুনবে। তুমি জান না, খোকাটা কি দুষ্টু, আর কি পাতলা ঘুম ওর। একটু গানের শব্দ পাবে কি ঘুম ভেঙে যাবে। উঠে যেয়ে আমাকে জ্বালাতন করবে। এখন আমার কত কাজ বাকী রয়েছে যে, খোকার চাদরগুলো ইস্ত্রী ক'রে রাখতে হবে। ওর দুধ খাবার বোতলটা ধুয়ে রাখতে হবে, কি বলছ?···কেন ঝি আছে কি করতে, ওমা! কি যে বলো ঠিক-ঠিকানা নেই তার। শুনলে না সেদিন ডাক্তার দাস ব'লে গেলেন নিজের মুখে যে, ছেলেদের খাওয়ানোর বোতল আর তার রবারেব মুখীগুলি যেন মা-লক্ষ্মীরা নিজের হাতে পরিষ্কার ক'রে ধুয়ে রাখেন। ঝি-চাকরের হাতে এর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে না ব'সে থাকেন। এর থেকেই যত—"

"তাহ'লে তোমার একবারেই অবসর নেই বলো।" সন্তোষের মুখে চাপা হাসির উজ্জ্বলতা।

"হাসছ যে বড়। সে কি আর ব'লে দিতে হবে, নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছ না।"

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অরুণা সেলাই করিতে

করিতে মুখ না তুলিয়াই সহসা কহিল, "আহা, আমার শাশুড়ী যাওয়ার আগে যদি খোকাকে দেখে যেতে পেতেন, তাঁর বড় সাধ ছিল—"

সন্তোষের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে একটা যন্ত্রণাব মোচড় দিয়া উঠিল।

অরুণা হাতের সেলাই ফেলিয়া নিঃশব্দ লঘু পদসঞ্চারে উঠিয়া খোকাব দোলনার নিকট গিয়া তাহাকে মৃদু মৃদু দোলা দিতে দিতে অস্ফুট স্ববে কহিল, "তোমার যে কত লেগেছে তা বুঝতে পারি, আমি তো ভাবতেই পারি নে খোকার জীবনে এমন এক সময় আসবে, তখন আমি থাকব না। অথচ জানি জগতের নিয়মে তাই হয়ে আসছে। এইটুকু ছেলে, এত নিঃসহায, এখন আমি এক দণ্ড না দেখলে ওর চলে না। অথচ একদিন—"

অরুণা দোলনায় একটুখানি দোল দিয়া পালঙ্কের উপর খোকাব শয্যার শিয়রের কাছে একটি টিপয়ে তাহাব ছোট গরম ওভারকোট, শাল, মোজা এবং টুপি গুছাইরা রাখিতে লাগিল।—"জান, খোকাব বড সর্দ্দি হয়েছে। কি ক'রে যে ঠাণ্ডা লাগলো বুঝতে পাবি নে। এত সাবধানে রাখি তবু—। এই দেখ না সকালে, খুব ভোরে ওর ঘুম ভেঙে যায। পাছে ওকে তুলে নিয়ে কাপড়-জামার আলনার কাছে গিযে পরাতে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, সেই ভয়ে মাথার কাছে সব গুছিয়ে বাখছি। শহরে ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, কি যে হবে তাই ভাবছি।"

"অত কেন যে ভাব বুঝতে পারি নে। ওসব কিছুই হবে না খোকাব। ও কেবল তোমার কল্পনার ভয়।"

৫

তাহার পরে দিন-পনর কাটিয়া গেছে।

কয়েক দিন হইতে দুর্জ্জয় শীত এবং তাহার সঙ্গে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি

পড়িতেছে। সন্তোষেব বাড়িব সামনে একখানা মোটর দাঁড়াইল। বাহিবেব সদরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু ঘরে কেহ নাই। গৃহস্বামী অত্যন্ত অস্থির হইয়া বাবান্দায পাযচারি কবিয়া বেড়াইতেছিলেন। মোটর দাঁড়াইবাব শব্দ শোনামাত্র সন্তোষ তাড়াতাড়ি গেটের কাছে নামিয়া আসিল। সিভিল সার্জ্জেন এবং এক জন নার্স গাড়ী হইতে নামিলেন।

"আপনি আবও এক জন নার্সের জন্য আমাকে ফোন কবেছিলেন মিঃ বসু ?"

"হ্যাঁ, আব একজন নার্স ভাবী দবকাব। আমাব স্ত্রী আর কিছুই পেবে উঠ্‌ছেন না। তিনি মনে ভযানক উৎকণ্ঠায একরকম পাগলের মত হযে গেছেন। তাঁব উপব নির্ভর ক'বে সেবা-শুশ্রূষার কোন কাজই আর তাঁব হাতে ছেড়ে দেওযা যায না।'

"খোকা এখন কেমন আছে ?'

"আমি কিছুই বুঝতে পাবছি নে। চলুন, ভিতবে গিযে দেখবেন চলুন। আমাব মনে হচ্ছে ওব নিঝুম ভাবটা আবও বেড়েছে।'

নার্সকে আহ্বান কবিয়া বলিল, "আসুন মিসেস রায। উঃ, কি শীত আব বাদল পড়েছে, বোদ না উঠলে মনে একটুও আশা হচ্ছে না। আপনি মনে কবছেন আমাদেব কুসংস্কাব, কিন্তু তা নয। আমাব কেন জানি না খালি খালি মনে হচ্ছে বোদ না উঠ্‌লে—"

"কি বাজে বকছেন মিঃ বসু, নিজেব ছেলেব অসুখ হযেছে বলেই কি এত উতলা হযে পড়তে হয। আপনি নিজে একজন শিক্ষিত পুরুষমানুষ হযে যদি এমন কবেন তাহ'লে আপনাব স্ত্রী যে আবও কববেনই। আসুন।"

তিন জনে নিঃশব্দ পদসঞ্চাবে ভিতবের দিক্‌কার একখানি ঘরে ঢুকিল। সে ঘবে স্তিমিত আলো। শুভ্র বিছানার উপব একটি ক্ষুদ্র শিশু ঘুমাইযা আছে, এক জন নার্স আলোব নিকট ঝুঁকিযা হাতেব রিষ্টওয়াচ-টাব সেকেণ্ডেব কাঁটাব দিকে চাহিযা শিশুর নাড়ীব স্পন্দন গুণিতেছে।

"কেমন দেখলেন ?"

"আমার মনে হচ্ছে ক্রমশঃ ভালর দিকে যাচ্ছে। আপনি দেখুন। এই খাতাটায় টেম্পারেচারের চার্ট এবং আরও অন্যান্য বিষয় সমস্তই লেখা রয়েছে।"

"দেখছি। দেখুন, আপনি ততক্ষণ একটু গ্লুকোজ তৈরি করুন।"

ডাক্তার শিশুর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বহুক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে তাহাকে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "মিঃ বোস, আর কোন ভয় নেই। ভগবানের দয়ায় আপনার ছেলের জীবনের আশঙ্কা কেটে গেছে। আপনি যেটাকে নিঝুম ভাব ব'লে ভয় করেছিলেন, সেটা আর কিছুই নয়, ক্লান্ত শরীরের গাঢ় ঘুম। আপনার স্ত্রী কই ? এ ঘরে তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। যান, তাঁকে শীগ্‌গীর খবর দিয়ে আসুন। আমি বল্‌ছি, কাল সকালবেলা উঠে নিশ্চয় দেখবেন, পূব দিকের ঐ খোলা জানালাটা দিয়ে আপনার ঘরে রোদ এসে পড়েছে।"

সন্তোষ স্ত্রীর খোঁজে গিয়া দেখিল, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মাঝে সেই দুর্জ্জয় শীতে কাপড়ের অঞ্চল মাত্র গায়ে দিয়া অরুণা তুলসীতলায় ধ্যানস্তব্ধের মত বসিয়া আছে।

"কি পাগলামি করছ ? শেষে নিজে অসুখ বাধিয়ে একটা কাণ্ড ক'রে বসবে নাকি ? ঘরে চল, শোন, ডাক্তার গুপ্ত এসেছেন। বললেন, শুনিয়ে দিতে, খোকা ভাল আছে। তার আর কোন ভয় নেই।"

"তুমি এইমাত্র খোকাব ঘব থেকে আসছ ?"

"হ্যাঁ।".

"সে আমার বেশ শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে তো ?"

"খুব ঘুমোচ্ছে।"

"আর এক জন নার্স এসেছে ? ঠিক ঠিক ফলের রস, গ্লুকোজ, ওষুধ সমস্ত পড়ছে তো ?"

"হ্যাঁ, সমস্তই ডাক্তারের কথামত সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, তুমি চল, আমিও যাচ্ছি এখনই।"

সন্তোষ চলিয়া গেল। অরুণা গলায় বস্ত্রাঞ্চল জড়াইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে করিতে কহিল, "ভগবান, তুমি রক্ষা কর। আর কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই।"

অতিথি

আজ তিন দিন হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রতিমা ভোর-রাত্রিতে চুপ করিয়া বিছানায় শুইয়া কান পাতিয়া ছিল। ঠিকা ঝিটা এখনই আসিয়া কলতলায় বাসন নাড়ানাড়ি করিবে, সে-শব্দ শোনা যায় কি না। গত তিন দিন হইতে বৃষ্টির অছিলাতেই বোধ করি বা ঝি আসে নাই। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে তাহাকে একা-হাতে রান্নাবান্না বাসন-মাজা সমস্তই করিতে হইয়াছে। আজও যদি সে না আসে, এ আশঙ্কায় ভোরবেলা হইতেই তাহার মনটা তিক্ত হইয়া উঠিল। বাহিরে অজস্র ধারাপাতে বৃষ্টি পড়িতেছে, ষ্টেশনের কাছে বাড়ী, ভোরের ট্রেনটা আসিতেছে। তীব্র বাঁশীব শব্দ এই বিছানায় শুইয়াই স্পষ্ট শোনা যায়। মুহূর্ত্তের জন্য ঠিকা-ঝিয়ের ভাবনা ভুলিযা প্রতিমা অন্যমনস্ক হইয়া গেল। এই ট্রেনের শব্দে কত কথাই যে মনে পড়াইয়া দেয়। যে-ট্রেন একটু ক্ষণের জন্য ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আবাব ছুটিবে, কত নদী কত প্রান্তর পার হইয়া দেশ-দেশান্তরে ছুটিয়া চলিবে, তাহারই গতিবেগের সহিত মনও ছুটিয়া চলিতে চায়। ভোবের অস্পষ্ট আলোয়, বৃষ্টির ধারাগান শুনিতে শুনিতে চোখের সম্মুখে ছবিব মত অতীত জীবনখানি ভাসিতে থাকে। সেই যখন সকালবেলায় উঠিয়া পূব দিকেব বাবান্দায় সে কিছুকাল চুপ করিযা বসিয়া থাকিত। এই সময়টায কখনও এস্রাজ বাজাইত। তাব পর পড়াশোনা শেষ করিয়া তাহাকে কলেজেব জন্য প্রস্তুত হইতে হইত। সেখানে কত কথা লইয়া আলোচনা, তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ, গল্প ;—মনটা বিশ্বস্রোতের উপব ভাসমান থাকিত একটি বিকশিত কমলের মত। একখানি রূপে রসে গন্ধে ভবা সদাজাগ্রত মন বিশ্ব-চেতনার মাঝখানে দলে দলে আপনাকে মেলিযা ধবিতেছে। গানেব সুর তাহার চারিদিক্ ঘিরিয়া ছল ছল করিতেছে, তাহাকে নন্দিত,

ঝঙ্কৃত করিতেছে। সকলেই একবাক্যে বলিত, প্রতিমার গান যে একবার শুনিয়াছে, তাহার সাধ্য কি যে তাহা ভুলিয়া যায়। গানের সুরে প্রতিমার অন্তর আপনাকে মেলিয়া ধরে, যেন কথা কহিয়া উঠে। অনেকেই গান শেখে, কিন্তু প্রতিমার মত করিয়া গাহিতে পারে ক-জনা! সেদিনটাও এমনই ভোরবেলা ছিল। প্রতিমা প্রতিদিনের অভ্যাসমত বাগানের ধারে পূব দিকের বারান্দাটায় পায়চারি করিতে করিতে আপন মনে একখানি ভজন গাহিতেছিল। সে গান কাহাকেও শোনাইতে হয়ত গাহে নাই। ভোরের আকাশের বিলানপ্রায় নক্ষত্র এবং প্রভাতের শিশিরভেজা বাতাস সে গানের নির্ব্বাক্ শ্রোতা ছিল। এমন সময় পিছন হইতে কে বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "গান যে এমন হয়, হ'তে পারে, ভাবি নি কখনও তা। অনেক জায়গায় অনেক শুনেছি তো। কিন্তু ঠিক এমন ··" প্রতিমা পিছনে ফিরিয়া দেখিল এক জন সুবেশ যুবক রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে গেটের কাছে একটা ছ্যাকরা গাড়ী দাঁড়াইয়া, তাহার মাথায় বিছানা এবং বাক্স। বুঝিল আগন্তুক এখনই আসিয়া পৌঁছিল। অতিথি প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "আমি সন্তোষ। রেঙ্গুন থেকে আসছি। প্রথমে কলকাতায় এসেছিলুম। তার পর রাত্রির ট্রেনে সেখান থেকে ছেড়েছি। আপনার মামাবাবু সম্ভবতঃ এখনও ওঠেন নি। মাপ করেন তো তাহলে একটা অনুরোধ করি। আমি ঐ গাড়োয়ানটার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নীচের বাগানে বসছি, আপনি আর একটা গান করুন। সম্ভবতঃ আমার এই অসঙ্গত অদ্ভুত কথায় আপনি বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু আপনি এইমাত্র যা গাইছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনার যদি আভাসেও কোন ধারণা থাকত তাহ'লে বুঝতে পারতেন এমন অদ্ভুত কথা আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত হয়েও কেমন ক'রে বলতে পারছি। তখন আর অবাক্ হতেন না।"

প্রতিমা আর গান গাহিল না। বলিল, "আপনি তো সম্পূর্ণ অপরিচিত নন। মামাবাবুর মুখে আপনার কথা আমি শুনেছি। আপনি যে আজ-

কালের মধ্যে আসবেন তাও জানতুম। কিন্তু আমার মনে হয়, মনে হয় কেন, আমার দৃঢ়বিশ্বাস আপনি নিজেও গান জানেন। নইলে…”

এমনই করিয়া প্রথম-পরিচয়ের সূত্রপাত হইল। প্রতিমার মা নাই, বাবা নাই, আপন বলিতে তেমন কেহ নাই। তাহার মামার কাছেই ছোট হইতে সে মানুষ। মামা লোকটি ছিলেন এ যুগের পক্ষে একান্ত বেমানান। এমন মুক্তহস্ত সদাশিব ব্যক্তি আজকালকার দিনে দেখাই যায় না! নিজের অবস্থা বা ওজন কোনটাই না বুঝিয়া পরকে সাহায্য করিতে ছুটিতেন, যত দুব ক্ষমতা স্নেহ দিয়া আশ্রয় দিয়া মমতা দিয়া আশ্রিতদের ঘিরিযা বাখিতেন। মামার কাছে প্রতিমা সুখেই মানুষ হইতেছিল—তাহার মা নাই, তাহার বাবা নাই, ভাই নাই, গৃহ নাই, এমন ভযঙ্কব কথাগুলা কোন দিন মনে উঠিবার অবকাশ মাত্র হয় নাই। দিন-কয়েক হইল তাহাব মাতুল উপেন্দ্রনাথের নিকট বেঙ্গুন হইতে এক খানা চিঠি আসিযাছিল। তাঁহার বাল্যবন্ধু শশাঙ্কশেখর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলে সন্তোষ কিছুদিন তাঁর বাড়িতে থাকিয়া ওকালতি কবিবে। পসাব একটু জমিলেই বাসা করিয়া অন্যত্র উঠিয়া যাইবে। প্রথম দিকেব কয়েকটা মাস একটু সাহায্য চায়। অজানা অচেনা দেশ, একেবারে একা দিশাহারা হইবে। সেই সন্তোষ আজ আসিয়া পৌছিযাছে। এমনই ভোবেব ট্রেনেই সে আসিযাছিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে। কাবণ সে আসিয়া পৌছিবার এক মাস পরেই উপেন্দ্রনাথ এক দিন বাত্রিতে বিছানায ঘুমাইলেন, আর উঠিলেন না। ডাক্তারেরা বলিল, হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রাত্রি আড়াইটা আন্দাজ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সেটা প্রতিমার সেকেণ্ড ইয়ার। অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়াশোনা করিযা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীময় একটা আর্ত্তরোলে ঘুম ভাঙিল। সেদিনও এমনি ভোরবেলা। তখনও শুকতারার আব্ছা ছায়াটুকু একেবারে যেন আকাশের কোল হইতে অপসৃত হয় নাই।

ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইল উপেন্দ্রনাথের ঋণের বোঝা। আশ্রিতের দল ভোজবাজীর মত নিমেষে কোথায় মিলাইয়া গেল। সন্তোষের দিকে কেহই মনোযোগ দেয় নাই। কবে এক দিন কোন বিস্মৃত সকালবেলায় সে যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তেমনই অকস্মাৎ কলিকাতায় চলিয়া গেল। তার পর প্রতিমার দিদিমার প্রাণপণ চেষ্টায় এক-শ টাকা মাহিনার এক জন ষ্টেশন-মাষ্টারের সহিত প্রতিমার বিবাহ হইয়া গেল। যদিচ শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী, কিন্তু পণের ঘরে একেবারে শূন্য। তাই অনাথা প্রতিমা যে অক্লেশে এমন একটা আশ্রয় পাইযা নিশ্চিন্ত হইয়া গেল তাহাতে তাহার মামীমারা একবাক্যে তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, পাড়া-পড়শীরাও করিল। আর একটা এমনই আব্‌ছা আলো-অন্ধকারে জড়ানো ভোরবেলায় প্রতিমা ট্রেনে চাপিয়া তাহার স্বামিগৃহের উদ্দেশে যাত্রা করিল। আর্দ্র বর্ষণমুখর সকালবেলায় ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্‌ শুনিয়া হঠাৎ মনে হয়, দশ বছরের যবনিকা সরিয়া গিয়াছে—প্রতিমা যেদিন লাল রঙের বেনারসী পরিয়া পায়ে অলক্তক-চিহ্ন আঁকিয়া স্পন্দিত বক্ষে স্বামীর অজানা গৃহে যাত্রা করিয়াছিল, সেদিন যেন আজই।

স্বপ্নের সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। দোরগোড়ায় ঝিয়ের খন্‌খনে আওয়াজ আসিল, "বৌমা কি আজ বিছানা ছেড়ে উঠ্‌বে না গো! এক পহর বেলা হ'তে চলল, কখন আমি বাসন মেজে ব'সে আছি। শিলের কাছে না-আছে মশলাপাতি সাজানো, না পেয়েছি কয়লার ঘরের চাবি!"

এক নিমেষে প্রতিমা দৈনন্দিন জীবনের রূঢ়তায় ফিরিয়া আসিল। ঝিয়ের কাংস্যকণ্ঠের প্রত্যুত্তরে সেও গলা চড়াইয়া কহিল, "আজ চার দিন পরে এসে ভারি আমার মাথা কিনেছ, অমনি মেজাজ দেখান হচ্ছে। মাইনের বেলায় তো একটি পাই-পয়সা ছেড়ে কথা কও না, আর কামাই যখন কর তখন কিছু মনে থাকে না, নয়?"

শহর-অঞ্চলের ঠিকা ঝিদের প্রকৃতি যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা

জানেন একবার তাহাদের মুখ ছুটিতে আরম্ভ করিলে কিরূপ কর্কশ ব্যাপার দাঁড়ায়।

ঝি তারস্বরে চেঁচাইতে লাগিল, এখনই তাহার মাহিনা চুকাইয়া দেওয়া হোক, এমন দুর্ব্বিনীত মনিবের বাড়ীতে একটা বেলা, এক ঘণ্টাও আর তাহার পোষাইবে না।

এ-সব কথার মূল্য কি, তাহা প্রতিমা আজ দশ বৎসর ক্ষুদ্র ষ্টেশন-কোয়াটার্সে এক-শ টাকা মাস-মাহিনার ঘরের ঘরণী হইয়া হাড়ে হাড়ে জানিত। তিক্ত মুখে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া হাত দিয়া মাথার চুলগুলি বিন্যস্ত করিয়া লইতে লইতে সে বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিল। ঝিয়ের চীৎকারে প্রতিমার স্বামী রাখালবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি বিরক্ত হইয়া স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "আঃ, এই সকালবেলাতেই বকাবকি সুরু করলে কেন? জ্বালাতন! দিন দিন তোমার কি যে ঝগড়াটে স্বভাব হচ্ছে। কাল বৈঠকখানাতে সন্ধ্যেবেলায় বঙ্কুবাবু, নরেনবাবু, আমি সবাই বসে আছি। তোমার বকাবকি, চেঁচামেচি কার সঙ্গে সুরু হ'ল। ভদ্রলোকরা আড়ালে মুখ টিপে হাসাহাসি করতে লাগ্‌লেন। আমি লজ্জায় মরি। ছি ছি, এমন দজ্জাল স্ত্রীকে নিয়েও আমায় ঘর করতে হয়। আমি ব'লেই পারি। অন্য কেউ হ'লে এক কাণ্ড হয়ে যেত।"

প্রতিমা মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া কহিল, "রেখে দাও তোমার ভদ্রলোক আর ভদ্রতা। যা ক'রে সংসার চালাতে হয়, সে শুধু আমিই জানি। কাল সন্ধ্যেতে মেছুনি বলে, আট আনা দর নেব; আধ ঘণ্টা বকাবকি ক'রে তিন আনায় আধ সের মাছ কিনলাম। এদিকে মিহি গলায় বলা হয়, ভদ্রলোকরা কি মনে করলেন! ওদিকে মাছ নেই ব'লে রোজ ভাত খাওয়া হয় না, রোজ ঝগড়া। মাছ আনতে কে বাজার যাবে শুনি? আমি যাব? ঝি তো চার দিন এ-মুখো হয় নি।" রাখালবাবু বেগতিক দেখিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। ঝি বাহির হইতে আর এক

দফা তাড়া দেওয়ায় প্রতিমা আর কথা বলিবার অবসর পাইল না। মুখ-হাত ধুইয়া ঘর-সংসাবের বিলিব্যবস্থা সারিয়া ঝিকে বাজারের পয়সা গুণিয়া দিয়া প্রতিমা স্বামীর দিকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিল এবং আর একবার ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "নাও, এবার দয়া ক'রে উঠে চা খেয়ে নাও। চা হাতের কাছে এগিয়ে না দিলে বিছানা ছেড়ে উঠব না, এ আবার কি বদ অভ্যেস বাপু! সারাদিন এই ভূতের মত খাটুনি, অত পারি নে!"

সামনেই একটা আয়না টাঙানো ছিল। হঠাৎ সেই দিকে চোখ পড়িয়া যাওয়ায় প্রতিমা দেখিল তাহার প্রতিবিম্ব। আটাশ বছরের এক বুড়ী তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুখে উগ্র কটু ভাব, সারা মুখে কোথাও লেশমাত্র লাবণ্যের আভাস নাই—সামনের চুলগুলি উঠিয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণের জন্য সে বিমনা হইয়া গেল। দশ বছর আগে শতদলের মত যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আজ ঝিয়ের সহিত বচসায় এবং মেছুনিব সহিত গলাবাজিতে তাহার সমস্ত দলগুলিহ কি কুৎসিত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে? গোপন অন্তরালে কোথাও এতটুকু শোভা, এতটুকু গন্ধ কি তাহার প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই? না-হ যদি থাকিবে, তবে আজ বর্ষণক্লান্ত প্রভাতেব ধূসব আলোয ট্রেনেব শব্দে তাহার দূরবগাহ মন কোন্ অতল স্মৃতি-সমুদ্রের মাঝে ডুব মারিয়াছিল? মানুষের মন মরিয়াও মরে না, এও কি তার প্রমাণ?

রাখালবাবু চাযেব পেযালা তুলিয়া লইয়া একটা হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "এক পেয়ালা চা দেবে তার এত লেক্‌চার কেন? আর মেয়ে-মানুষে খাটবে, সেটা আর এমন নূতন কথা কি? যখন স্রেফ একটি পয়সা দাবি না ক'বে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম, সে তো এই যে, বড়সড় মেয়ে এসে ঘর-গেরস্থালার কাজকর্ম্ম করবে। নহলে মনেও ক'রো না যে তোমার গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম, বা তোমার কেতাবি বিদ্যার বহর দেখে ভুলেছিলাম, সে-পাত্র আমি নই। অমন আই-এ বি-এ

পাস করা মেয়ে আজকাল গণ্ডায় গণ্ডায়, যেদিকে দু-চোখ চাও।”

ছোট ছেলে নেবু ও বড় খোকা সন্তু এতক্ষণে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ক্রন্দন ও কলকোলাহল তুলিল। ছোট বাড়ী, রান্নাঘরের কাঁচা কয়লার ধোঁয়ায় এই দিক্‌টা আচ্ছন্ন হইবার জো হইল। প্রতিমা বাক্যবাণ বর্ষণের অবসর পাইল না। সংসার শতসহস্র শিখা বিস্তার করিয়া তখন তাহার শুষ্ক জীবনকে অধিকার করিয়াছে—একটি মিনিট থামিবার আর অবসর নাই, আশেপাশে চাহিয়া দেখিবার নিমেষমাত্র সময় নাই।

ঝি বাজার লইয়া আসিয়াছে। ছোট খোকার সামনে চারটি শুক্‌নো মুড়ি ফেলিয়া দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া প্রতিমা ভাতের ফেন ঝরাইতেছিল। ঝিয়ের গলা শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিল। হাতে হলুদের ছোপ, কাপড়খানা ময়লা। ঝি ‘যুদ্ধং দেহি’ স্বরে কহিল, “চার আনা সের পটোল, তার আধ পয়সা কমে দেয় না। নিতে হয় নাও বাপু, না নিতে হয় নিও না।”

প্রতিমা কঠিন সুরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া ঝিকে কথাটার অসম্ভাব্যতা এবং তাহার চুরির প্রবণতাটা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইবার জন্য কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, দরজার কাছে জুতার ভারি আওয়াজ পাওয়া গেল। রাখালবাবু এক জন সুদর্শন সুবেশধারী আগন্তুক সহ তথায় প্রবেশ করিলেন। ভাবখানা নিরতিশয় প্রসন্ন। হাঁক দিয়া কহিলেন, “ওগো, এই দেখ তোমার সন্তোষদা, চিনতে পার? ব্যাঙ্কিং ইউনিয়নের বড়বাবু। ভদ্রলোক আমাদের বাসা খুঁজতে সারা শহর খুঁজে বেড়িয়েছেন। বললেন, তোমার মামাবাবুর কাছে কিছু দিন থেকে নাকি ওকালতী করেছিলেন। তেমন সুবিধে না হওয়ায় চাকরির খোঁজে থাকেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, বরাত জোর—তার উপর নিজের গুণ,

তার ফলে অতি অল্প দিনে এই উন্নতি। নাও, চটপট ক'রে আয়োজন কর। আজ উনি এখানেই থাবেন। আলাদা ক'রে হোটেলে থাকতে চাচ্ছেন এখানে যে কয়েক দিন কাজের জন্য থাকতে হয়। কিন্তু আমি ছাড়ছি নে। হ'লেই বা গরীবের কুঁড়ে, এ ক'টা দিন এখানে থাকতে হবে কষ্ট ক'রে।"

প্রতিমা মুখ তুলিয়া চাহিল। এই সেই সন্তোষ, যে দশ বছর আগে প্রথম এক দিন সকাললোয় তাহাকে দেখিয়াছিল বাগানের পাশে বারান্দায় নবোদিত সূর্য্যের ছটায় সুরের ঝরণাধারার মাঝে।

সে দৃষ্টি-স্মৃতি এখনও প্রতিমার মনে ম্লান হয় নাই। আজ কি না সেই অমরাবতী হইতে নামিয়া আসিয়া এই দৃশ্যের মাঝে নিজেকে দাঁড় করাইতে হইবে! এক দিকে ছোট খোকা ধুলাসুদ্ধ মুড়ি ফেলিয়া প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। সামনেই আঁশের বঁটি, স্তূপাকার আলু-পটোল শাক বেগুন ছড়ানো। পটোলের দর লইয়া সে ঝিয়ের সহিত প্রাণপণে চেঁচাইতেছে—মাথার চুল রুক্ষ, পরনের শাড়ীতে হলুদের ছাপ, মুখে কটু তিক্ততার সুস্পষ্ট রেখা। কেমন করিয়া গৃহস্থালীর এই ছবিসমেত সে আপনাকে লুপ্ত করিয়া ফেলিবে তাহাই একান্ত ব্যাকুলতার সহিত অন্বেষণ করিতে করিতে কোনক্রমে একটা নমস্কার সারিয়া প্রতিমা অস্ফুটস্বরে কহিল, "তোমরা বাইরের ঘরে ব'সো। আমি চা তৈরি ক'রে নিয়ে যাই।

ঝি অবাক হইয়া গেল, প্রতিমা বাজারের পয়সা লইয়া আর তাহার সঙ্গে লেশমাত্র বচসা করিল না। মিষ্ট কথায় কহিল, "বাজারের খাবার আর দেব না, আমি ততক্ষণ চায়ের জল চড়িয়ে দিই, তুই যা তো মা, চট্ ক'রে ঘি ময়দা কিনে এনে দে।

ধূল্যবলুণ্ঠিত রোরুদ্যমান ছেলেটা প্রতিদিনের মত মায়ের গালাগাল এবং চড়চাপড় আশা করিয়াছিল। তাহার বদলে প্রতিমা সযত্নে তাহাকে

ধূলা হইতে উঠাইয়া গা-হাত মুছাইয়া, ফরসা জামাকাপড় পরাইল, চুল আঁচড়াইল। আজ তাহার গৃহে অতিথি আসিয়াছে, যে-অতিথি জীবনের নব-প্রভাতের আলোকে তাহাকে দেখিয়াছিল ; সেই দেখাটুকুকে কোন ছলেই সে ম্লান হইতে দিতে পারে না। এখানকার লোকে তাহার কি পরিচয় জানে, সে সমস্তই তো মিথ্যা জানা—সত্যকার পরিচয় অল্পক্ষণের জন্যও যে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিল, তাহার সত্য সে বিলীন হইতে দিবে না।

মিনিট-দশেক পরে মেছুনি বড় মাছ লইয়া আসিল, মাছ নেবে গো মা। প্রতিমার শান্ত স্মিত মুখের দিকে, সুবিন্যস্ত কেশপাশের দিকে সে একটুখানি বিস্মিত হইয়া চাহিল। মাছ কেনা হইল নিঃশব্দে। মিষ্ট হাসিয়া প্রতিমা শুধু অনুরোধ কহিল, "এই ক'দিন রোজ বড় মাছ দিয়ে যেও বাছা। বাড়ীতে লোকজন এসেছেন।"

ভাত খাইতে বসিয়া অদূরে উপবিষ্ট প্রতিমার দিকে চাহিয়া সন্তোষ কহিল, "আজকাল আপনি আর গান করেন না শুনলুম। কিন্তু কেন যে করেন না তা এইবার ক্রমশঃ বুঝতে পারছি।

রাখালবাবু খাইতে খাইতে কহিলেন, "কেন আর করে না, সময় পায় না। রাঁধা-বাড়া, কাজকর্ম্ম, ছেলেপিলে সামলানো।" সে-কথায় তেমন কর্ণপাত না করিয়া সন্তোষ কহিল, "তার কারণ ক্রমশঃ মনে হচ্ছে যে-গান গাইতেন এক দিন, আজ সে-গানের সুকুমার সুরটিকে নিজের জীবনে আর গৃহস্থালীতে ব্যাপ্ত ক'রে দিয়েছেন। তাই যেদিকে চাইছি সেই দিকেই সামান্য জিনিষ, সামান্য উপকরণ থেকেই একটি শান্তি ও সৌন্দর্য্যের আলো দেখতে পাচ্ছি।" রাখালবাবু পটোলের একটা আস্ত-দোলমা মুখে পুরিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, মেয়েমানুষে ঘর-কন্নার কাজ নিখুঁৎ ক'রে চালাতে পারলে তবেই বাহাদুরি তাকে দিই। সেটা উচিত বটে। খুবই উচিত।"

হাতপাখা লইয়া আস্তে আস্তে বাতাস করিয়া দিতে দিতে প্রতিমা

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, বড় করিয়া দাবি করিলেই সমস্ত সত্তা প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াও আপনাকে সেই দাবির সমান বড় করিয়া তোলে। আর ছোট মাপের বাঁধা-বরাদ্দমাফিক শ্রদ্ধাশূন্য দাবি মানুষকেও তিলে তিলে শ্রদ্ধাবিহীন, শক্তিবিহীন, শিথিল জড় করিয়া তোলে। তাহার প্রমাণ সে নিজে। তাহার দৈনন্দিন জীবন প্রতিদিন প্রতিরাত্রি শুধু তাহাব কাছে আশা কবিয়াছিল, মেয়েমানুষ হইয়া থাকা। যেমন তেমন করিয়া হোক, দায়সারা করিয়া হোক, কলহ করিযা হোক, র াঁধা-বাড়া, বাসন-মাজা, ঘবগেরস্থালী চালানো—এটুকুর অধিক কেহ দাবি করে নাই। তাই কি সে আপন অজ্ঞাতসারে তিলে তিলে মরণের অধিক মরিয়া গিয়াছে? তাই কি সে ভুলিয়া বসিয়াছিল, এক দিন তাহারই গানেব সুরে আকাশেব তারা অতন্দ্র হইয়া থাকিত—তাহার চোখের আলোয কত মনে আরতিব আলো জ্বলিয়া উঠিত! যে-কথা সে ভুলিয়া বসিয়াছিল, তাহার সেই বিস্মৃত জীবনের সহিত জড়িত এক জন অতিথি তাহাদের বাড়ীতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আতিথ্য গ্রহণ কবিয়া কি সে-কথা তাহাব মনে পড়াইয়া দিয়া গেল!

নারীর মূল্য

১

সকালবেলায় সবেমাত্র খবরের কাগজটি টানিয়া লইয়া বসিয়াছি, পাশের প্রতিবেশী-বাড়ী হইতে ঘন ঘন শাঁখ বাজিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি চিন্তা করিয়া বাহির করিবার পূর্ব্বেই সহাস্য মুখে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গৃহিণী প্রবেশ করিলেন ; করিয়া বলিলেন, "আহা এত দিন পরে ওদেব বাড়ীর নীরজার একটি খোকা হ'ল। বাবাঃ মেয়ের উপর মেয়ে, শাশুড়ীব খোঁটা আর স্বামীর মুখভারের জ্বালাতে নীরজা বেচারা এত দিন যেন চোরের মত থাকত। সব দোষ যেন কেবল তারই। তিন মেয়ের পবে এত দিনে একটি খোকা হয়েছে তার। তাই বেজে উঠেছে শাঁখ, তাই ওদের বাড়ীতে আনন্দের যেন বান ডেকেছে। কাঙালী-বিদেয় হচ্ছে, বামুনদের একখানা ক'রে কাঁসার থালা, পেতলেব ঘড়া ও একজোড়া ক'বে কাপড় দান দেওয়া হচ্ছে। গুরুঠাকুরকে একখানা গিনি দিয়ে গিন্নী প্রণাম করলেন। খোকার ষষ্ঠীপূজোর দিনে দেবতা-বামুনের কাছে আবও দানধ্যান করা হবে।"

গৃহিণী এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া প্রতিবেশিনী সখীর আনন্দে ও সৌভাগ্যে আন্দোলিতা হইয়া প্রভাত-বায়ুস্পর্শে প্রফুল্ল হিল্লোলিত লতাব মত লঘু চঞ্চল পদে আমাব জন্য চা আনিতে প্রস্থান করিলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম।

বাঙালী ঘরে ছেলেতে মেয়েতে এতই পার্থক্য! আকাশপাতাল ব্যবধান। ছেলে হইলে সবারই মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিবে, ঘন ঘন শাঁখ বাজিবে। আর মেয়ে যদি দৈবক্রমে জন্মাইল, জননী নিজেকে মনে

করিবেন অপরাধী, পরিজনের কাছে তাঁহার মাথা হেঁট হইবে। নবজাতা অতিথিটির জন্য মানব-সংসারে কোথাও কোন অভ্যর্থনা কোন সম্মানের আয়োজন হইবে না।

হস্তে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা লইয়া গৃহিণী প্রবেশ করিলেন। আমার চিন্তা তাঁহার সরস বচনরাশিতে ছবির মত মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। যে-কথা লইয়া চিন্তা করিতেছিলাম, মনের সেই তারেই তিনি ঘা দিলেন। নিকটস্থ চৌকিতে বসিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই কহিতে লাগিলেন, "মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরে মেয়ে হ'লে সে যেন কি একটা বিষাদের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বছর-দেড়েক আগেকার কথা মনে পড়ছে আমার—ঐ নীরজারই তৃতীয় মেয়েটি যখন হয়। দাই বললে তাকে, 'কেমন গোলাপফুলের মত ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে, এক বার চোখ মেলে দেখ বৌমা।' কিন্তু নীরজা সেই যে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল, কিছুতেই আর এদিকে মুখ ফেরালে না। আমিও একবার অনুরোধ করলাম তাকে, 'পাশ ফের্ না ভাই! তোর মেয়েকে যে পিঠ দিয়ে চাপা দিচ্ছিস।' কান্নাভরা সুরে নীরজা বললে, 'পিঠই লাগুক আর পাটই লাগুক, মেয়ের মুখ আর যেন আমাকে দেখতে না-হয়, এই আশীর্ব্বাদ ক'রো দিদি।' কত দুঃখে যে বেচারা সে-প্রার্থনা জানিয়েছে তা বুঝতে পেরে আমি চুপ করে রইলাম।"

আপিসের বেলা হইয়া আসিতেছিল, আমি হঠাৎ বলিলাম, "শোভা-মাকে আমার একবার ডেকে দাও ত। কি করছে সে। তার মাষ্টার এখনও যায় নি?"

শোভা আমাদের একমাত্র দুহিতা। তাহাকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। একমাথা কোঁকড়া চুল লইয়া সে ঝাঁপাইয়া আসিয়া আমার কোলের উপর পড়িল। খানিকটা আপন মনে হাসিয়া লইয়া বলিতে সুরু করিল, "জান বাবা, মাষ্টারমশায় কি বোকা? খরগোসের চোখ যে লাল তা জানেন না, আর কাঠ-বিড়ালীর পিঠে যে রামচন্দ্রের আপন হাতের পাঁচ

আঙুলের ছাপ আছে তা কিছুতেই বুঝতে পারেন না। উনি বলছিলেন, 'সেতু বাঁধতে সাহায্য করেছিল ব'লে রাম খুশী হযে যে-কাঠবিড়ালীব পিঠে হাত বুলিযে দিয়েছিলেন, সে ত কোন্ কালে মরে ভূত হয়ে গেছে। তাই বলে সেই হাতেব ছাপ কি এখনও এত কাল পরে অন্য সবারই পিঠে থাকবে না কি? এ যে হয় না, হতে পারে না, এ ত অতি সোজা কথা।' সত্যি তাই বুঝি বাবা?"

আমি কোন জবাব দিবার পূর্ব্বেই শোভার মা বলিলেন, "আহা, মুখ-পোড়া মাষ্টারেব কি শিক্ষাব ছিবি! এখন থেকে মেয়েটার মাথা খাওয়া হচ্ছে। মেয়ে-মানুষকে ছোট থেকে শেখাতে হবে। বিশ্বাসে মিলয়ে ভক্তি, তর্কে বহু দূব। তা নয়, যত সব বাজে কুতর্ক কবতে শিখিযে ওকে বিগড়ে দেবার ফন্দী।"

শোভা মাযের কাছে কটূক্তি শুনিযা মুখ ভার কবিয়া ছল ছল চোখে তথা হইযা উঠিযা গেল। আমি ক্লেশ পাইযা বলিলাম, "দেখ, আমি অন্তত আজ অবধি ছেলেতে মেযেতে কোন তফাৎ কবি নি, আমাব যে ছেলে নেই, ঐ একমাত্র মেয়ে, তা নিয়েও কখনও কোন ক্ষোভ করি না, সে কথা ত তুমি জান। তবে কেন ওসব কথা বলে মেযেটাব মনে দুঃখ দিলে?"

গৃহিণী কোন বাদ-প্রতিবাদ কবিযা সময় নষ্ট না কবিযা সংক্ষেপে গম্ভীব ভাবে কহিলেন, "মা-বাপে মেয়েকে শুধু আদরই দিতে পাবে কিন্তু তাব ভাগ্য ত আব গড়ে দিতে পাবে না। এই কথাটা শুধু মনে বেখ, তাহলেই অনেক কথা, আজও যা বুঝে উঠতে পার নি, বুঝতে পারবে।"

তর্ক করা বৃথা। শোভাব মা হয়ত ঠিকই বলিয়াছেন, বাঙালী ঘরের মেয়ের ভাগ্যে যে কি হইবে ভবিষ্যতে, তাহা সঠিক করিযা বলিতে বোধ করি বা স্বয়ং বিধাতাপুরুষও পারেন না। সমস্ত কিছুর জন্যই তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখা প্রয়োজন।

মেয়ের মাও বোধ করি আপন অজ্ঞাতসারে মনে মনে এই কথাটাই পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। সহসা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এ ত আর ছেলে নয় যে, জোর খাটবে। যা খুশী করতে পারব। তাই সদাই ভয়ে ভয়ে থাকি। বকলে মনে কষ্টও হয়, অথচ আদর দিতেও ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু আর না, থাক ওসব বাজে কথা। তোমার যে স্নানের সব তৈরি। নাও ওঠ। ঘড়ির পানে একবার চেয়ে দেখেছ কি কত বেলা হয়েছে।"

২

বিকালের দিকে বাড়ীতে কিঞ্চিৎ অতিথি-সমাগম হইয়াছিল। মিসেস দাস এবং মিসেস গুপ্তা তাঁহাদের স্বামী ও কন্যা সমভিব্যাহারে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। মিসেস গুপ্তার মেয়েটি স্কটিশ চার্চ্চে বি-এ পড়ে এবং মিসেস দাসের কন্যা বেথুনে আই-এ পড়ে। মেয়েরা কিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া টেনিস খেলিতে উঠিয়া গেল। তাহাদের মায়েরা নিজেদের সুখ-দুঃখের আলোচনায় নিমগ্ন হইলেন। মিষ্টার দাস অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, আমি বলিলাম, "আপনাদের সমাজেই দেখছি মেয়েদের যথার্থ সম্মান আছে। বস্তুতঃ পূর্ব্ববঙ্গের ঘরে-ঘরেই দেখি মেয়েরা আই-এ, বি-এ পড়ছে। নিতান্ত তাড়াতাড়ি দায়-সারা-গোছের তাদের একটা বিয়ে দিয়ে দেবার গরজ নেই। এই ত চাই!" আমার এবম্বিধ উচ্ছ্বাসে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া মিষ্টার দাস একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামীর হইয়া জবাব দিলেন, "হায় হায়, আপনার বুঝি এই ধারণা মিষ্টার মুখার্জ্জি? মেয়েদের আমরা দায়ে পড়েই অনেকটা পড়াচ্ছি। ভাল বর কোথা? আমাদের সমাজের অধিকাংশ ভাল ছেলেই আজ জেলে। যারা বাইরে আছে, তাদের মধ্যেও বড় সরকারী চাকুরে খুব কম। কি করব বলুন, বিয়ে দিয়ে তার পরেও ত

আর কিছু সারাজীবন ধরে মেয়ের ভার বহন করা যায় না। তার চেয়ে দেখেশুনে না-হয় দেরি করেই দেওয়া ভাল। এই দেখুন না, আমার রেবার জন্যে কত দিন থেকে বর খুঁজছি। ম্যাট্রিক দিয়ে লম্বা ছুটিটা যে পেলে তার মধ্যে তিন-চার জায়গায় সম্বন্ধ করা হ'ল, কত জায়গা থেকে মেয়ে দেখেও গেল, কিন্তু কোথাও শেষ অবধি আর ঘটে উঠ্‌ল না। তার পর এই ত সামনের মাসে আই-এ দিচ্ছে, এবারে পরীক্ষা হয়ে গেলেও ছুটিটার মধ্যে আর একবার চেষ্টাচরিত্র ক'রে দেখতে হবে। দেখা যাক কপালে কি আছে। ছুটির সময়ে ছাড়া অন্য সময়ে এ-সব বিষয় নিয়ে বেশী টানাহেঁচড়া করতে গেলে আবার মেয়েরা রাগ করে। তারা বলে, বিয়ে ত হবেই না, শেষে পরীক্ষাটাও ফেল করব, এও কি তোমরা চাও? হাজার হোক তারা বড় হচ্ছে, তাদের কথা একেবারে ঠেলে ফেলাও যায় না।

মিসেস গুপ্তা সুদীর্ঘতর আর এক নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমার মাধুরও ত তাই। আই-এ পাস করেও যোগাযোগ হ'ল না, অগত্যা দিলুম বি-এতে ভর্ত্তি করে। সত্যি শুধু চুপ ক'রে ত আর বাড়ীতে ব'সে থাকতে পারে না!"

মেয়েরা টেনিস খেলা সমাপন করিয়া কলরব করিতে করিতে ঘরে ঢুকিল। ঈষৎ বিষাদ এবং অনুকম্পাভরে তাহাদের দিকে চাহিলাম। ঐ রংবেরঙের জর্জ্জেট্ শাড়ী, ঐ বি-এ, আই-এ, পাস ঐ গান শেখা, এস্রাজ বাজানো, টেনিস খেলা, কিছুই তাহা হইলে অকৃত্রিম নয়। এ শুধু রুদ্ধনিশ্বাসে যোগাসনে বসিয়া বিবাহের সম্ভাবনার প্রতীক্ষা করা। না, বলাটা ভুল হইল, এ সাধনার পালাটা সরব। তপস্যার উৎকণ্ঠা আছে কিন্তু প্রশান্তি ও স্তব্ধতা নাই। মেয়েদের আসিতে দেখিয়া অন্য কথা পাড়া হইল। অতিথিদের চা-পানের আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার জন্য গৃহিণী উঠিয়া অন্যত্র গেলেন।

অন্ধকার রাত্রিতে খোলা ছাদে শুইয়া স্পন্দিত কম্পিত অথচ বিরাট স্তব্ধ প্রশান্ত নক্ষত্রজগতের দিকে চাহিয়া থাকা আমার এক বহু দিনের অভ্যাস। গৃহিণী যে-সময়টা ঘরের মধ্যে রেডিও শোনেন, কিংবা অবাধ্য কন্যারত্নকে কিঞ্চিৎ সঙ্গীতবিদ্যা অর্জ্জন করিবার জন্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেন, সেই সন্ধ্যাবেলাটায় আমি কিছুতেই ঘরের মধ্যে বসিতে পারি না। এজন্য আমাকে তিনি প্রায়ই অনুযোগ করেন। বলেন, "কি বেরসিক লোক গো! গান-বাজনায় একটু মন নেই। অন্ধকার ছাদে একলা ভূতের মত ব'সে থাকতে কি যে ভাল লাগে!"

আমি হাসিয়া বলি, "তোমাদেবও আজকালকার আধুনিক বাংলা গানের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝি না। আমার কাছে সমস্তই একাকার মনে হয। প্রত্যেক গানেই দেখি, দু-চারটা প্রিয় আছে, দক্ষিণ সমীরণ আছে, উতলা নিশ্বাস এবং অকারণ আঁখিজল আছে, বলতে কি একটা গান যে কোথায শেষ হয়, ও আব একটা কোথায় আরম্ভ হয়, তাও ধবতে পারি না।"

শোভার মা আমার কথা শুনিয়া এত রাগিয়া ওঠেন যে, যথোচিত বকুনিব ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া তথা হইতে চলিয়া যান।

আজও চিরদিনের অভ্যাসমত ছাদের এক প্রান্তে আরাম-কেদারায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। সময়টা গ্রীষ্মকাল, দিনান্তরম্য দক্ষিণ বাতাস সত্যই বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। চাকরে পূর্ব্বাহ্ণে ছাদের সানবাঁধানো মেঝে ঠাণ্ডাজল দিয়া ধুইয়া দিয়াছে। টব হইতে রজনীগন্ধা ও যুঁইফুলের মৃদুমিষ্ট সৌরভ আসিতেছে। এমন সময়ে, আঃ কি সর্ব্বনাশ, প্রতিবেশী কোন এক বাড়ীর ছাদ হইতে তরল বালিকা-কণ্ঠের বেসুরো একটা গান হইতে সুরু হইল। ভাবে বোধ হইল বালিকা ছোট বেলা হইতে গান

কখনও শেখে নাই, কিন্তু এক দিনেই তানসেন হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার জাগিয়াছে। রাত যখন দশটা তখনও তাহার গলা অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। এত ভুল হইতেছে, এত বেসুরো হইতেছে, তবুও বিরাম নাই। আমি মনে মনে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা করিতেছিলাম, "হে ভগবান, সঙ্গীতযশপ্রার্থিনী এই মেয়েটিকে এবার থামাইয়া দাও। অন্ততপক্ষে একাদিক্রমে দু-তিন ঘণ্টা গান করিয়া তাহার গলার তেজও কি একটুখানি কমাইয়া দিতে পার না? এ যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে!" রাত্রি দশটার পরে বাজনা থামিল। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া যখন ভাবিতেছি, এইবারে খাওয়াদাওয়া সারিয়া আসিয়া ছাদের নির্জ্জনতাটুকু হযত অব্যাহত পাইব, ঠিক সেই সময়ে মিনিট-পাঁচেক বিশ্রাম করিয়া মেয়েটি আবার গাহিয়া উঠিল,

(যদি) দখিন সমীরণে, বেদনা বাজে মনে
ছল ছল করে আঁখি অকারণ—

বিরক্ত হইয়া সেখান হইতে উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময় স্ত্রী আহারের জন্য ডাকিতে আসিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ঐ মেযেটি জান? দেখছি গানের ওপর বেজায় ঝোঁক।"

স্ত্রী প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিলেন, "ঐ ত সেই বোসেদের নিরু গো। বেচারা গান জানে না ব'লে পাত্রপক্ষেরা আর সব পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও অপছন্দ করলে। তা মেয়েটার অধ্যবসায় দেখ, এই তিন-চার মাসেই উঠেপড়ে লেগে এমন গান শিখছে যে, এবারে যদি কেউ দেখতে আসে, গান জানে-না ব'লে অপছন্দ করবার আর যো নেই। কিন্তু চল, আর দেরি ক'রো না। তোমার খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিয়া আমি ধীরে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অদূরবর্ত্তিনী ঐ মেয়েটির অবিশুদ্ধ সুরতানলয়ের সঙ্গীত অকস্মাৎ আমার কাছে একটি অপূর্ব্ব করুণায় মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল।

এ শুধু তার কাছে গান নয়, জীবন-মরণের সমস্যা। কোন খেয়ালী বরপক্ষ আবার যদি তাহাকে দেখিতে আসিয়া গান-জানার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে, তখন তাহাকে পিছাইয়া দাঁড়াইলে আর চলিবে না। আমাদের দেশের মেয়েদের ইহার বাড়া সমস্যা আর নাই। তাহার মূল্য যে কতখানি সে কথার চরম বিচার এই কষ্টিপাথরেই যাচাই হইবে। যাচাই হইবার আর কোন উপায়, আর কোন পথ নাই। একটু আগে মনে মনে সে বেচারাকে ঠাট্টা করিয়াছিলাম বলিয়া বিধিমত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলাম এবং আপন অজ্ঞাতসারেই বোধ করি চক্ষুপ্রান্ত ঈষৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল।

প্রতিক্রিয়া

শ্রীমতী নির্ম্মলা দেবীর সমাজে বেশ একটু মান-সম্ভ্রম আছে। মাসিক পত্রে তাঁর কয়েকটি রচনাও ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়েছে। সে রচনাগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাতে আধুনিকতার সমর্থন কোথাও নেই। নারীর ধর্ম্ম যে গৃহকাজে এবং সে গৃহ সুখের হোক দুঃখের হোক একমনে তাকেই বরণ করে নিয়ে কল্যাণীরূপে তাকে সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হবে এই কথাটা তারস্বরে তিনি তাঁর নানা লেখায় বলেছেন। আদর্শ মহিলা হিসাবে সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি। কোথাও নূতন মেয়ে-ইস্কুল হ'লে লোকে আগে গিয়ে তাঁকে ধরে, উদ্বোধন তাঁকে করতেই হবে। অমনি মেয়েদের আদর্শ শিক্ষার একটা বিবরণও পাওয়া যায় নির্ম্মলা দেবীর অভিভাষণে। সম্প্রতি দত্তদের ইলা নামে মেয়েটা একটু বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। পরশু সে নাকি বারোটায় বাড়ী ফিরেছিল। বাড়ী ফিরেও দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মিষ্টিসুরে কার সঙ্গে গল্প করছিল। তার আগের দিনই বুঝি রাত নটা-দশটার সময়েও লেকের বেঞ্চে বসে সে গান গাইছিল। এ-সব ভাল লক্ষণ নয়। সঙ্গদোষে শত গুণ নাশে। তার এ-রকম দৃষ্টান্তে সমাজের অপরাপর পাঁচটা মেয়ের ক্ষতি হ'তে পারে এই কথাটাই নির্ম্মলা মিসেস বোসকে প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাচ্ছিলেন, কারণ ইলা তাঁরই ভাইঝি। মিসেস বোস সখেদে বললেন, "কি করব ভাই নির্ম্মল, সবাই যদি তোমার মত আদর্শনারী হ'ত তাহলে আর ভাবনা কি ছিল! ইলা আমার নিজের ভাইঝি হ'লে কি হবে, তার জন্যে আমি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত হয়ে থাকি। যখন-তখন এ-বাড়ী আসে। আমার নীরু-তরু-সুশীকে বিগড়ে না দিলে

বাঁচি। কিন্তু ভাই আমাকে যদি আধ ঘণ্টার জন্যে মাপ কর, আজ পাঁচটার সময় জজ সায়েবের আর কালেক্টারের স্ত্রীর অনাথসদনের জন্যে চাঁদা নিতে আমার এখানে আসবার কথা আছে। মনে ক'রে রেখেছি অমনি তাঁদের একটু চা খাইয়ে দেব। তার উদ্‌যোগ-আয়োজন হচ্ছে। কেক আর পুডিংটা আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে। আধঘণ্টার মধ্যেই আসছি। ততক্ষণ তুমি বরঞ্চ আমাদের মেয়ে-স্কুলেব বার্ষিক অভিভাষণটা লিখে দাও। তোমার বাণী মাঝে মাঝে শুনতে পায় বলেই তবুও যা হোক মেয়েগুলো এখনও ধাতস্থ আছে। কিন্তু যা মেঘ ক'রে এল, ওঁবা আজ এলে হয়।"

মিসেস্ বোস ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। আকাশের মেঘে ঘরখানির আলো কমে এসেছে। সেই নিবেআসা আলোর পর্দ্দায় কতদিন আগেকার চেনা-জানা কারা সব যেন বেরিয়ে এল। দৃশ্যপট বদলে গেল। নির্ম্মলা দেবী টেবিলের উপর মাথা রেখে দেখছিলেন, মেঘের কালো আবরণের তলায় চাঁদ এক বার ক'রে চাপা পড়ছে। গঙ্গার দিক্ থেকে একটা জোলো হাওয়া ছুটে আসছে। ঝড় এসে পড়ল। একটা খোলা জানালার গরাদে ধরে নির্ম্মলা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে। ওপারের নির্জ্জন কাশবন আর বালির চড়া ঘোলাটে চাঁদের আলোর তলায় কি এক রকম দেখাচ্ছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে একজন ঘবে প্রবেশ করল। নির্ম্মলা ফিরে দাঁড়িয়ে অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে, "বেশ তো, না এলেই একেবারে হ'ত। এতক্ষণে বুঝি তোমার আসবার সময মিলেছে! আমি কতক্ষণ থেকে বসে আছি।"

আরও কি সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু যে ঘরে এসে ঢুকল তার ব্যথিত করুণ মুখের দিকে চেয়ে নির্ম্মলার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। ভীত ত্রস্তভাবে সে বললে, "ওকি, তোমার কি হয়েছে?

রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ ছেলেটির হাতে ছিল, সেটি সে নির্ম্মলার

হাতে তুলে দিয়ে বললে, "বোম্বের ওদিকে একটা ভাল চাকরি পেয়েছি। কালই আমাকে চলে যেতে হবে। তোমাকে বলতে এলুম। আর সময় নেই অপেক্ষা করবার। সে অনেক দূর।"

ততক্ষণে ঝড় আরম্ভ হয়ে গেছে। খোলা জানালাগুলো আর্ত্তস্বরে এক বার বন্ধ হচ্ছে আবার খুলে যাচ্ছে। নির্ম্মলা ছবির মত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চৌকির উপর একটা হাত রেখে।

নরেন একদৃষ্টে তার দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ কাছে সরে এসে ফুলসুদ্ধ ওর হাতটা চেপে ধরে বললে, "মিথ্যে কথা। আমি কোন চাকরি পাই নি। তবু আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে। তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে।" ঘরে আলো ছিল না। শুধু মেঘরন্ধ্রচ্যুত চাপা জ্যোৎস্নার একটুখানি এসে পড়ছিল। এক জন প্রৌঢ়া মহিলা বেশ একটু সাজসজ্জাসমেত বিলাতী এসেন্সের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে উঁচু-হীলের জুতো খুট খুট করতে করতে সে-ঘরে এসে ঢুকলেন।

"উঃ এই অন্ধকারে একা ব'সে নির্ম্মলা কি করছিস? রেবারা অত ক'রে বলে গেল আমার সঙ্গে তাদের বাড়ী এক বার গেলেই হ'ত। কত দুঃখ করছিল তারা। এ যে দেখছি ঘরে বালি কিচকিচ করছে। ঝড়ের সময় চাকরগুলো করে কি, দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করতেও তাদের মনে থাকে না। সেটুকু আক্কেল অবধি তাদের যদি হয়। ডেকে বলতে পারিস্ নি ওদের।"

ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ টিপে দিতেই অজস্র আলোর বন্যায় ঘর ভরে গেল। জয়ন্তী মুখ কালো ক'রে নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নরেন, তোমাকে সকালে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছি বোধ হয় পেয়েছ। তোমার যদি তেমন কোন দরকার না থাকে তাহলে নির্ম্মলার সঙ্গে আমার একটু জরুরি কথা ছিল।"

রজনীগন্ধার গুচ্ছটি হাতে নিয়ে নির্ম্মলা চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

শান্তকণ্ঠে বললে, "ওঁর বাইবে যাবাব দবকাব নেই। তোমার দরকারী কথাটা যে কি তা আমি জানি মা। সকালবেলায় বোধ হয় এই দবকারী কথা জানিযেই তুমি ওঁকে চিঠি লিখেছিলে।"

জয়ন্তী একটু অপ্রতিভমত হ'লেন কিন্তু তখনই সামলে নিযে একটা চৌকিতে বেশ জুত কবে বসে বললেন, "তা যদি জেনে থাক বাছা তো ভাল কথা। কাল এই নিযে তোমাব বাবা বড দুঃখ কবছিলেন। নবেন যখন প্রথম আমাব কাছে এসেছিল তাব বুদ্ধি দেখে চমক লেগেছিল। ছেলেব মত স্নেহে যত্নে তাকে বাড়ীব মধ্যে নিযেছি। আমাবই চেষ্টা-যত্নে সে য়ুনিভার্সিটিতে এত ভাল বেজাণ্ট কবতে পেবেছে। এত স্নেহ এত বিশ্বাসেব প্রতিদান সে কি এই বকম কবেই শেষে দিলে।"

নবেনেব মুখ লাল হযে উঠল, চোখ জ্বলতে লাগল। বহু কষ্টে সে নিজেকে সংবরণ ক'বে বাখলে। পানেব ডিবে খুলে একটা পান মুখে দিযে জযন্তী বললেন, "ছেলেব মত আমিও তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু এটা তো কিছুতেই ভুলতে পাবি নে যে তোমাব মা শেষটা ভুগে ভুগে যক্ষ্মায মাবা গেলেন। আব তুমি তো জান নির্ম্মলাব বাবা নামে বিলেতফেবৎ মস্ত ব্যাবিষ্টাব হলে হবে কি, মনে মনে ভীষণ গোঁড়া। তোমবা পদবীতে সাহা, এত নীচু যে ঠিক কাযস্থও বলা চলে না তোমাদেব।" এক সঙ্গে এতগুলি কথা ব'লে জযন্তী অল্প একটু থামলেন নিঃশ্বাস নেবাব জন্যে। যে দুটি নবীন আসামী তাঁব দু-পাশে দাঁড়িযে বযেছে তাদের দিকে আড়চোখে এক বাব চ হলেন, ফল কিছু হ'ল কিনা দেখবাব জন্যে। হঠাৎ পাশেব দবজা খুলে গেল, নির্ম্মলাব বাবা মিষ্টাব চাটার্জ্জী বেবিযে এলেন। ঘবে এসে কাবও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'বে সোজা নির্ম্মলাব কাছে গিযে তার মাথায একটি হাত বেখে বললেন, "মা নির্ম্মল, মেযেদেব জীবনেব চবম কথা ত্যাগে, সুখভোগে নয। তোমাব ব্যক্তিগত জীবনেব সুখদুঃখ তুচ্ছ এখানে। জাতির

সমাজের ভবিষ্যত জীবনধারা অদৃশ্য আকারে তোমার মধ্যে বইছে। তাকে নির্ম্মল ক'রে প্রবাহিত রাখবার ভার তোমার উপরে। কোন লোভ কোন আপাতসুখেব আকর্ষণে এ-কথা ভুলো না। তোমার দায়িত্ব অনেক।" এতক্ষণে নির্ম্মলার দু-চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। নরেন কখন ঘব থেকে বেবিয়ে চলে গেছে। প্রফেসব চাটার্জ্জী মোহমুদ্গারেব কি একটা শ্লোক আবৃত্তি কবছিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর বিশেষ বকম দখল আছে। বজনীগন্ধাব করুণ তীব্র গন্ধ ঘবেব হাওয়াকে সুরভিত কবে তুলেছে। জলেব ঝাপটা আসছে জানালা দিযে। বহু দূরেব থেকে একটা ঝড়েব গর্জ্জন ও গঙ্গাব দুবন্ত কল্লোলেব মিলিত কলরোল শোনা যাচ্ছে।

*　　　*　　　*

মিসেস বোস ঘবে ঢুকে অবাক সুবে বললেন, "তোমাব শবীবটা কি ভাল নেই ভাই নির্ম্মলা? ঘুমিযে পড়েছিলে নাকি? আমাদের স্কুলেব বার্ষিক অভিভাষণটা দু-ছত্র মাত্র লিখে থেমে গেছ। না ভাই, তোমাকে এবাবে বেশ ওজস্বিনী ভাষায় দু-চাব কথা বলতেই হবে। ইলার ব্যাপাব দেখে আমি তো ভয়ে মবছি। সেদিন জ্ঞানদা নন্দীদের অত বড় পার্টিটা গেল, তা আমাব কমলা-নীরু-তরু-সুশীকে আমি যেতে দিলুম না। শুনেছিলুম কিনা ঐ সোমেশকে নিমন্ত্রণ কবা হযেছে। যাকে নিয়ে ইলা এত বাড়াবাড়ি কবছে। বড চাকবি কবলে কি হয, ছেলেটা অত্যন্ত বেহায়া। মর্যাল্‌স্‌ বলে কোন জিনিসই যেন ওব নেই।" নির্ম্মলা সুপ্তোত্থিতের মত মিসেস বোসের দিকে চেয়ে বইল। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছিল···সে কি স্বপ্ন দেখছিল। না তা নয়। বোসেদের ড্রইং-রুমে পিতলের ফুলদানিতে একগোছা রজনীগন্ধা কে সাজিযে রেখেছে। ঐ গন্ধের ইঙ্গিতে জীবনের বিস্মৃত কোন অধ্যায়ের পাতা

আপনা-আপনি উল্টে যাচ্ছে। এই জীবনের অন্তরালে যে আর একটা সুপ্ত জীবন আছে তার ঢাকা খুলে গেছে ক্ষণকালের জন্যে। নির্ম্মলা ভীত হয়ে তখনই আবার পর্দ্দা টেনে দিলে। মুখে একটুখানি মৃদু হাসি টেনে এনে সে বললে, "না লিখব বই কি। এ-সব কাজ নির্জ্জন নইলে হয় না। আজ রাত্রিতেই আমি অভিভাষণটা শেষ ক'রে ফেলব। যাক্ তোমার কাজ শেষ হ'ল ?"

মিসেস বোসের হাতে একটা উলের অর্দ্ধসমাপ্ত সোয়েটার ছিল, তিনি তাতে ঘন ঘন কাঁটা চালাতে চালাতে বললেন, "তা এক রকম হ'ল বই কি। এখন ওঁরা এলে হয়। অনাথসদনের ব্যাপারে ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছি।" নির্ম্মলা বিদায় নেবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "মেঘটা কেটে গেলেই নিশ্চয় আসবেন। তা ভাই তোমার মত সুগৃহিণী কমই দেখা যায়। কোথায় অনাথসদন, কোথায় স্কুলের সেক্রেটারির কাজ, সমস্তই নিখুঁত ভাবে করে তুলছ, আবার এদিকে ঘরের দিকেও পুরোমাত্রায় দৃষ্টি আছে। সেদিন ঐ যে নন্দীদের পার্টিতে যাও নি খুব ভাল কাজ করেছ। আমার অভিভাষণে আমি তোমার ঐ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করব মনে করছি।"

মিসেস বসু গর্ব্বে বিস্ফারিত হয়ে সোয়েটার বুনতে বুনতে বললেন, "তা করতে পার। তাই উনিও সেদিন আহ্লাদ করে বলছিলেন, আর যাই হোক আমার স্ত্রীভাগ্য ভাল মানতেই হবে। সকল সময়েই দেখছি তোমার হাতে একটা কাজ রয়েছে, হয় একটা এমব্রয়ডারি নয় একটা উলের নিটিং। গল্প করবার সময় অবধি অপব্যয় কর না। তবু ঘরের বা বাইরের কোন জিনিসটি চোখ এড়িয়ে যাবার যো নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকল বিষয়ে।" নির্ম্মলা সায় দিয়ে বললে, "খুব ঠিক কথাই বলেছেন। তোমার এই দৃষ্টান্তের কথা আমি মেয়েদের অভিভাষণে লিখব। গল্প করবার সময় অনায়াসে হাতে একটা সেলাই রাখা যায়। সেটুকু সময়ই

বা অপব্যয় করবে কেন? আচ্ছা আজ আসি ভাই, কাল সকালেই তোমাকে অভিভাষণটা পাঠিয়ে দেব। পড়ে দেখবে কেমন হয়েছে। যেতে যেতে নির্ম্মলা একবার একটু থমকে দাঁড়াল। রজনীগন্ধার গন্ধ মুহূর্ত্তের জন্য তাব মনকে বিমনা করে তুলেছে। মেঘাবৃত স্নিগ্ধ অপরাহ্ণের দীপ্তিহীন আলোর দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্যে সে মেয়ে-স্কুলেব অভিভাষণের কথা ভুলে গেল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত

নকল পাঞ্জাবী

"যুগান্তর" বলেন ঃ—"উপন্যাসখানি তিনটি স্তবকে বিভক্ত এবং প্রত্যেকটিই প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত হইয়াছে। পঞ্চনদের রুদ্রকঠোর পরিবেশের মধ্যে প্রবাসী নায়ক-নায়িকার প্রেম ও মিলনের বিচিত্র কাহিনী লেখক যেরূপ হাস্যরসের ভিতর দিয়া পরিবেশন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উপভোগ্য। প্রেম যে ছোঁয়াচে রোগ তৃতীয় স্তবকে লেখক তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। উপন্যাসখানি আগাগোড়া হাল্কা রসে পূর্ণ।"

"জজ সাহেবের নাতনী" নামে ইহাই ছায়াচিত্রে রূপায়িত হইয়াছে। দাম—দুই টাকা

রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত

উদাসীর মাঠ

উদাসীর জীবনে জটিল সমস্যা ঘনাইয়া উঠিয়াছে।
কিন্তু সে সমস্যা কি একা তাহারই ?

তাহারই মত ভাগ্য-বিড়ম্বিত সমগ্র নারী-সমাজের মধ্য দিয়া সে সমস্যা কি বিশ্বজনীনতা লাভ করে নাই ?

আত্মীয়-স্বজনের বিরূপতা এবং সমাজের বিদ্রূপ-কটাক্ষের মধ্যে শোচনীয়-ভাবে মৃত্যুবরণ দ্বারাই কি সেই সমস্যার সহজ সমাধান সূচিত হয় ?

ইহার উত্তর কি ? দাম—দুই টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা